॥ ফেলে আসা দিন ॥

আজ তার মনে পড়ছে সেইসব কথা। আজ উনিশশো সাতচল্লিশ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি। আজ এই দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত রাত্রে দ্রুত বেগে ধাবিত ঢাকা মেল ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। অকল্পিত, অভাবিত এই ভাবনা যে মেঘনাদকে এই পরিবেশে কোনদিন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে, তা সে ভাবতে পারেনি। আজও যে সে ভাবছে, তাও একবার অতীতের অন্ধকারের মধ্যে নিজের জীবনের ঝড়তি পড়তি ও সঞ্চয়ের থলি হাতড়ে দেখবে বলে ভাবছে না। কেন না, সে ভাবতে বসেনি। অমন ক'রে কোনদিন ভাবতে শেখেনি সে। না শিখলে, ভাবব বলে ভাবা যায় না। ভাবনা একসময়ে আসে আচম্বিতে, কোনও সংবাদ না দিয়ে। এসে তার কাজ শেষ করে সে চলে যায়।

মেঘনাদের কাছেও ভাবনা এসেছে তেমনি করে। এসেছে, অন্ধকারের বুকে আচমকা প্রাণহারিণী কালসাপিনীর মত। মুহূর্ত অবসর না দিয়ে বিষবতী ভাবনা ফণা বিস্তার করে দংশন করেছে। সেই হলাহলে আজ আকণ্ঠ পূর্ণ। ব্যথার তীব্র যন্ত্রণা এখন অস্তমিত সূর্যের ম্লান লাল আভার মত ছড়িয়ে পড়েছে তার হৃদয় আকাশ ভরে। এখন দংশনের সেই বিষজ্বালা নেই, দহনের তীব্রতা নেই, নেই অসহ্য যন্ত্রণার চীৎকার ও দিগ্‌ভ্রান্তের মত দাপাদাপি করা। এখন সারা অঙ্গ বিষে জরজর। নেশাচ্ছনের মত ঢল ঢল প্রাণ। বেদনা স্তিমিত ও ম্লান। কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুর মত অন্ধকার গ্রাস করবে, ছেয়ে ফেলবে তার হৃদয়। ভাবনা আজ এই রূপ ধরেই এসেছে তার কাছে।

না, এ তো ভাবনা নয়, স্মৃতি। অতীতের ভাবনার নাম স্মৃতি। ভবিষ্যতের চিন্তা হল ভাবনা। কিন্তু মেঘনাদের কাছে ভবিষ্যৎ হল মৃত্যুর মত গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। নিজের থেকে সেদিনের কথা ভাবা দূরের কথা, এই গাড়ি যখন তাকে তার আপাত গন্তব্যে নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে, তখনো দাঁড়িয়ে থাকবে সে মূঢ়ের মত।

তার মনের আয়নায় যে ছবি দেখছে সে, এর নাম যে স্মৃতি, এই সামান্য

বোধটুকুও মেঘনাদের সম্ভবত নেই। সে জানে না, হতাশ মানুষের সম্বল তার অতীতের স্মৃতি। অসহায় মানুষ যখন ছুটে এসে সামনের দরজা বন্ধ দেখতে পায়, তখন সে ছোটে পেছনের দিকে। ছোটে উর্দ্ধশ্বাসে, যদি কোন পথ পাওয়া যায়! ভেবে ছোটে না, তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা যখন একেবারেই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন অতীতের পথ—অতিক্রমণের সুখ ও দুঃখ, দুই-ই বড় সুখের হয়। সুখের না হোক, রোমন্থনের আরাম এনে দেয়।

কিন্তু এই যে স্মৃতির উদ্ঘাটন, সেই বিচিত্রের ছায়াও মেঘনাদের সারা মুখে খুঁজে পাওয়া দায়। তার বলিষ্ঠ মুখ একটা জং ধরা তামার ড্যালার মত দেখাচ্ছে। সেখানে হৃদয়ের আলোছায়ার কোন রেখাপাতও নেই।

শুক্লপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। পুঞ্জীভূত মেঘ ছড়ানো আকাশে গাঢ় কালিমা নেই। মেঘের আড়ালে লুকোনো চাঁদের আলোয়, সাদা ঘন কুয়াশার মত সারা আকাশটা প্রাণহীন বিষন্নতায় ভরে রয়েছে। দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে নেই অন্ধকার। প্রদোষের অস্পষ্ট আলোর মত সব ঝাপ্‌সা। বনপালা মাঠ ও গ্রামের ছবি চোখের সামনে ফুটি ফুটি করেও ফুটছে না। এরই মধ্যে কোথাও ঝাপসা পটের উপরে মাঝে মাঝে গাঢ় কালি লেপে দেওয়ার মত খোঁচা খোঁচা অন্ধকার রয়েছে ঘাপটি মেরে। গোমড়া মুখে হাসির ঝিলিক ফুটেও না ফোটার মত চাঁদ দেখা দেবে দেবে করে দেখা দিচ্ছে না। এখুনি বৃষ্টি আসার কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু গাড়ির বিপরীত মুখে দুরন্ত জলো হাওয়া ঝাপটা মেরে চলেছে। অসহ্য গুমোট আর ভ্যাপসানিতে জলো হাওয়া একটুও আরাম দিচ্ছে না। একটা বিশ্রী রকম পচানিতে সারা গায়ের মধ্যে যেন রি রি করে উঠছে। জলো হাওয়ার সঙ্গে থেকে থেকে এঞ্জিনের কাঁচা কয়লার ধোঁয়া-রাশি দিচ্ছে দম আটকে। ধূলোর মত নাক মুখ ভরে যাচ্ছে কয়লার গুড়োয়।

রকমারি কণ্ঠের কলরবের মত, এক এক রকম শব্দ করে মেল ট্রেনটা ছুটে চলছে। গুমোট রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দেওয়ার অন্তহীন প্রয়াসে মেতে উঠেছে গাড়িটা।

চোখ বুঝে আছে মেঘনাদ। শিথিল শরীরটা দুলছে তার। শুতে ইচ্ছা নেই, শক্ত হ'য়ে বসবার শক্তি নেই। মন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেছে অন্যত্র। তার নিজের কাছ থেকে সে চলে গেছে দূরে।

দেখে মনে হয় মেঘনাদ সুপুরুষ। অন্তত এককালে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেদহীন বিশাল শক্ত ও বলিষ্ঠ শরীর। গায়ের রংটা একসময়ে বেশ ফর্সা-ই ছিল মনে হয়। ফর্সা রং এখন তামাটে হয়ে উঠেছে। বয়স বছর চল্লিশ। কিন্তু দেখায় আরও বছর দশেক বেশী। কারণ, তার ঘন শক্ত ও ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুলগুলি অধিকাংশ পোড়া সোনা রং ও ধূসরতায় ছেয়ে গেছে। তার চুল কোনদিনই ঘন কালো ছিল না। কালোর মধ্যে ছিল কিছুটা বাদামীর আভাস। স্বভাবতই তার চুল দেখলে বয়স্ক বলে মনে হয়। তা'ছাড়া যে বস্তুটি তাকে তার বয়সের চেয়েও ভারী ও গম্ভীর ক'রে তুলেছে, সেটি তার গোঁফ। শার্দুলের মত তার চওড়া গালের দু'পাশে ঘন বিস্তৃত গোঁফ জোড়া যে শুধু তার গাম্ভীর্যই এনে দিয়েছে, তা নয়। একটা চাপা নিষ্ঠুরতাও যেন লুকিয়ে রয়েছে গোঁফের মধ্যে। গোঁফের আকার ও ভঙ্গি ছেড়ে দিলেও, তার মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, মানুষটা নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর প্রকৃতির। এত বড় ভরাট মুখে, চোখ দুটি তার রীতিমত বড় আর বেশ টানা টানা। তবে মেঘনাদের মোটা ও কুঞ্চিত ভ্রূর তলায়, টানা টানা বড় চোখ বলতে যে মাধুর্যের কথা আমাদের মনে আসে, এ চোখ জোড়াতে সে চিহ্নও নেই। মাঝে মাঝে যখনই সে ক্লান্ত মোষের মত চোখ মেলছিল, তখনই লালের আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। মাধুর্য নেই, কিন্তু সারা মুখটাতে বুদ্ধির দীপ্তিও চোখে পড়ে না। একটা ভোঁতা অভিব্যক্তিতে তার সারা মুখটা আচ্ছন্ন। কিছুটা বা বোকাটে। ফলে এই মুখে যে চরিত্রের ছাপ ফুটে উঠেছে, তা যেন বর্বর নিষ্ঠুরতার সামিল। একটু খোঁচা খেলেই তার হৃদয়ের ভয়ঙ্করতা তীক্ষ্ণ গর্জনে ফুটে বেরুবে যেন।

এই হল মেঘনাদ। মেঘনাদ দাশ। এখন তার মুখের ভাব হয়ে উঠেছে একটা বন্দী অসহায় ও যন্ত্রনাকাতর সিংহের মত। গর্জন নেই, দাপাদাপি নেই, পড়ে আছে সে শরীর এলিয়ে দিয়ে, অজানিত পরিণতির হাতে নিজেকে

সঁপে দিয়ে। মেল ট্রেনের এ খাঁচা তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে, কতদূর এল, এসব জানবার তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা কৌতুহল নেই।

বেঞ্চির নীচে লুটিয়ে পড়েছে তার ধুতি। মোটা অথচ আধ ইঞ্চি চওড়া পাড়ের ঢাকাই তাঁতের ধুতি। বাগেরহাটের ময়ূরকণ্ঠি কাপড়ের একটা পাঞ্জাবী রয়েছে তার গায়ে। রাত্রিচর মুস্কিল-আসানীদের মত পাঞ্জাবীটা একটা আলখাল্লা বিশেষ। কিন্তু হাতাগুলি গেছে খাটো হয়ে। ময়ূরকণ্ঠি রংএর ম ও মালুম হচ্ছে না, এত ময়লা হয়েছে জামাটা। মোষের সিংএর কালো কালো বোতামগুলি খোলা, বুকটা হা হা করছে। বুক পকেটটা ফুলে, ঝুলে পড়েছে জিনিষের ভারে।

আর একজন, একটি মেয়ে তার হাঁটুর উপরে কনুই রেখে, ঘুমের ঢুলুনিতে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে পড়ছে ঢুলে। নয়তো ঠকাস করে গাড়ীর গায়ে ঠুকে যাচ্ছে মাথাটা। তারপর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে তাকাচ্ছে মেঘনাদের দিকে। সেখানে কোন ভাবান্তর না দেখে যেন সঙ্কল্প করে নিচ্ছে আর কিছুতেই ঢুলবে না। এমনি ভাবখানা করে হাত পা কাপড় গুছিয়ে বসার পরমুহূর্তেই আবার ঢলে পড়ছে।

মেঘনাদের স্ত্রী। নাম তার লীলাবতী। কিন্তু সেটা পোষাকি নাম। আসল নাম ঝুমি। ওই নামেই তার পরিচয়, তার নিজের গণ্ডী ও আসরে। ওই নামেই ডাকাডাকি করা হয় তাকে। ঝুমঝুমি থেকে ঝুমি। বিয়ের সময় তার ভাইয়েরা একটা পদ্য-উপহার ছাপিয়েছিল। কেবল সেইখানেই তার পোষাকি নামটা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লীলাবতীর স্থলে সেটা নীলাবতী হয়েছিল। কেন না, লীলা উচ্চারণটা খুব সহজ হলেও, সহজ ছিল না তার ভাইয়েদের পক্ষে। তারা আজীবন নীলা-ই বলেছে, নৌকাকে বলেছে লৌকা। ধলেশ্বরী তীরের সুদূরচর থেকে ঢাকা শহরে এসে তারা সেই পদ্য ছাপিয়েছিল। প্রেসের লোকও লীলাবতীকে নীলাবতী করায় কোন আপত্তি খুঁজে পায়নি। কারণ বাজারে নীলা নামেরও যথেষ্ট ছড়াছড়ি আছে।

যাই হোক্। ঝুমি অর্থাৎ লীলা কালো। ঘাম তেল মাখা প্রতিমার মত ঝকঝকে কালো। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির মাঠে হিল্‌হিল্ ক'রে চলা

কাল নাগিনীর মত কালো চকচকে। যে কালোতে হয় আলোর স্ফুরণ। সে লম্বা নয়, কিন্তু ছোট নয়। একহারা শক্ত শ্যাম-কঞ্চি বাঁশের মত তা নরম ও কচি বলে মনে হয়। অথচ বয়স প্রায় ত্রিশ স্পর্শ করতে চলেছে। কিন্তু কোথাও তার দাগ নেই। যেন এখনো বাড়বার মুখে কিশোরী ডগার মত তার সর্বাঙ্গে শিহরিত যৌবন ফুটে উঠেছে রেখায় রেখায়। একটি সন্তান হয়েছিল তার। মাস কয়েকর হয়ে মারা গেছে। কালো মুখে তার সবই প্রায় নিখুঁত। বঙ্কিম তার ভ্রূলতা। চোখ খুব বড় নয়, কিন্তু তার চরিত্রের প্রতিবিম্ব ওই খরো চোখ যেন বিচিত্ররূপে সুন্দর হয়ে উঠেছে। সরু নাকে নাকচাবি। কপালে তার অজান্তে বেঁকে যাওয়া সিন্দুরের রেখা। আর সিন্দুরের মতই তার পান খাওয়া পাতলা ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে। অন্ধকারে আগুনের মত। যাকে বলে টিকেয় আগুন দেওয়ার মত।

তার ঘোমটা খসে গেছে, ভেঙ্গে পড়েছে খোঁপা। সখ করে পাতা কেটে আচড়ানো চুল ভাঙ্গা ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়েছে কপাল ভরে। সাধ করে সেজে পরা ঢাকাই ছাপা শাড়ীর আঁচল এলিয়ে পড়েছে বেঞ্চির উপরে। বুকে অন্তর্বাস পরার রীতি তাদের কোনকালে ছিল না। না বাপের ঘরে, না স্বামীর ঘরে। এমন কি তাদের দেশের সমাজে ও প্রথায় এখনো একেবারেই অচল। বাঙ্গালী হিন্দুর সেই পুরানো উদাসীনতা কোথাও অস্বাভাবিক করে তোলেনি লীলাকে। অসহ্য গুমোটে ও গরমে খোলা তার জামার বুক। সুগঠিত স্তনের একাংশ প্রায় উন্মুক্ত। তেঁতুলে বিছের মত একটি চওড়া সোনার হার ঢেউ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে তার বুকে।

মেঘনাদের স্ত্রী লীলা। স্ত্রীকে বলে অর্দ্ধাঙ্গিনী। কিন্তু মেঘনাদের মত চিন্তা, সংশয়, দুর্ভাবনা লীলার আছে বলে মনে হয় না। তার সারা শিথিল অঙ্গ জুড়ে ব্যপ্ত ঘুমের জড়িমা। মুখে তার কোথাও চিন্তার লেশ নেই। ক্লান্তি ও তন্দ্রার আবেশ মাখানো মুখ। অর্দ্ধচেতন রক্তিম ঠোঁটের কোনে বরং সূক্ষ্ম একটি হাসির আভাস স্ফুরিত হচ্ছে। অর্দ্ধচেতন, কিংবা হয়তো একেবারে নিজেরই অজান্তে।

বাইরের আকাশ ও মাঠের মত অস্পষ্ট ও ঝাপসা মেঘনাদের ভবিষ্যৎ। তেমনি লীলারও। তবু একজন বিষ জরজর। আর একজন চিন্তাহীন নিদ্রাবেশে ঢুলুঢুলু। একজন গৌর-তামাটে বিশাল পুরুষ নিদ্রাহীন চিন্তিত। আর একজন আলোকময়ী কালো রূপবতী সোহাগিনীর মত ঘুম চোখে লেপটে রয়েছে তারই গায়ে।

লীলা মেঘনাদের গায়ে ঢলে পড়ছে, তাতে বিরক্ত হচ্ছে মেঘনাদ। তার বিষ আচ্ছন্ন দেহে সে এ স্পর্শ সহ্য করতে পারছে না। সে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে লীলাকে। লীলা ঘুম চোখে অপ্রস্তুত ও অবাক হচ্ছে। ওই চকিত মুহূর্তেই অভিমানে বঙ্কিম হয়ে উঠছে ঠোঁট, চোখও পাকাচ্ছে। কিন্তু আবার পড়ছে ঢলে।

কামরাটাতে যাত্রী অল্প। মেল ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে যেরকম ঠেলাঠেলি হওয়া উচিৎ, সেরকম নয়। সমস্ত বগীগুলিরই এক অবস্থা। কামরার সকলেই প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। এর মধ্যেই কেউ কেউ গাঢ় নিদ্রায় ডুবে গেছে। এমন কি নাক ডাকার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। কেউ কাশছে খক্ খক্ করে। ঘুম চোখেই হুস্ হুস্ করে টানছে বিড়ি নিতান্ত নেশাখোর যাত্রী। কেউ বসে ঘুমুচ্ছে, কেউ ঢুলছে শুয়ে শুয়েই।

মেঘনাদ ছাড়া শুধু একজন ঘুমোয়নি। একটি ছেলে। একটি অজ্ঞাত কুলশীল, পথের ছেলে। বিনা পয়সার যাত্রী। তার কোন দুশ্চিন্তা আছে কিনা সে-ই জানে। খালি গায়ে বসে আছে সে। সারা গায়ে মশার কামড়ের দাগ। ধূলো মাখা এক মাথা চুল। কালো কালো লিকলিকে হাত পা। পিলে উচনো নিটোল পেট। ড্যাবা ড্যাবা দুটি হল্‌দে চোখ।

প্রথম রাত্রিতে সে অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করেছে লালার সঙ্গে। কেমন করে যে লীলার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছিল, সে-ই জানে। আর লীলার একটুও বাধেনি এই পথের ছেলেটার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে গল্প করতে। বরং এই ছেলেটার জগতের বিচিত্র সব কাহিনী তাকে চমৎকৃত করেছিল। সেও বক্‌বক্ করেছে, খিলখিল করে হেসেছে ছেলেটার সঙ্গে। মেঘনাদ তাকিয়েও দেখেনি। অন্যান্য যাত্রীরা তাদের একজন যাত্রীনিও ভবঘুরে ছেলেটার হাসি ও কথা

হা করে শুনেছে। দেখে হয়তো কেউ অবাক হয়েছে। দেখেছে কেউ বারবার। লীলাকে! না দেখাটাই বিস্ময়ের।

ছেলেটা বলেছে তার নাম, তার ধাম। তার যে আবার ধামও থাকতে পারে, সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের। লীলা আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছিল তাদের গ্রামের কথা। বাপ মায়ের কথা।

জীবনভর সে কত কাজ করেছে, জীবনের সে কাহিনী ও লীলার মত একজন শ্রোত্রীকে সে না শুনিয়ে পারেনি। লীলা গল্প শোনার মত সবটা উপভোগ করেছে। মেঘনাদ একবার ছেলেটার দিকে তাকিয়েছিল। যখন ছেলেটা বলছিল, গুনোহাটি বন্দরের বদরুদ্দিন মিঞার বিস্কুটের কারখানায় সে কাজ করেছে তিন মাসের জন্য। মাত্র একবারই তখন তাকিয়েছিল। আর একবার তাকিয়েছিল, যখন তার দিকে লীলা আর তাকাবার অবসর পায়নি।

কথা বলার ফাঁকে এক সময়ে ঢুলুনি এসেছে লীলার। যত সহজে সে গল্প শুনেছে ও কথা বলেছে, ততখানি সহজেই ঢলে পড়েছে সে। কেবল ছেলেটা লীলাবতীর এ লীলা একেবারেই বুঝতে পারেনি। যে এতক্ষণ ধরে তার কথা শুনছিল, সে যে এমন হঠাৎ ঢুলতে আরম্ভ করবে, তা ভাবতেই পারেনি। প্রথমটা আশাহত হয়ে চুপ করেই গিয়েছিল। পরমুহূর্তেই সবাইকে চমকে দিয়ে গান ধরে দিয়েছিল সে,

মান কইরা, মুখ ফিরাইয়া
যাইও না গো সই।
মাথার কিরা দিয়া কই।

গানের সঙ্গে ভয়াবহ রকমে সে তার পিলেটার উপর সজোরে তাল ঠুকাছল। সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। এমন কি, নিতান্ত রসিক দু' একজন বাহবাও দিয়েছিল। মেঘনাদ তাকিয়েছিল তখন একবার। যেমন ঘুমন্ত সিংহ ইঁদুরের কিচির মিচির শুনে একবার বিরক্তি ও অবহেলা ভরে তাকায়।

কিন্তু যাকে জাগাবার এত প্রয়াস, সে মাথার কিরা মানেনি। এর পরে আর তার গানও জমেনি। কয়েকবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছে

মেঘনাদকে। দেখেছে অনেকবার লীলাকে। বার কয়েক গেছে ল্যাট্রিনে। তারপরে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

কখনো আলো দেখছে, তাকাচ্ছে এদিক ওদিক আর বকবক করে চলেছে আপন মনে। কি বলছে সেই জানে। কিন্তু ঘুম তার চোখে নেই।

বাইরে কখনো অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠছে। আবার ভরে উঠছে অস্পষ্ট আলোয়। সম্ভবত একটা খাল কিংবা নদীর উপর দিয়ে চলেছে গাড়ীটা। গম্ গম্ শব্দ ছিটকে এসে ঢুকছে কামড়ার মধ্যে। আবার একটু পরেই অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলে সে শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। গাড়ী যাওয়ার সংবাদ নিয়ে চলেছে দূরের অজানা ঘুমন্ত প্রান্তরে ও গ্রামে।

মেঘনাদ ডুবে গেছে তার মনের মধ্যে। মনের মধ্যের সেই তলায়, যেখানে চাপা পড়েছিল কালের স্তরের মধ্যে অতীতের ইতিহাস।

সেইখানে একটি ছেলে ভাসছে তার চোখের সামনে। এক ফালি থান কাপড় তার পরণে। গায়ে কিছু নেই। শুধু থানেরই একটা চিলতের সঙ্গে লোহার চাবি বেঁধে পরানো রয়েছে তার গলায়। ছোট ছেলে বারো তেরোর বেশী নয়। মাথায় তেলহীন রুক্ষ চুল। ফরসা মুখ। ডাগর চোখ। চোখের কোল বসে কালো দেখাচ্ছে চোখের চার পাশে।

ছেলেটি গ্রামের এক টেড়ে বেতকাঁটা বনের ছায়ায় গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। মা তার অনেক দিন নেই। বাপ মারা গেছে কয়েক দিন। তাই পিতৃদশার করুণ বেশ তার দেহে। এখন আর তার কেউ নেই। ভাই নেই, একটি দিদি আছে তার শ্বশুরবাড়ীতে। কিন্তু দিদির কাছে সে যেতে পারবে না। তার ভগ্নিপতি একদিকে যেমন অভাবগ্রস্ত, তেমনি চরিত্রহীন। দিদি সেখানে বউ নয়, ক্রীতদাসী। তার চোখের জলে মেশানো নোনা ভাতে ভাগ বসাতে গেলেও সে বাড়ীর লোকেরা তাকে দূর দূর করে আসবে। তার বোনাই, বন্থই বলে যাকে ডাকে সে, সে আসবে তেড়ে মারতে। বাপ বেঁচে থাকতেই বোনের বাড়ির এ পরিচয় মিলেছে তার। তা'ছাড়া দিদির মুখের

গরাস মুখে নিতে পারবে না সে। আর সে যে অনেক দূর। ঢাকা থেকে ফরিদপুর। অনেকের কাছে এ দূরত্ব কিছুই নয়, কিন্তু তার কাছে অনেকখানি। সীমাহীন ও তুস্তর।

বর্ষান্তে শরত এসেছে। জল নাবির দিকে। তবু এখনো অনেক মাঠ ঘাট ও গ্রাম ভেসে রয়েছে। ডুবে রয়েছে টাবুটুবু জলে। জল শুকোচ্ছে যেখানে, সেখানে ভয়াবহ কাদা। যে কাদায় ডুবে মানুষের প্রাণ যায়। জলপথ ছাড়া উপায় নেই। নৌকা না হলে সে পথও আর পথ নয়। শুধু জল-ই। পাট চাষী ছাড়া অধিকাংশ দরিদ্র গ্রামবাসী ঘরবন্দী। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। বর্ষার আক্রমণে সমস্ত বাঁশের সাঁকোগুলি গেছে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে। চারদিকে এখনো জলো ঘাস, সাপলা-শেওলা, কলমিদাম ও কচুরিপানায় ভরা। বিষধর সর্পকুলও আশ্রয়হীন, আতঙ্কিত, দিশেহারা। সর্বত্র শুধু লক্ষ লক্ষ রক্ত শোষা কালো জোঁকের রাজত্ব। শোল সিঙ্গির অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র।

তবুও সকলেই কি আর ঘরবন্দী। যার ঘরই নেই, তার বন্দী হওয়ার কথা কি। তারা এই জল ও জলো-জঙ্গলের বুকেই ঘুরছে পেটের ধান্দায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কেন, এমন নীচু গ্রামও আছে, কিছুদিন আগে যেখানে ঘর থেকে ঘরে যেতে ভেলা ভাসাতে হয়েছে।

আকাশে এখনো মেঘের ঘন ঘটা। তুর্যোগের লক্ষণ একেবারে যায়নি। তবু এরই মধ্যে মাঝে মাঝে আকাশে রোদের হাসি ফুটছে। মিঠে হাওয়ায় শিউরে উঠছে বনপালা। শরতের আভাস ফুটে উঠেছে সর্বত্র। এরই মধ্যে কোন্‌দিন ড্যাং ড্যাং করে বেজে উঠবে ঢাক ঢোলক কাসি।

বিশ্বাস কি, নবতম পর্যায়ে আসতে পারে বর্ষা। তা'ছাড়া, চারদিকে বর্ষার ভরা নদী। কোম্পানীর জাহাজ ষ্টীমার ভেঁপু ফুঁকে যায় বটে। নৌকায় যেতে সেই নদী পথই এখন তুর্গম।

না, না, সে যাবে কোথায়। যাবার তার ঠাঁই নেই কোথাও। যাবার পথ সুগম হলেও, তার যাবার পথ নেই। ফরিদপুর বোনের বাড়ী কোনদিনই যেতে পারবে না সে।

ভাবতে ভাবতে, মেঘনাদ নিজেই মাথা নাড়তে থাকে, দুপুর রাত্রে এই ঢাকা মেলের কামড়ায় বসে। আজ ছাব্বিশ সাতাশ বছর বাদে সেই পিতৃমাতৃহীন ছেলেটার কথা মনে পড়ছে তার। সে মুখ আপনি ভেসে উঠেছে মনের পটে। যন্ত্রনায় বিকৃত হয়ে উঠছে তার মুখ। বিষ-জর্জ্জর অৰ্দ্ধচেতন দেহের চকিত অনুভূতি বেদনার মত নাড়া দিয়ে উঠেছে বুকের মধ্যে।

সেই ছেলে, সেই মুখ। সে যে জীবনভর তার মনের মাঝে রয়েছে লুকিয়ে। সেই ছোট ছেলেটি অজান্তে ডাগর হয়ে উঠেছে তার এই বিশাল শরীরের মধ্যে। তার অতি অন্তরঙ্গ। অন্তরতম তার সেই ছোট দিশেহারা ছেলে। মদন দাশের ছেলে, এক ফোঁটা মেঘু, এই মেঘনাদ দাশ। মেঘনাদ নিজে।

কিন্তু এতদিন সে একবারও দেখা দেয়নি। নাড়া দেয়নি মনের মাঝে। আজ সে আপনি দেখা দিয়েছে।

সেই ছেলে, কলঙ্কিত সাহা ঘরের ছেলে। কলঙ্কিত-ই তো। ব্যবসা বানিজ্য নেই সাহার ঘরে, তার চেয়ে ব্যতিক্রম আর কি আছে।

সত্যি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কিছু না থাক সাহার ঘরে টাকা থাকে কিছু। 'বানিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই হল অধিকাংশ সাহার নেশা ও পেশা। অন্তত মেঘনাদ তাই দেখেছে তাদের গ্রামে। ধর্মে গোঁড়া বৈষ্ণব জাতেও পেশায় খাঁটি ব্যাবসাদার।

শীত গ্রীষ্মে এক বস্ত্র ও এক জামায় অমানুষিক পরিশ্রম করেও সাহা ব্যবসা ছাড়ে না। জীবনের সমস্ত সুখ সুবিধার বিনিময়ে কাঞ্চন সংগ্রহ ও সঞ্চয় একরকম মজ্জাগত। গদী তার প্রাণ, তার বসন-ভূষণ। গদী টিকিয়ে রাখার জন্য জীবনের অনেক দিক ছেড়ে দিতে সে রাজী। দেয়, দিয়েছেও।

লক্ষ্মীর এই কাঞ্চন-শ্রী এমনই মোহিনীময়ী, এতই তীব্র যে, সরস্বতী বড় একটা পাত পান না। অর্গল বন্ধ নেই বটে, ভক্তের বড় অভাব। সহরে যদিও বা পরিবেশের গুনে সে পথ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত, কিন্তু গ্রামে তার চিহ্নও নেই। ফলে রুচির অভাব অনেক সময় বড় নক্কারজনক হয়ে ওঠে।

খোঁজ নাও। যে গদীতে বসে আছে, তার খাওয়ার পরিপাটী নেই, পোষাকের চাকচিক্য নেই। খেতে বসতে সাধ নেই তার কাঞ্চন বিরহে। বিরহ তার নিজের সৃষ্ট। দিবানিশি তার এক চিন্তা এক ভাবনা।

প্রকৃত শিল্পীর আপাত সৃষ্টির আনন্দের পরেই বিষাদ ভর করে তার মনে নতুনতর সুন্দর সৃষ্টির জন্য। সাহা ব্যবসায়ীর অর্থ পিপাসা যেন তেমনি। যা একবার গদীজাত হয়, তার চেয়ে বেশী না এলেই মেজাজ খারাপ।

তুলনার সঙ্গে পরিণতির মিল নেই। ওটা লক্ষ্মী আর সরস্বতীর সম্পর্কগত বিরোধের ফল।

পরণে যার পাঁচ হাত ধুতি আর গায়ে মাত্র ফতুয়া, তারও ঘুনসিতে বাঁধা চাবিকাঠিটি একমাত্র জীয়ন কাটি।

এ সাধনা অধ্যবসায় ও পরিশ্রম একটা মানুষের জীবনের পক্ষে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। অন্যদিকে সে যাই হোক। সিদ্ধিলাভ হল কাঞ্চন সঞ্চয় আর কিছু কৃষ্ণের কৃপা।

এমনি এক চরিত্রের সাহা ঘরের সদ্য বাপ-হারানো ছেলে মেঘনাদ নিজে। কিন্তু একটি পয়সা দূরের কথা, তার এক বেলা খাওয়ার ব্যবস্থাও নেই। সংসার অকূল পাথার, পারাবারহীন।

মেঘনাদ দেখছে সেই মেঘুকে। মদনসা'র ছেলে মেঘাকে। বেত কাঁটার ছায়ায় গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে ছেলে। এই বয়সে সর্বস্বহারা হয়েছে সে। ভিটেটুকুও বাঁধা আছে লক্ষ্মণসা'র কাছে। বাপ তার জীবনভোর ঘুরে বেড়িয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। কখনো ঢাকা সহরে, ময়মনসিংহ, কুমিল্লায়। কখনো ছুটে গেছে চাঁদপুর, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম। ভাগ্যান্বেষণে ছুটে গেছে সুদূর আসামের পাহাড়ে জঙ্গলে।

কিন্তু মূলধন ছিল না। তাদের বংশগত ব্যবসা ছিল শীতলপাটি, মাদুর, হোগলা চালান দেওয়া। মস্ত বড় গদী ছিল সিরাজদিঘার বাজারে। কিন্তু ঠাকুর্দার আমলেই সে ব্যবসা চলে গেল রসাতলে। সে আর এক ইতিহাস। আজ আর সে ইতিহাসের পাতা উল্টে লাভ নেই। মদনসা' মূলধন নিয়েছিল লক্ষ্মণ সা'র কাছ থেকে। কিন্তু জীবনপাত ক'রে ও ঢাক-মুখো লক্ষ্মীর মুখে

ফোটানো গেল না হাসি। মেঘু পড়েছিল ঘরে, মদন ঘুরেছে ওই লক্ষ্মনসা'র মূলধন আর হরিনামের মালাটি সার ক'রে। অবস্থা ফিরলে মুখ তুলে তাকানো যাবে ছেলের দিকে। চাই কি, প্রতিবেশীরা, যারা তাকে মাঝে মাঝে বিয়ের জন্য ধরপাকড় করে সেদিন তাদের কথারও একটা দাম দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে।

কিন্তু হল না। বিপদভঞ্জন মধুসূদন নৃসিংহাবতারের করাল রূপে দিল দেখা। মদন মরেনি, মদনকে হত্যা করেছে সে। মৃত্যুর সময়ে মদন তাই চীৎকার করে ডেকেছে ঠাকুরকে। ঠাকুর। মেরোনা, মেরোনা আমাকে এমনি করে। তোমার নামের কলঙ্ক করো না।

কিন্তু ঠাকুর বড় নিষ্ঠুর। মদনকে ছাড়ল না সে। মরণের পরে তাই তার সাঁড়াশীর মত কঠিন হাতে একটা কালো পুঁয়ে সাপের মত যেটা ঝুলছিল, সেটা তার গলার ছিন্ন তুলসী মালা। ওটা আর সে গলায় রাখতে পারেনি! টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল।

না, মেঘু কাঁদবে না। মায়ের মুখ মনে পড়ে না ছেলের। মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা হয় না। মাতৃ-স্নেহ বঞ্চিত সে। যা পায়নি, স্বাদ জানা নেই, তার জন্য সে কাঁদেনি কোনদিনঃ বাপের জন্যও সে কাঁদল না। কাঁদল না নয়, কান্না এল না। দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে উঠল সে। কচি প্রাণ পাথর হয়ে উঠল ভাবনায়।

বংশের রক্ত তারও দেহে রয়েছে। সে রক্তধারা আগুন জ্বালিয়েছে তার প্রাণে শিশুকাল থেকেই। ব্যবসা করতে হবে তাকেও। গদী করতে হবে, সিন্দুক ভরতি টাকা করতে হবে। শিশুকাল থেকে শুনে আসছে সে একই কথা। ব্যথা মানুষের একটাই জেনেছে সে। ধ্যান ও জ্ঞান করেছে মস্ত বড় গদী আর কাঞ্চন মূল্য। ব্রতকথা ও রূপকথার মধ্যেই ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখেছে সে।

সে ধনপতি সওদাগর হবে। সপ্তডিঙ্গা তার বদর বদর করে খাল নালা নদ নদী পেরিয়ে পাড়ি দেবে অকূল সমুদ্রে। পৃথিবী যেখানে শেষ, সেখানে সেই রাবণ রাজার লঙ্কাতে গিয়ে ঠেকবে তার সপ্তডিঙ্গা নাও। পৃথিবীর

হাটে হাটে বাণিজ্য করবে সে। কত দূর দূরান্তে যাবে। বছর ঘুরে যাবে, তবু সে ফিরবে না। বাপ যাবে নসীরাম গণৎকারের বাড়ি। দেখুন তো ঠাকুরমশায় গুণে গেঁথে, মেঘুর সপ্তডিঙ্গা ফিরছে কি না? নসীরাম একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে ঘর কাটবে, বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াবে আর আঁক কষবে। তারপরে একসময়ে বলবে, নাওয়ের মুখ তো দেখছি এদিকেই ফিরেছে। না, ঝড় জলের তো কোন চিহ্ন দেখি না। শরীর? তা' বেশ ভালই তো দেখছি। হ্যাঁ, শত্রু কিছু কিছু ঘাপটি মেরে আছে দূরে। তবে মেঘুর নায়ে দেখছি স্বয়ং বিপদভঞ্জন বসে আছেন। ভাবনা করো না মদন সা', এবার থেকে মা লাটাই চণ্ডীর ব্রত ধারণ করাও বংশে। বাপ তার খুশী হয়ে নসীরামকে দেবে একটি পয়সা, বে-জোড় কড়ি, আর ধামা খানেক চাল।

তার পরেই মেঘু ফিরে আসবে হীরে জহরৎ ধন রত্ন নিয়ে। ডিম্ ডিম্ ক'রে বাজবে কাসর, ঝাঁক বেঁধে মেয়ে বউরা দেবে উলু।

লক্ষ্মনসা'র পেল্লায় গদী ঝাট দিতে দিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মেঘু। পিতৃদশা কেটে গেছে। চাকরের কাজ জুটেছে তার লক্ষ্মণসা'র গদীতে। ঝাট দেয়, জল তোলে, মালপত্র গোছগাছ করে, খাটে ছুটকো ফাই ফরমাস। আশা আছে, ভবিষ্যতে ব্যবসার কাজ কর্ম শেখাবে তাকে। তেমন গুণের হলে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবে দেশ দেশান্তরে।

তবুও চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সপ্তডিঙ্গা। ঝাঁট দিতে, জল তুলতে কাজ করতে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ে তার বুকে। ভাসিয়ে নিয়ে যায় সুদূরে। দেখে, ধনপতি সওদাগরের বেশে বসে আছে সে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় লক্ষ্মনসা'র গোমস্তার খেঁকানিতে।—ওরে ছোঁড়া, কাজ কর কাজ কর। হা করে ভাববার সময় পাবি অনেক। পেটের কাজ কর।

চমকে ওঠে মেঘু। কাজ করে ছুটে ছুটে। ঠিক, ঠিক বলেছে গোমস্তা মশাই। পেটের কাজ কর। হতে পারে ছেলেমানুষ মেঘু। তবু নিজেকে খোঁচা দেয় মনে মনে, কি ছেলেমানুষের মত ভাবছে সে। গদীতে কাজ, কাজ লক্ষ্মনসা'র বাড়ীতে। তাদের ভিটেয় এখন নতুন ঘর উঠেছে। সাহার কর্মচারীদের বাসস্থান হয়েছে সেই নতুর ঘরে। সে থাকে লক্ষ্মনসা'র বাড়ীতে।

দিনে রাত্রে তার কত কাজ। বাড়ীতে এক রাশ বউ ঝি। গা ভরতি সোনার অলঙ্কারে ঝলমল। রামধনু রংএর তাঁতের শাড়ীর খস্ খস্। চাপা খিল্ খিল্ হাসিতে অন্দর মহল জমজমাট। রাত্রেও কত কাজ। এই অন্দর মহলেও কত ফাই ফরমায়েস। পানের বাটা দাও, আলতা চিরুনি পেড়ে দাও, অমুক শোবার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দাও একটু। থাকলই বা ঝি চাকরানি। বোকা হাব্লা এক ফোঁটা ফুটফুটে মেঘুকে দিয়ে কাজ করাতে ভালও লাগে। মদনসা'র ব্যাটা। ছোঁড়াটা বেশ ভাল। আয়রে মেঘু, আয়, একটু মাথাটা টিপে দে, ডলে দে একটু হাত পা পিঠ। চুল এলিয়ে শাড়ী বিছিয়ে সুন্দরীরা মেঝেয় গড়াগড়ি দেয়। স্বামীরা গদীবাসী, সময় নেই আসার। শরীর আপনি ঢলে পড়ে, আইঢাই করে, ব্যথায় খিল ধরে যায়। আর মেঘু খিল ছাড়ায়। অসম্বৃত অর্দ্ধনগ্ন ব্যথা জরজর দেহে আরাম এনে দেয়।

প্রতিদানে কখনো জোটে অসহ্য আদর ও সোহাগ। নরম তুলোর মত তাকে চটকে চুপসে দেয়। হাঁফ ধরিয়ে দেয়। বারো তেরোর রক্তে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রনা ও উত্তেজনা অনুভূত হয়। ইচ্ছা করে চীৎকার ক'রে কাঁদতে। আচমকা একটা বিচিত্র কল্পনা পেয়ে বসে তাকে। কল্পনা করতে চেষ্টা করে মায়ের কথা। মা, সে মেঘুর মা। মেঘু তার বুকে পড়ে জাপটা জাপটি ধস্তাধস্তি করছে।

না, কিছুতেই ভাবা যায় না। দেহে শুধু এদেরই স্পর্শের যন্ত্রনার ছুঁচ ফুটতে থাকে। এর উপরেও উপরি পাওয়ানা আছে। একটা পয়সা, একটু আচার, পুরনো একখানা রেশমী রুমাল নয় তো বড় বড় খেলার কড়ি। এমনি অনেক সময়, অনেক কিছু।

কাজ, কত কাজ। ঘরে বাইরে কাজ। দিনে রাতে কাজ। পেটের কাজ। কাজ শেষ হয় অনেক রাত্রে। ছুটি যখন হয়, তখন নিশুতি রাত। খিদেও পায় অসহ্য। কিন্তু ভাত রোচে না। কেন, কে জানে। কচি দাঁত দিয়ে খালি কুটুস্ কুটুস্ করে কাঁচা লঙ্কা চিবোয় আর গরাস তোলে। যখন নাক মুখ কান সব জ্বলতে থাকে তখন খাওয়ার আরাম কিছুটা হয়। ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

তারপর শোয়ার আগে চলে যায় লক্ষ্মণসা'র ঠাকুর ঘরের পেছনে, অন্ধকার মাঠ ও বাগানের ধারে। ঝিঁঝিঁর ডাক আর জোনাকির ঝিকিমিকি। ঠাকুর ঘরের সেবক বোষ্টমের দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে আসে, রাধে মাধব!

মেঘু অজান্তে আকড়ে ধরে গলার তুলসী মালা। টানে জোরে জোরে। ছিড়ে ফেলবে যেন এখুনি। বাবার সেই মৃত্যু দৃশ্য মনে পড়ে যায়। সারাদিনের গোলামী ক্লান্ত দেহ কাঁপতে থাকে থর্ থর্ করে। মদনাসা'র ব্যাটা গোলাম মেঘু। ধনপতি সওদাগর চাকর খাটে লক্ষনসা'র গদীতে! লক্ষনসা'র সপ্তডিঙ্গার পাটাতন ঝাঁট দেয়। ছেঁড়া ন্যাকড়া পরনে। কৃশ দেহ উসকোখুসকো চুল। ভীত অসহায় চোখ। ধনপতি সওদাগর।

কিন্তু অভিশপ্ত সওদাগর হয়নি সর্বস্বহারা? আল্গোছে হাত সরিয়ে নিয়ে আসে মেঘু তুলসীমালা থেকে। সব হারিয়ে সওদাগর ফেরেনি পথে পথে? ভিক্ষা মাগেনি দোরে দোরে? সওদাগরের বউ মাথা কুটেছে লক্ষ্মীর কাছে। ধান পান গুপুরি সিঁদুর দিয়ে কেঁদে পুজো করেছে। দোরে দোরে ঘট আর আমের পল্লব দিয়ে লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করেছে। সওদাগরও বউয়ের সঙ্গে কুটেছে মাথা।

আবার একদিন ডুবন্ত সপ্তডিঙ্গা ভেসে উঠেছে সপ্তসিন্ধু পারে। ভিক্ষুক আবার হয়েছে সওদাগর।

আশা মরে না! রক্তের মধ্যে তার বানিজ্যের ডাক। ভেতরে ভেতরে তার সেই প্রবল বাসনা-ই মাঝে মাঝে তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে, ধিক্কৃত করে। সে কারবার করবে। ঘুনসীতে চাবি বেঁধে বসবে গদীতে। হবে মস্ত মহাজন।

অভিজ্ঞ স্থির বুদ্ধির ভাবনা নয়। কিশোরের স্বপ্ন। ভাবনা ও কিশোরের মত। কিন্তু মন ওই দিকেই পড়ে থেকেছে। বংশের রক্তধারা নিয়ত বয়ে চলেছে এক স্রোতে!

এই করে বছর ঘুরল। দু'বছর গেল। তারপরে আবার এল ভাগ্যের তাড়না। লক্ষনসা'র গদীতে হল সামান্য ক্ষতি। এত সামান্য যে, আকাশের কোটি নক্ষত্র থেকে একটি খসে পড়ার মত সামান্য, দৃষ্টির বাইরে।

কি ব্যবস্থা করা যায় এর। ব্যবস্থা মাত্র একটাই তারা করে। ডাকা হল নসীরাম গনক ঠাকুরকে। ঠাকুর এল। কালো কুচকুচে মুখে সাদা মোটা তুটো ভ্রূ নাচিয়ে এল গদীতে।

চিন্তিত লক্ষনসা' বলল, শুনে দেখুন ঠাকুর, ক্ষতি হল কেন। এ কিসের লক্ষণ? ঠাকুর কাঁচা উঠানে বসল কাটি নিয়ে। সাদা ভ্রূ নাচে টুক্ টুক্। এদিক ওদিক দেখে কুত্‌কুত্‌ করে। সরকার, গোমস্তা, চাকর, নোকর, কর্তা, ছেলে, সবাইকে। তারপর ঘর কাটে ষোল খুপরি, মন্ত্র আওড়ায় বিড়বিড় করে।

গদীর উঠানে রোদ। সাঁ করে নীচু দিয়ে উড়ে গেল একটা চিল। তার চকিত ছায়া পড়ে নসীরামের আঁকা ষোল ঘুপরি ঘরে। নসীরাম সাদা ভ্রূ তুলে লক্ষ বছর বয়সী বুড়োর মত গালে হাত দিয়ে আবার তাকায় এদিক ওদিক। তারপরে এক নজরে তাকিয়ে থাকে মেঘুর দিকে।

হয়েছে। পাওয়া গেছে ক্ষতির সন্ধান।

রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষারত লক্ষনসা চোখ বড় করে তাকিয়েছিল। তাকে গিয়ে কানে কানে বলল নসীরাম, মদনাদাশের অলক্ষী ছায়া ঘুরছে তোমার গদীতে। সেই ছায়া হল মদনার ব্যাটা মেঘু। ওকে বিদায় কর।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। একটু অবাক হল না কেউ। হল আতঙ্কিত। স্বস্তির সঙ্গেই আতঙ্ক। একটুও গোলযোগ মনে হল না। মনে হল, ঠিক আসল জায়গাটি দেখিয়েছে নসীরাম। কেন যে মাথায় আসেনি। সত্যি মদনের পেছনে ঘোরা সর্বনাশী তো ঘুরছে মেঘুর পেছনে।

অতএব বিদায় কর ওই ছোঁড়াকে। দূর কর ওই কালো মেঘকে। যেমন কথা তেমনি কাজ। এক কাপড়ে বিদায় হল মেঘু। খাওয়া পেয়েছে পড়ে পাওয়া ষোল আনা হিসাবে। পাওয়ানা তার কিছুই নেই। মরা বাপের দেনাই এখনো বাড়ছে চক্রাকারে!

মেঘু বোঝা না বোঝার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকে হা করে। বাজারের ব্যাপার। লালমিঞা হা করে দেখছিল ব্যাপারটা। চাটগেঁয়ে লালমিঞার বিস্কুটের গদী লক্ষনসা'র গদীর পাশে। গদী বলতে ঠিক দোকান বোঝায়

না। যেখানে মহাজনের খোদ কারবার চলে খুচরো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, সেই দপ্তরকে বলে গদী। লালমিঞার আছে মস্ত বড় বিস্কুটের কারখানা। বহু দূর দেশ অবধি বিস্তারিত তার কারবার। বেশ ধনী মুসলমান।

পীর দরগা মানত গনত, এসবে তার অকুণ্ঠ বিশ্বাস। কিন্তু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তার খোদাভক্ত হৃদয় গলে গেল। মদনসা'র কথাও জানত সে। খাঁটি মানুষ অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু খোদা তাকে দেয়নি, সে কি করবে। তা বলে এই ছেলেটার কি গোস্তাকি। খোদা! মর্জি কর, ফরমান জারী কর, বাচ্চাটাকে লাগিয়ে দিই তোমার লালমিঞার গদীতে, নয় কারখানায়। সে ডাকল, 'শোন্ তো সোনা মেঘু।'

মেঘু তখন বোঝা না বোঝা থেকে, ঠিক কথাটি বুঝেছে। বুঝেছে এক অভাবিত অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়েছে সে। কথা নেই তার মুখে। একটা যন্ত্রণাকাতর বোবা বাচ্চা জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। কিন্তু তার কিশোর হৃদয়েও ক্ষোভে দুঃখে অপমানে যে কি ভীষণ ক্ষয় ধরেছে, কেউ জানত না সেকথা।

সে শুনল লালমিঞার ডাক। কিন্তু জবাব দিতে পারল না। সকলের ঘৃণিত, অপমানিত নজর ব্যূহ থেকে বেরিয়ে গেল সে। না থেমে চলতে লাগল। জোরে আরো জোরে। প্রাণপণে ছোটো। ঘৃণা ও অপমান, গোলামী ও অফুরন্ত ক্ষুধা তাড়া করে আসছে। ছোট ছোট দুরন্ত মেঘের মত। কাল বৈশাখীর সর্বনাশা মেঘের মত, বিদ্যুৎ ঝলকে, বজ্র ছড়িয়ে ছুটে চল্ মেঘু, মেঘ, মেঘা, মেঘনাদ।

হ্যাঁ, বজ্র জ্বলছে তার সর্বাঙ্গে। অজান্তে জল নেমে এসেছে চোখ ছাপিয়ে। কত কি, কত কি মনে পড়ছে। কে যেন বলেছিল, বলতও অনেকে অনেকবার, পিতৃমুখী পুত্র জীবনে কোনদিন সুখী হয় না। তার কৈশোর রক্তে সেই সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবাদের সন্দেহ প্রকট হয়ে উঠেছে। সে যে তার বাপের মত অবিকল দেখতে। আরও কত কথা। অনেক কথা।

সে ছুটে চলল মাঠ ঘাট নালা গ্রাম গ্রামান্তর পেরিয়ে। পথের দিশা নেই। জল জঙ্গল মাড়িয়ে, মাথা সমান কাশবন দিয়ে ছুটে এসে থম্‌কে দাঁড়াল।

পায়ের সামনে ধলেশ্বরী নদী। ধলেশ্বরীর ধবল জলের ঢেউ আছড়ে এসে পড়ল পায়ের উপর। সবুজ শস্য ভরা মাটির মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে শুভ্র ধলেশ্বরী।

এখানে ডুব দেবে মেঘু। বাঁকা শালের খালে ডুব দিয়েছিল নয়নসা'র বউ, আর ওঠেনি। কেন ওঠেনি, সে তা জানে। বালক হলেও জানে। পানু চকোত্তি ডুব দিয়েছিল, আর ওঠেনি।

সে তেমনি ডুব দেবে! টান মেরে ছিড়ে ফেলল সে গলার তুলসীর মালা। ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে, ঝাঁপ দিতে গিয়ে থমকে গেল। কি যেন ঝপ করে পড়ল একটা পাড় থেকে জলে।

তাকিয়ে দেখল, সাপ। মস্ত কালো সাপ, সাদা জলের উপর মন্থর গতিতে চলেছে এঁকেবেঁকে। মানুষের সাড়া পেয়ে, ভয় খেয়ে জলে নেমেছে।

চকিতে মেঘুর দৃষ্টি পরিবর্তন হল। ভয়ে ও কৌতুহলে আড়ষ্ট শরীর তার। কি বিচিত্র কিশোর মন। কিশোর নয়,, বোধ হয় সমগ্র মানুষেরই। ঝাঁপ দিতে ভুলে গেল সে। বিস্মিত ভয়ে তাকিয়ে রইল স্রোতের বিরুদ্ধে চলা সেই সাপটার দিকে।

চমকে উঠল মেঘনাদ। ছিড়ে গেল ভাবনার জাল। ট্রেন ব্রেক করেছে আর লীলা, তার বউ ঝুমি একেবারে ঢলে পড়েছে তার বুকে।

কয়েক মুহূর্ত অসাড় আড়ষ্ট নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল সে লীলার দিকে। তীব্র ঝকঝকে কালো লীলার মুখ। আয়ত শানিত চোখ। আচমকা ঘুমভাঙ্গা, লাল ছড়্ কোটা চোখেও তার কি অদ্ভুত চক্‌মকানি। তার রক্তাভ ঠোঁট, সুগঠিত কাঁধ, আধখোলা পুষ্ট বুক, সবই চক্‌চক্ করছে। আচমকা ঢলে পড়ে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে মেঘনাদকে। চকিতে কাঁটা দিয়ে উঠল মেঘনাদের বুকে। ধলেশ্বরীর বুকে সেই কাল নাগিনী যেন পেঁচিয়ে ধরেছে তাকে।

সে ছাড়াবার চেষ্টা করল। লীলা ছাড়ল না। হাসি ও অভিমান তার ক্ষণে ক্ষণে। নিয়তই ছোটখাটো জেদ্ করা তার চারিত্রিক ধর্ম। খুনসুটি করা

তার স্বভাব। লজ্জার বালাই কম। পরপুরুষের সামনে নেই ভয় ও সঙ্কোচ। মনের মত মানুষ হলে হলাগলারও সীমা থাকে না। কিন্তু কতখানি, সে পরিমাপ বোধ তার নিজের। কার কতখানি অধিকার, সেটুকু নির্ভর করে তার নিজের উপর। আবার, এই হলাগলা এই রাগরাগি। অধিকার বোধ, হুকুম, চীৎকার, হাসি, কান্না ও রাগ অভিমান, সব মিলিয়ে নিজের পরিচয়ে অদ্বিতীয়া। বিয়ে ও বিয়ের আগে, দুই জীবনের সমষ্টিগত ফলস্বরূপ আজকের এই ঝুমি।

মেঘনাদ ছাড়াবার চেষ্টা করল। সে ছাড়লে না। অনেকক্ষন থেকে সে দেখেছে মেঘনাদের এই ভাব। লীলার সঙ্গে একটা কথাও সে বলেনি। বলেনি প্রায় গত কয়েকদিন থেকে। তাতে রাগ হয়েছে, অভিমান হয়েছে ঝুমির। তার দাম সে খুব কমই পায় মেঘনাদের কাছ থেকে। তবুও হয়, কাছাকাছি লাগালাগি থাকতে গেলেই হয়। কে রোধ করতে পারে।

যে-ই পারুক, লীলা পারে না। তাকে যত বাধা দেবে, সে তত বাড়বে। যত চাপবে, তত উঠবে। নিজের অধিকার তার বিবেচনাধীন। আর সে অধিকারকে সে ক্ষুন্ন হতে দিতে চায় না কোন সময়েই। তবে, পেরে ওঠে না সব সময় মেঘনাদের সঙ্গে। সময়তে মেঘনাদও অবশ্য হার মানে। মানতে হয় রাগে, ক্ষোভে, যখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তাতে অনেক সময় ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়। তবুও। লীলা প্রাণচারিনী! বুদ্ধি তার কাছে বড় জিনিস নয়। আবার মেঘনাদের জীবনে সে জড়িয়ে আছে, তবু যেন শিকড়হীন। শুধু প্রাণের আবেগে চলার গতি-ভঙ্গিই বোধ হয় এমনি।

এই যে হাত টানাটানি, একটুও খেয়াল নেই কামরার লোকেরা তা দেখছে কিনা। দেখছে অবশ্য দু'একজন। কেউ নির্বিকারভাবে, কেউ বিকারগ্রস্থ বিস্ময়ে কিংবা বিরক্তিতে। কেবল, দিব্যি হাসছে সেই ছেলেটা। যেন ঘরের ছেলে, ভারী মজা পেয়েছে, এমনি তার হাসিটি। লীলা তীব্র গলায় বলল, কি হয়েছে তোমার? হয়েছে কি?

আরও বিরক্ত হয় মেঘনাদ। মুখটা তার আরও কঠিন হ'য়ে ওঠে। ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে জবাব দেয়, তার কিছুই হয়নি।

এই নিঃশব্দ জবাব শুধু কঠিন নয়, একটু করুণও বটে। ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে বাঁকা চোখে তাকাল সে মেঘনাদের দিকে। নাকের পাটা ফুলে ঝিকমিকিয়ে উঠল নাকচাবি। তারপর দুরন্তভাবে ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। আপন মনে আঁচল গোছাল, ব্লাউজটা দিল টেনে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুক যেমন উদাস, তেমন উদাস হয়ে পড়ল। তারপর আবার মেঘনাদের দিকে তার বিশাল শাণিত চোখের খোঁচা দিয়ে বলল, যেন আমি একটা কিছু অপরাধ করেছি। ভাবখানা, যেন তোমাকে কেউ রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে! মরণ! মুখ দেখতে নেই এসব মানুষের।

বলে আবার ঝামটা দিয়ে সরিয়ে নিল মুখ। আর বেঁকে উঠল তাম্বুলরঞ্জিত রক্তিম ঠোঁট।

কিন্তু যাকে বলা, তার খেয়াল নেই তার বোধ নেই। আবার চেতনহারা হয়ে পড়ছে সে।

কেবল, হে, হে করে হেসে উঠল সেই ছেলেটা। এই নাটকের একজন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কবান দর্শক।

হাসি শুনে লীলাও তাকাল। আশ্চর্য! অমনি তারও মুখে যেন একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল।

সুযোগ বুঝে ছেলেটা আরো একটু হেসে পুরনো গল্পটা ফেঁদে বসার উপক্রম করল। কিন্তু, অবাক! লীলাবতী ঝিমুচ্ছে। চোখের পাতা আধ বোজা। চাপা হাসি সরল হাসির মত ছড়িয়ে পড়েছে সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখে স্বপ্নের ব্যঞ্জনাতে।

ছেলেটা বিস্মিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত লীলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে ফেলল। কেন যে হেসে ফেলল, তার সঠিক কারণ জানা নেই। লীলার ঘুম দেখে হাসি তার আপনি এসে পড়েছে। কিন্তু গান ধরবার তার সাহস হল না। খানিকক্ষণ একবার এদিক, একবার ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ ডাকল, 'বাবু!'

মেঘনাদকে ডাকছে। কিন্তু মেঘনাদ তা বুঝতে পারেনি। সে ডুবে গিয়েছিল নিজের মনে। আবার ডাকল সে, 'বাবু!'

মেঘনাদ ফিরে তাকাল। কি ভয়ঙ্কর মুখ! মস্তবড় তামাটে মুখটাতে রক্ত ফুটে উঠেছে। গোঁফজোড়া রয়েছে খাড়া হয়ে। সজারুর কাঁটার মত উঁচিয়ে উঠেছে। কথা নেই, শুধু তাকাল ছেলেটার দিকে!

ছেলেটা সসঙ্কোচে এক গাল হাসল। হেসে বলল, 'রাত কাবার হতে চায় না। একটা বিড়ি দিবেন?'

খুবই পরিষ্কার কথা। সহজ প্রার্থনা। তবু মেঘনাদ খানিকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল ছেলেটার দিকে। শুনেছে, তবু যেন বোধগম্য হয়নি, এমনি ভাবে তাকিয়ে রইল। আর ছেলেটা ভাবল, বাবু চটে গেছে। রাগ করেছে ভীষণ। ওই মুখের দিকে, চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তার। সঙ্কোচ হচ্ছে। ভয়ও যে একেবারে না করছে, তা নয়।

কিন্তু মেঘনাদ একটি কথাও না বলে পকেট থেকে বার করল এক গোছা বিড়ি। দৈনিক সে শতখানেক বিড়ি খায়। যারা চেনে মেঘনাদকে, তারা মুখে বিড়িহীন মেঘনাদের কথা চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু সেই মেঘনাদ গতকাল থেকে বিড়ি খায়নি একরকম। খাওয়ার অবসর পায়নি, মনেও হয়নি খাওয়ার কথা।

এক গোছা বিড়ি সবই ছেলেটার কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলল সে। এক রাশ ছুঁচো বাজির মত ছড়িয়ে পড়ল বিড়িগুলি। তার সঙ্গে একটা আধ ছেঁড়া বিড়ির বাণ্ডিলের কাগজ। সেই কাগজে ছাপা রয়েছে একটা মেয়েমানুষের মুখ।

একটার বদলে এতগুলি! ছেলেটা বিস্ময়ে ও অস্বস্তিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল মিনিট খানেক। কিন্তু মেঘনাদ যেন ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে আবার চলে গেল তার পথে। ফিরে যেতেই হবে। যেতে হবে সেই পাগল বাঁশীর সুরে সাড়া দিতে। সে যে বিষের বাঁশী।

ছেলেটা তুলে নিল বিড়িগুলি একটা একটা করে।

গাড়ী থেমেছিল, আবার চলতে আরম্ভ করেছে। ভলকে ভলকে ছড়িয়ে দিচ্ছে কালো ধোঁয়ার রাশি আর কয়লার গুঁড়ো। তারই সঙ্গে জোনাকির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ।

মেঘনাদ এই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। দেখতে দেখতেই আবার মনে পড়ে গেল সেই মেঘুর কথা। নদীর উত্তাল তরঙ্গে ভাসা একটা শুকনো পাতার মত সেই ছেলে ভেসে গেছে ধলেশ্বরীর স্রোতে।

নদীতে ঝাঁপ দিতে পারল না। বরং তার আতঙ্কিত কিশোর চোখে ভেসে উঠল, বাঁকাশালের খাল আর জল থেকে উদ্ধার করা নয়নসা'র সেই মরা বউ। ফোলা শরীর, ছ্যাত্‌লা লাগা, শেওলা পড়া, কচুরিপানার শিকড়ের মত এলানো চুল, বীভৎস মূর্তি। ডুব দিলে সেই নয়নসা'র বউ তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরবে। জড়িয়ে ধরবে পানু চক্কোত্তি। বোগড়া দাঁত বের ক'রে বলবে, 'আয়, তোর জন্যেই এই ধলেশ্বরীর জলের তলায় আমরা ওৎ পেতে বসেছিলাম।'

না, না, ওদের হাতে যেতে চায়না মেঘু। মেঘু মরতে চেয়েছিল। কিন্তু মরণের চেহারা যে এমন রূপে দেখা দেবে, তা' সে জানত না।

তার ছোট হৃদয়ের অসহ্য উত্তেজনা যখন কিছু কমল, তখন আবার কান্না এল তার। নিজেরই অজ্ঞাতে উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠল সে।

বিকাল হ'য়ে এসেছে। নতুন হেমন্তের লাল আকাশ উদার গম্ভীর ও করুণ। সাপটা কখন অদৃশ্য হয়েছে। কল্‌ কল্‌ ক'রে ধলেশ্বরী আপনমনে চলেছে গান গেয়ে। লাল আকাশের ছাপ প'ড়ে লজ্জারুণ হ'য়ে উঠেছে।

মেঘু শুনল, তার বাবা তাকে ডাকছে। ডাকছে, 'মেঘু, উঠে আয় বাবা ওখান থেকে।'

মেঘু ফিরে দেখল, উস্‌কো খুসকো চুল, ক্লান্ত ঘর্মাক্ত তার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পেছনে। মেঘু বলল, 'কোথায় যাব ?'

বাবা বলল, 'অনন্তির ঘাটে।'

'কেন ?'

'সেখান থেকে গহনার নৌকা ছাড়বে। গোয়ালাদের নৌকা যাবে। তুই সেই নৌকায় ক'রে চলে যা। তুই বললে, ওরা তোকে বিনা পয়সায় নিয়ে যাবে।'

'কোথায় যাব ?'

'যেখানে তোর খুশি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, দেশ হতে দেশান্তরে। যেমন ক'রে ঘুরেছি আমি, তেমনি ক'রে। সাহা ঘরের ছেলে তুই লক্ষ্মীর খোঁজ না করলে তোর পাপ হবে। সাহারা কেউ অলক্ষ্মীর ছেলে নয়। তুই যা।'

'বাবা !' আবার গলা বন্ধ হয়ে আসছে মেঘুর।

বাবা বলল, 'ভয় নেই। কাঁদিসনে মেঘু। যেখানে যাবি, সেখানেই দেখতে পাবি তোর বাবার চোখের জল। চোখের জলে কিছু হয় না। ভয় নেই, ভয় নেই বাপ্ আমার। নৌকা ছাড়ার সময় হল। তুই বেরিয়ে পড়।'

বাবার নিশ্বাসের হাওয়া লাগল মেঘুর গায়ে। ঠাণ্ডা নিশ্বাস। তাকিয়ে দেখল, বাবা নেই। কেবল দূরের অনন্তির ঘাটের আকাশে দেখা যাচ্ছে নৌকার মাস্তুল। এলানো পাল উড়ছে পত্‌পত্ ক'রে। আর একটা ডাক ভেসে আসছে, হে-ই, ফতুল্লা, চাষারা, ঢা···কা···ই। মাঝি ডাক দিচ্ছে। মেঘু এগিয়ে চলল অনন্তির ঘাটের দিকে।

ভেসে গেল মেঘু। ধনপতি সওদাগর ভেসে গেল সপ্তডিঙ্গার সন্ধানে। প্রথমে ঢাকা শহরে। সেখান থেকে অন্যান্য জেলার শহরে শহরে। কখনো চাকরের বেশে, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গী হিসাবে, নদীতে মাঝির সাহায্যকারী হয়ে। কখনো বন্দরের কুলি হ'য়ে, দোকানের কাজে, কীর্তনের দলের দোয়ারকি হয়ে, রুটি বাকরখানির কারখানায়।

প্রতিটি ধাপ এক একটি ছবির মত। অনেক ছবি, গায়ে গায়ে অত্যন্ত ঘিঞ্জি ও ঠাসাঠাসি সাজানো। একটা দেখতে গেলে আর একটা ভেসে ওঠে।

মেঘু যেখানেই গেছে, প্রথমেই তার সুন্দর মুখের সর্বত্র জয় হয়েছে। পেয়েছে করুণা। তারপরেই এসেছে পীড়ন। এসেছে নানানভাবে।

দিন চলে গেছে। তুই, তুমি, শুনতে শুনতে 'আপনি' সম্বোধন শুনে অবাক হয়েছে সে। সম্মানের জন্য নয়। বড় হয়েছে সে।

ভাবতেই রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল তার শরীর। নিজের দিকে একদিন তাকিয়ে দেখল সে। তার ডাগর হাত পা বুক। স্ফীত লোমশ শরীর। আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে, দেখল কালো গোঁফের সুস্পষ্ট রেখা।

তখন সে ঢাকা চকবাজারে একটা কিস্কুটের কারখানায় কাজ করে। দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি। কারখানার জনা বারো লোকের মধ্যে প্রায় সকলেই তাকে ভয় ও ভক্তি করে।

এক নবতর চেতনায় তার মন আনন্দে ভরে উঠল। তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে, সারাদিনে কাজ ক'রেও মন ভরে না তার। বাকী লোকের কাজ করে দেয়। দরকার হলে আশেপাশের লোকের কাজেও সাহায্য করে। তার চরিত্র, দেহ ও মন, সব মিলিয়ে সকলের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হ'য়ে ওঠে।

একদিকে তার দেহে ও মনে এই অপরিসীম শক্তি ও আবেগ, অন্যদিকে একটা অসহ্য বেদনাবোধ। কিসের বেদনা সে বোঝে না। থেকে থেকে মন ভার হ'য়ে ওঠে, বিষাদ ভর করে তার শরীর ও মন জুড়ে। মনে পড়ে খালি দেশের কথা। তাদের হাতছাড়া ঘর, লক্ষণসা'র গদী আর বাড়ি, সেই দেশ। আর কেবলি মনটা চমকে চমকে ওঠে লালমিঞার কথাটা মনে ক'রে। সেই শেষ কথা, 'শোন্ তো সোনা মেঘু।' কি মিষ্টি, কি আদরের ডাক! কেন এত আদর ক'রে ডেকেছিল লালমিঞা!

একদিন মাঝরাত্রে এই চিন্তাটা ঘুমোতে দিল না তাকে। তার ঘুমহীন চোখে শুধু দেশের হাতছানি।

অন্ধকার টিনের ঘর। ঘরের অর্দ্ধেক জুড়ে ইঁটের উনুন। উনুন নয়, সেটাও বিরাট অন্ধকূপ বিশেষ। ফোকড় দিয়ে লাল আগুনের আভা দেখা দিচ্ছে। মেঘুই আগুন দিয়ে শুয়েছিল। সে উঠে পড়ল।

উঠে তার টিনের সুটকেশের তালা খুলে বার করল একটা ময়লা ন্যাকড়ার পুঁটলি। তার সঞ্চিত অর্থ।

এই চুলা ঘরের মধ্যে সে একা নয়, অনেকেই শুয়ে আছে গাদাগাদি করে। কিন্তু গোপনতার কিছু নেই। লম্ফ জ্বালিয়ে হিসাব করতে বসল সে, কত জমেছে। পাই পয়সা, আধ পয়সা, পয়সা, আনি দুয়ানি টাকা নোট!

সব মিলিয়ে কুল্যে শ' তিনেক টাকা আর কিছু খুচরো। ছ' সাত বছরের সঞ্চয়।

ধনপতি সওদাগর আর সপ্তডিঙ্গা? কই, তেমন তো আর মনে পড়ে না। তবে, ভেতরে ভেতরে তার একটা আকাঙ্ক্ষা আজও মরেনি। জানায় অজানায়, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সেই আকাঙ্ক্ষার চারা গাছের গোড়ায় সে মনের রস কিন্তু ঢেলে এসেছে। আজও জানে না, খোঁজও ঠিক রাখে না, সে কত বড় হয়েছে। কিন্তু বংশের সেই রক্তধারার মধ্যে আজও সেই একই মুখে স্রোতের টান। সে অহরহ ধাবিত তার পথে।

আজ এই টাকা তার জীবন মরণের সম্বল। মরলে, লোকে পোড়াবে এই টাকা দিয়ে কাঠ কিনে। বেকার হলে, এই রক্ত জমানো টাকা ভেঙ্গেই খেতে হবে তাকে। হোক্। তবু আর তার মন বসছে না এখানে। তার রক্তে আবার দোলা লেগেছে। এই সামান্য টাকা মূলধন হতে পারে না। তবু ফিরে যেতে হবে একবার নিজের দেশে। কিছু না হোক্, একটা নতুন কাজ জুটতেও পারে। একবার লালমিঞার সঙ্গে দেখাটাও হবে। তার তো বিস্কুটের কারখানা আছে। যদি কিছু না হয়, ফিরে আসতে কতক্ষণ।

পরদিনই সে কারখানা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। এল দেশে, দেশের বাজারে। ভেবেছিল, উঠবে লালমিঞার গদীতে। কিন্তু সেখানে ঝাঁপ বন্ধ। গদীর অদূরেই তার কারখানা। যেখানে চিমনি দিয়ে সব সময়েই ভলকে ভলকে ধোঁয়া বেরুত। ছোটকালে মেঘু মনে করত, ওটাও একটা জাহাজের চোঙ্গা। কিন্তু কই, ধোঁয়া বেরুচ্ছে না তো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। লক্ষণসা'র গদীও নিঝুম। কিন্তু বাতি জ্বলছে। বাজারের কিছু কিছু লোক অবাক হয়ে এই অপরিচিত লোকটিকে দেখছিল। ঠিক দূর দেশের অপরিচিত মাঝির মত নয়, লঞ্চ ষ্টীমারের খালাসীও নয় যেন ঠিক। মুখখানা ঠিক চেনা নয়, অথচ যেন চেনা চেনা। কার মত? সেই হতভাগা মদন দাশের মত নাকি অনেকটা!

মেঘু বুঝতে পারছিল তাদের ভাবখানা। তার হাসিও পাচ্ছিল, কষ্টও হচ্ছিল। ওই তো বদরুদ্দিন, চালের আড়তের মহাজন বসে রয়েছে। ওই তো

জ্ঞানসা, কাপড়ের দোকানের কোণের তুলসী গাছের টবে জল ঢালছে। কিন্তু লালমিঞা কোথায়?

কারখানার কাছে এসে দেখল, সেটা শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সামান্য কয়লার গুঁড়ো আর পোড়া কাঠ ছড়িয়ে রয়েছে শ্মশানের মত। মস্ত বড় টিনের ঘর। ভেতরটা অন্ধকার। কিন্তু লোক কই!

কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল, বড় উনুনটা পরিত্যক্ত, কাঠ বেড়া যাবতীয় জিনিষের স্তূপ হয়ে উঠেছে। একটা ছোট হাত তণ্ডুলে জনা তিনেক কাজ করছে। তণ্ডুল, এই উনুনেরই আর এক নাম। একজন প্রায় বৃদ্ধ মানুষ, নুয়ে পড়ে কথা বলছে একজনের সঙ্গে। যার সঙ্গে কথা বলছে, সে বেশ ফিটফাট, পরিচ্ছন্ন মানুষ।

বৃদ্ধ লোকটির দিকে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই চমকে উঠল মেঘু। লালমিঞা! ছেঁড়া লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি, তণ্ডুলের ধোঁয়ায় কালো শরীর। একি অভাবিত ব্যাপার! অতবড় গদীর মালিক, ধনী লালমিঞার এই বেশ!

লালমিঞা বাইরে মানুষ দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে?'

মেঘু এক মুহূর্ত ভাবল। তারপরে জবাব দিল, 'আমি মেঘু।'

'মেঘু?' অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করল লালমিঞা, 'মদনসা'র ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিলি, অ্যাঁ? আয় আয় বাপ্। বোস, তারপরে কথা বলছি।'

বলেই লালমিঞা সেই লোকটির দিকে ফিরে তার হাত দুটি ধরে কি যেন বলল।

সেই লোকটি কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল কঠিন মুখে।

মেঘু সামনে এসে দেখল, লালমিঞার চোখ ছল্ ছল্ করছে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মেঘুকে অভ্যর্থনা করল সে। নিজের কথা ভুলে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল মেঘুকে। গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'ওরে, বাপরে, এত বড় হয়েছিস। মদনদা'কেও যে ছাড়িয়ে গেছিস। বোস্ বোস্। আসরফ, হরির দোকান থেকে দুই পয়সার মুড়ি বাতাসা নিয়ে এস। এক পালি জল দাও।'

মেঘু বলল, 'থাক না'—

'থাকবে কেন ? এবার বল্, কোথা থেকে এলি ?'

মেঘুর কথা সরে না মুখে। কি ব্যাপার। বড় তন্দুল খা খা করছে। ছোট তন্দুলে কাজ করছে মাত্র জনা কয়েক। সব দেখতে দেখতেই সে নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিল, 'এলাম ঢাকা শহর থেকে।' বলে বিস্মিতগলায় ডাকল' 'চাচা এসব'—

লালমিঞা ভীত সন্ত্রস্তভাবে তাড়াতাড়ি দু'হাতে মেঘুর হাত ধরে বলল, 'থাক্, ওসব কথা পরে হবে মেঘু।'

মেঘু চুপ করল। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে আচমকা ব্যথার মোচড়ানি দিয়ে বুক্টা টন্‌টন্ ক'রে উঠল তার। কোন কথা নয়, শুধু লালমিঞার মুখের দিকে তাকিয়েই এক গভীর দুঃসংবাদের সঙ্গে দারুণ যন্ত্রনার সন্ধান পেল যেন সে।

হ্যারিকেন আর লম্ফ জ্বলল। লালমিঞার এত বড় কারখানা ঘর। সমস্ত ঘরটা আলোকিত না হয়ে একটা আলো আঁধারির সৃষ্টি করল। তার মধ্যে ছোট তন্দুলের খোলা গহ্বরটা হা করে রয়েছে। গহ্বর মুখটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। যেন অন্ধকারের মধ্যে একটা মস্ত দানব তার রক্ত মুখ ব্যাদান করে গিলতে আসছে।

মেঘু দেখল, সামান্য ছিটের কাজ হচ্ছে। ছিটের কাজ, অর্থাৎ বিস্কুট। দেশীয় কারিগরেরা তাই বলে। সে বিস্কুটের এক এক রকমের নাম। এক এক দেশের এক এক রকম।

মেঘু দেখেছে, দুটো পেল্লাই হ্যাজাক জ্বলতো এই ঘরে। আলো হত দিনের মত। কাজ করত জনা বারো চোদ্দ। আর লালমিঞা বার্মা দেশের রেশমী লুঙ্গি পরে, গায়ে কলিদার পাঞ্জাবী চাপিয়ে গদী থেকে এসে দেখে যেত ঘুরে ঘুরে। দরকার হলে হাতও লাগাত বৈ কি।

সেই লালমিঞা। ময়লা লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি গায় দিয়ে বসে আছে তার কাছে। মনে মনে মেঘুর অস্থিরতা। মুড়ি তার গলা দিয়ে যেতে চায় না।

লালমিঞা কিন্তু সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মেঘুর দিকে! বলল, 'আর দু' পয়সার এনে দেবে ?'

মেঘু বলল, 'আর আধ পয়সারও নয়।' বলে ঘটি তুলে ঢক্ ঢক্ করে জল খেল অনেকটা।

লালমিঞা তুলল পুরণো কথা। মেঘুর বাবার কথা আর লক্ষণসা'র গদীর ঘটনা। শুনতে শুনতে সেই পুরনো দিনে ফিরে গেল মেঘু। সে বলতে আরম্ভ করল তার জীবন বৃত্তান্ত। কি ভাবে, এত বছর সে কাটিয়েছে। কোথায় কি করেছে।

শুনতে বড় কষ্ট হচ্ছিল লালমিঞার। মেঘুর অজান্তে কয়েকবার চোখের জল মুছেছে সে। লালমিঞাকে দিয়েছেন খোদা অসীম শক্তি। শক্তির পরীক্ষা তার উপর দিয়েই চলতে পারে। খোদা দিয়েছেন, একবার পরীক্ষা করবেন না! কিন্তু এই বাচ্চার উপর কেন? যাকে কিছুই দেওয়া হয়নি, তার আবার পরীক্ষা কিসের। জীবনে যে কিছুই পায়নি, খোদার মর্জির কাছে কি দিয়ে সে খিদ্‌মদ্‌গারি করবে!

মেঘুর কথা শেষ হলে লালমিঞা বলল, 'কিন্তু, এখানে কেন ফিরে এলি বাপ। এখানে তুই কি পাবি? যেখানে ছিলি, সেখানেই তো ভাল ছিলি?'

মেঘু বলল, 'চাচা, সত্যি কথা বলব?'

'বল্ তো বাবা।'

'তোমার ঘরে কাজ করব বলেই পালিয়ে এসেছি।'

'হাচা, হাচা-ই?' সুখে আনন্দে হাসতে হাসতে মেঘুর চিবুকটি তুলে ধরল সে। আর অমনি তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল। শক্তিমান পুরুষ লালমিঞা আর মেঘুর সামনে রোধ করতে পারল না চোখের জল।

বলল, 'আমার ঘরে কাজ করবি? আমার যে ঘর নেই। আমি যে ফকির হয়েছি বাবা। খোদা যে আমাকে ছেড়ে গেছে। কি দিয়ে তোকে রাখব?'

এই সর্বনাশের কথাটি চোদ্দ আনাই আঁচ করছিল মেঘু। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে হল এসব?'

লালমিঞা বলল, 'বলব, সব বলব তোকে। তুই থাকবি খাবি কোথায় বল্ তো ?'

'বাজারেই কোথাও থাকব।'

'যদি অসুবিধা না বুঝিস, আমার এ ঘরেই থাকতে পারিস্। নিজের হাতেই রাঁধবি খাবি।'

মেঘু বলল, 'বেশ তো। তা'হলে তো বেঁচে যাই।'

লালমিঞা বলল, 'তারপর লোকে যখন বলবে, মেঘু মুসলমানের ঘরে থাকে খায় ?'

মেঘু বলল, 'এ তো তোমার কারখানা। ঘর নয়। আর খাবও নিজের হাতে পাক ক'রে। পরের কথায় কি যায় আসে। সবাই তো কিল মারার গোঁসাই, ভাত দেবে কেউ ? আর কদিনই বা থাকতে পারব চাচা। চলে তো আমাকে যেতেই হবে।'

কাজ শেষে লালমিঞা মেঘুকে বলল, তার দুর্দশার কাহিনী। সে কাহিনী বাংলা দেশের এক চিরন্তন বিশ্বাসঘাতকতার নিষ্ঠুর কাহিনী। লালমিঞা দু' বছর একেবারে শয্যাগত ছিল। কাজ চলে না, গদী বন্ধ যায়। বাধ্য হয়ে সে দেশ থেকে ডেকে পাঠালো তার দুই সতাতো ভাইদের। তারা সৎ মায়ের দুই ছেলে। দেশের ঘর বাড়ি সম্পত্তি নিয়ে এই দুই ভায়ের অনেক ন্ধক্কারজনক খবর পেয়েছে লালমিঞা। তবুও ডেকে পাঠিয়েছে। এক বাবার পয়দায়িস্ তারা তিন ভাই। পেট আলাদা। তাতে কি হয়েছে ? ভাই তো! আর লালমিঞা জানে কাজ। পরিশ্রম, বুদ্ধি আর সততা তার মূলধন। লোককে অবিশ্বাস সে কোনদিন করেনি। দুস্থ সৎ ব্যবসায়ীর জন্য চিরকাল তার হৃদয় কেঁদেছে। মেঘুর বাপের কথা সে কোনদিন ভুলতে পারবে ? না, অমনি লোককে অবিশ্বাস করতে পারে কেউ! এই যে মেঘু তুই, তোকে যে অবিশ্বাস করবে, খোদা তাকে ছাড়বে না।. আসল কখনো মার খায় ? মার খায় না। খাঁটি মরে না। খোদা নিজের হাতে তার দায়িত্ব নেয়। সব সময় খোদা তাকে দৌলত দেয় না। তাকে পরীক্ষা করে। তার পরীক্ষা দিয়ে, আর একজনকে দেখে, যাচাই করে আর একজনকে। খাঁটিকে দেখে খাঁটি হতে চায়

কি না কেউ, তাই দেখে। তোর বাবা গেল। আমিও যাব হয় তো। গেছিই তো। কিন্তু সব সাচ্চা কারবারী মরবে না! দেখিস্ তুই।

লালমিঞা বলে গেল, বিশ্বাসের কি ভয়াবহ মর্যাদা দিয়েছে তার দুই ভাই। কি ভাবে তার অনুপস্থিতি ও রোগের সুযোগ নিয়ে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে তারা। দুই ভাই কি ভাবে যোগসাজোস করেছে গদী আর কারখানার কর্মচারীদের সঙ্গে। সারা বাজার গ্রাম, পরগণা শুদ্ধ লোকের সঙ্গে তাদের বিবাদ। লালমিঞার চরিত্র নিয়ে যারা কোনদিন একটি সামান্য কথাও বলতে পারেনি, তারা থু থু দিয়েছে লালমিঞার ভাইদের গায়ে।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে কিছু শুনেছে সে। গদী অপবিত্র করেছে তারা। বেশ্যা এনে তুলেছে সেখানে। দু' বছরে একটি পয়সা জমা পড়ে নি। উল্টে ঘর থেকে টাকা বেরিয়েছে। এসব খরচ সে সব জানত না। সামান্য উড়ো খবরে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার বউ তাকে সে সংবাদ দিত না। দিত না এই ভেবে, তার সোয়ামীর ব্যামো বেড়ে যাবে।

কিন্তু সে তো জানত না, তার সোয়ামীর ব্যামোর চেয়ে কত বড় ব্যামো অদৃশ্যে অজান্তে সোয়ামীর সর্বনাশ করছে। মহেশ্বরদীর মাঝের পাড়ার মেয়ে, মেঘনা পাড়ের বউ। মন তার জল ঘাসের ডগার মত নরম মিষ্টি আর সুন্দর। প্রাণ দিয়ে মহব্বত করা আর মহব্বত করে প্রাণে মরা, এই তার জীবনের রীতিনীতি। পীরিতীর অংশীদার জোটেনি বেটির কপালে, কোলে নেই ছাওয়াল পাওয়াল। লালমিঞা তার জীবন মরণ, তার খোদা, তার পয়গম্বর। রোগ ব্যামোর মধ্যে দুঃসংবাদ সে দেবে কেমন করে তাকে। তার শুধু মাথা খারাপ হত, শ্রীনগরের ডাক্তারবাবু রায় মহাশয় সপ্তাহে একবার ক'রে না এলে। বুড়ো মানুষ রায় মহাশয়। সদা হাসি মুখখানি। দেখলে রুগীর রোগ সারত, রুগীর আত্মীয়দের প্রাণ জুড়োত। ঘোড়ায় চেপে আসতেন, লালমিঞার বিবি তার সঙ্গে কথা বলত না। কিন্তু খুশি হয়ে আপনা হাতে ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াত।

তবু, ভয়ে অশান্তিতে, বিবির অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছিল। স্বামীকে না জানিয়ে সে ঘর থেকে টাকা দিয়েছে বেইমান দেবরদের। শুধু তাই না,

যখন যে কাগজ এনে টিপ সই চেয়েছে, তাই দিয়েছে। লালমিঞা রোগশয্যায় শুয়ে ভাবত, আমি দিনে দিনে ভাল হচ্ছি, বিবির কেন মুখ শুকোয় ?

তারপরে এল একদিন বিপিন। সেরা কারিগর বিপিন। লালমিঞার কারখানার জন্ম কাল থেকে আছে সে। তাকে সবাই বলত বড় মিস্তিরি। চাটগাঁয়ের মানুষ। ভারী কাজের লোক।

বিবি কি কাজে ব্যস্ত ছিল। নইলে বিপিন লালমিঞার কাছে আসতে পারত না। সে এসে বললে, তাকে জবাব দিয়েছে লালমিঞার ভাইয়েরা। জবাব! কেন? খুঁটিয়ে সব বৃত্তান্ত বলল বিপিন। সর্বনাশ! এত বড় সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে! কার রোগ, কার ব্যামো। লালমিঞা লাফ দিয়ে উঠলো বিছানা থেকে। ব্যামো তো গদীতে। ব্যামো শেষ করছে ব্যবসা।

সেই যে লাফ দিয়ে উঠেছিল লালমিঞা, সেই তার আরোগ্য হয়ে গেল। কই, আর তো সে রোগশয্যায় শোয়নি। এই তো সেই দেহ। কোথায় রোগ। রোগ ছিল তার মনে। বোধ হয় একটু আরাম চেয়েছিল সে। তাই তার রোগ কিছুতেই সারছিল না।

কিন্তু তখন শেষ অবস্থা। হাড় মাংস সব শেষ, আছে শুধু চর্বিত ছিবড়ে। তবু গদীতে এসে বসল। উল্টে পাল্টে দেখল খাতা খতেন। কারখানায় গেল। কাজ তো আপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারখানাও ফাঁকা।

মাথা গরম করেনি লালমিঞা। চুপ করে এসে বসেছে গদীতে। তার সঙ্গে বিপিন। বাদশা'র মত গদীতে বসে ঠাণ্ডা গলায় হুকুম করেছে সে তার ভাইদের, 'আজ রাত্রের মধ্যে সরে পড়তে হবে এখান থেকে। কাল সকালে উঠে ওই মুখ দেখলে, খুনের দায়ে ফাঁসী যাবে লালমিঞা।'

পালাতে পথ পেল না দুই শয়তান। ছি ছি, লালমিঞার বাপের ব্যাটারা যে এমন হারামখোর, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। ওদের দুজনের সঙ্গেই পালাল নিমক খাওয়া বেইমান কর্মচারী ক'টা।

তারপরে এল পাওনাদারেরা। সবার বড় পাওনাদার ছিল ধলাইপুরের সুলতান মিঞা। লালমিঞার সতাতো এক ভাইয়ের সে শ্বশুর।

এ সংসারের বিচারে ভালোর মাপকাটি কি হওয়া উচিৎ, সে কথা লালমিঞা যাচাই করতে চায়নি কোনদিন। দেনার নথিপত্রে বিবির টিপসই ছাড়াও অনেক দেনা ছিল, যা ইচ্ছা করলে লালমিঞা শোধ না করলেও পারত। কিন্তু সমস্ত দেনা পরিশোধ করতে বদ্ধপরিকর ছিল সে। ওটাই খোদার অভিরুচি। নইলে গদীর উপর সয়তানের নজর পড়বে।

রোগশয্যা থেকে উঠে এসে সাতদিন বাড়ি যায়নি সে। রোগ তার সত্যি একেবারে সেরে গিয়েছিল। সাতদিন ধরে নাগাড় খোঁজ খবর ক'রে সে এও টের পেল, ঘর থেকে টাকা দিয়েছে তার বিবি। বিবি তাহ'লে সবই জানত। বলেনি তাকে।

অবস্থা ভাল ছিল লালমিঞার। কিন্তু দৌলতের রোশনাইয়ে ঝক্‌ঝক্ করত না দিবানিশি তার ঘর গদী। বাদশা'-ই ফকির বনে যায়। আর এ তো সামান্য গদীর মালিক। সে শুধু নিঃশেষ হয়নি। প্রায় সর্বহারা হয়েছে। লালমিঞা বুঝল, যেভাবে স্থরু করেছিল, আবার সেইভাবে স্থরু করতে হবে। সেইভাবে স্থরু। তা' কি আর হয়। ছুনিয়া ভেঙ্গে আর একটা ছুনিয়া হয় তো গড়তে পারেন খোদা। মানুষ ভাঙ্গা বস্তু জোড়া লাগাতে পারে। কিন্তু ভাঙ্গার কলঙ্কের দাগ কি যায়! তা'ছাড়া উৎসাহ উদ্দীপনা বলে একটা কথা আছে। বয়সও কম হয়নি।

তবু যতক্ষণ পারা যায়, চেষ্টা করতে হবে।

এই সাতদিন ধরে রোজ বিবি খবর পাঠিয়েছে। লালমিঞা যায়নি। এত কাজ, তা'ছাড়া বিবির উপর অভিমানও হয়েছিল। অন্য মানুষ হলে গলায় দা' বসাত। কিন্তু হালালবৃত্তি কোনদিন রপ্ত করেনি লালমিঞা।

সাতদিন পরে বাড়ি এল। বিবি কথা বলতে পারে না। গম্ভীর হ'য়ে বলল সে, 'দলু বিবি, তোকে তালাক্ দেব ঠিক করেছি।'

দৌলতোন্নিসা তবুও তাকাতে পারল না। কথাও বলতে পারল না। খালি কাঁদল। ওইটুকু ছাড়া ওর আর কিছু ছিল না।

লালমিঞা বলল, 'ওর চোখের পানি দেখে খুব খানিকটা হাসলাম। বড় জোর হাসি পেয়েছিল। মাগী হাসি দেখে কেঁদে মরে আর কি।'

মেঘু চুপ করে সব শুনল। লালমিঞার ভাইদের সে চেনে না। কিন্তু এত বড় অভিশাপ কেন তার উপর নেমে এল, এই অবিচারের কারণটা সে বুঝল না।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত দেনা পাওনার সংবাদ সংগ্রহ করল সে লালমিঞার কাছ থেকে। তারপর সারা রাত ধরে ভাবল। ভাবল অনেক কথা। আজ আর সেকথা তার মনে নেই। কিন্তু সারারাত ঘুমুতে পারেনি সে।

পরদিন সকালবেলা লালমিঞাকে বলল, 'চাচা, একটা কথা বলব ?'

লালমিঞা বলল, 'বল্ তো বাবা ?'

মেঘু বলল, 'এত বচ্ছর বাইরে ঘুরে হাতে কিছু টাকা করেছি। শ' তিনেক হবে।'

লালমিঞা শঙ্কিত গলায় বলল, 'তবে আমার কাছ থেকে সরে পড়্ বাবা। দেখছিস্ না শয়তান রয়েছে আমার কাছে। তোর দুঃখের ধন কোন্খান দিয়ে কি হয়ে যাবে। পরে আর কেঁদে বাঁচবি না।'

মেঘুর বুদ্ধি ছিল, একথা বললে ভুল হবে। তার ছিল হৃদয়। সে আবেগভরে, সরলভাবেই বলল, 'যায় যাবে, কাঁদি কাঁদব। তোমার চেয়ে বেশী তো আমার যাবে না। সমুদ্রে এক ফোঁটা জল এই তিন শো টাকা। তবু লাগাতে চাই তোমার কারবারে।'

লালমিঞা পরিষ্কার বলল, 'আমি পারব না বাবা। তুই অন্য জায়গায় যা।'

বলেছি মেঘুর বুদ্ধি কম। হৃদয়বৃত্তি বড়। লালমিঞার কথাটা বুঝল অন্যরকম। বলল, 'আমাকে অবিশ্বাস করলে তুমি ? তোমার এক পয়সাও নেব না। তোমারটা দিয়ে থুয়ে যদি রোজ দু'পয়সাও পাই'—

লালমিঞা ক্ষেপে উঠল একেবারে। —'হারামজাদা, এক্কই চড়ে তোর বত্রিশ পাটি দাঁত আমি তুলে ফেলব জানিস্ ? 'অবিশ্বাস, আমার এক পয়সাও নিবি না' এত বড় কথা বলছিস্ আমাকে। মদনদা'র ছেলে না তুই ?'

হৃদয়বৃত্তি দুজনেরই সমান। মেঘু তো হা।

লালমিঞা বলল, 'বড় কথা শিখেছিস্। অবিশ্বাস করলাম তোকে ? ব্যাটা, দেখছিস্ না, বুড়ো হ'য়ে মরতে চলেছি। আমার দ্বারা আর কিছু হবে ?'

তারপরে দ্বিগুন উত্তেজিত হয়ে আবার বলল, 'তুই পারবি একলা সব করতে? পারবি, সারাদিন কাজ ক'রে মাল বানাতে। সারাদিন মাল বানাবি, সারা রাত্রি নিজে পাইকের হয়ে বিশমাইল দূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে, নৌকা ঠেলে মাল কাটাবি। নিজের হাতে খাতা কলম দেখবি, মাল কিনবি, টাকা দিবি। পোয়াভর ময়দারও নিক্তি ওজনের হিসাব কষতে হবে। এক পো ময়দার মাল নষ্ট হলে হলপ করে উপোস দিতে হবে। কারিগরদের খাওয়াতে হবে, ঝগড়া করতে পারবিনে। বাপ বলে পায়ে ধরে কাজ আদায় করতে হবে। আবার পীরিত করে একটা আধলাও যেদিন খসাবি, সেইদিনই তোর সর্বনাশ হবে। হাত মুঠো করবি, শিবের বাবা জানবে না কানা কড়ি আছে কি মোহর আছে। পানি গলা দূরের কথা, হাতের ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকবে না। আবার লক্ষ্মীর বাটায় যখন পয়সা দিবি, তখন প্রাণ খুলে দিবি। কিন্তু মূলধন যেদিন দিবি, সেদিন লক্ষ্মী নিজে তোর মুখে লাথি মেরে সরে পড়বে। পারবি? পারবি তুই?'

লালমিঞা কথাগুলি বলে একদমে। তার এরকম চেহারা কোনদিন দেখেনি মেঘু। দেখবার সুযোগ জোটেনি, সম্পর্কও ছিল না সেরকম। তবু, অবোধ শিশু যেমন বোঝে স্নেহের কপট ঠোনা, তেমনি অনুভব করল সে লালমিঞার ভর্ৎসনা। বলল, শান্তভাবেই বলল, 'পারব।'

লালমিঞা তবু বলল, 'পারবি? একলা হাতে সামলাতে পারবি সব? মনে রাখিস্, নিজের হাতে পায়ে মালের কাজ, আবার দেশে দেশে ঘুরে নিজের কারবার ছড়ানো। পেট ভরে খেতে পাবিনে। জাড়া বর্ষায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে দু'দণ্ড ঘুমোতে পাবিনে।'

জন্মের পর কবে পেট ভরে খেয়েছে মেঘু! কবে ঘুমিয়েছে আরাম ক'রে! জীবনে অনেক কষ্ট সে সহ্য করেছে। বহন করেছে অনেক গ্লানি। কিন্তু, সে সবই তার কাছে তুচ্ছ। সে সবই তার নতুন প্রস্তুতির প্রস্তাবনা মাত্র। যে প্রস্তুতি তার রক্তধারার মধ্যে দিনে দিনে উত্তাল হয়ে উঠেছে; সেই দিনগুলির জন্যই প্রতীক্ষা করেছে সে। সে বেঁচে রয়েছে।

সামনের সেদিনগুলি অন্ধকার। তার ভালমন্দ কিছুই দেখা যায় না। সেই অন্ধকারে পা না বাড়ালে দেখাও যাবে না। হয় তো সর্বস্ব হারিয়ে

আবার পথে ভাসবে মেঘু। কিন্তু মনস্থির করেছে সে। দমবে না সে আর।

বলল, 'আমি সব সইতে পারব চাচা। তুমি একটু নজর রেখ খালি, তা' হলেই হবে।'

লালমিঞা হতাশায় বিরক্তিতে ভেঙ্গে পড়ল। বলল, 'কিছুই হবে না। বুঝেছি, ওই টাকা কুটকুট করছে তোর গায়ে। না গেলে তোর শান্তি নেই। টাকা যাবে, আর দশজনের কাছে আমাকে গাল পেড়ে বেড়াবি যে, 'ওই লালমিঞা ব্যাটার জন্য আমি সর্বস্বান্ত হলাম।' ও-ই আমার নসীব। নসীব খণ্ডাবে কে।'

এই পর্যন্ত বলে লালমিঞা থামল। থেমে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দূরের আকাশের দিকে। মুঠো ক'রে ধরে রইল খুত্‌নির শক্ত ঘন দাড়ির গুচ্ছ। তারপর আপন মনে বলে গেল, প্রথম জীবনে কি নিদারুন কষ্টের মধ্যে সে তার এ ব্যবসা দাঁড় করিয়েছিল। কিভাবে সে তার প্রথম যৌবনে বিতাড়িত হয়েছিল বাড়ি থেকে সৎ মায়ের তাড়নায়।

মেঘুর দৃঢ়তা আজ তাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সেই কথাই বলেছে সে। এই বলার আড়ে আড়াল দিয়ে সাবধানের ইঙ্গিত ছিল মেঘুর প্রতি। তার অভিজ্ঞতার কথা শুনেও যদি মেঘু নিরস্ত হয়। যদি পেছোয়।

কিন্তু পেছুল না। বরং উল্টো ফল ফলল। সে ভাবছিল, লালমিঞার কষ্টের পরিণতির কথা। সেসব তো সে নিজের চোখেই দেখেছে। সে উল্টে উৎসাহিত হ'ল। আর লালমিঞা নিরাশ করতে চাইলেও, তার বলার মধ্যে সংগ্রামের জয়গান, তার যৌবন ও সাহসের মহিমা। এও তো উৎসাহেরই ইন্ধন মাত্র।

কিন্তু লালমিঞা সহজে ছাড়ল না। পীরের দরগায় আর মা কালীর থানে প্রতিজ্ঞা করাল মেঘুকে, 'হাজার বিপদ আসুক, ভয় আসুক, কষ্ট আসুক, কোনরকমেই সে পেছিয়ে আসবে না।' এ যেন প্রায় গুরু মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার মত।

' তারপর সুরু হল কাজ। লক্ষণসা'র গদী থেকে সুরু করে, গাঁয়ে ঘরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ। নানান জনের নানান কথা। মেঘু সব কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। কিন্তু লালমিঞার অপবাদ কেউ ঠেকাতে পারল না। রটনা হল, মেঘুর সঞ্চিত টাকা দিয়ে, শিঙ্গা ফোঁকা লালমিঞা আবার দাঁড়াবার চেষ্টায় আছে।

বছর না ঘুরতে শঙ্কিত হয়ে উঠল লালমিঞা। ভয় হল তার মেঘুকে দেখে। শেষে মেঘুকে জানে মারার অপবাদ নিতে হবে। এভাবে কতদিন বাঁচবে মেঘু।

অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে সেইরকমই। মেঘু সারাদিন কাজ করে কারখানায়। তারপর, আগের দিনের তৈরী মাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নৌকা নিয়ে। একসময় লালমিঞার মাল যেত যত জায়গায়, সব জায়গায় যায় সে।

কোন কোনদিন হয় তো কোন কারিগর সঙ্গে থাকে। নয় তো সে একলা। অন্ধকার রাত্রে, খাল নালা বিল পেরিয়ে বহু দূর দূরান্তে তার গতিবিধি। পথে তার বহু বিপদের সম্ভাবনা ওৎ পেতে থাকে। চোর ডাকাতের ভয়। ভয় হিংস্র জীব জানোয়ারের। তা'ছাড়া অন্ধকার খাল বিলের বুকে বহু সহস্রবিধ অলৌকিক অদৃশ্য রহস্যজনক জীবদের আনাগোনা। মেঘু ভয় করে না। কিন্তু বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করেও সে লড়বার জন্য প্রস্তুত। অপদেবতারা ফেরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। সে নেই কোথায়! কিন্তু তার ভয়ে পেছিয়ে গেলে চলবে না।

রাত্রিচর শৃগালের দল খালপাড়ের অন্ধকার ঝুপসিতে দাঁড়িয়ে দেখেছে মেঘুকে। বিলপাড়ের বাঁশঝাড়ের বাঁশে লতার মত পেচানো কালো নাগ। ফনা উঁচিয়ে জিভ লকলকিয়ে দেখেছে মেঘুকে। মানুষের আক্রমণের ভয়ে বাঁশের বুকে ছোবল মেরে হিস্ হিস্ করেছে। বিলপাড়ের হোগলা বনে ডেকে উঠেছে ক্ষুধার্ত বাঘ। তা'ছাড়া মানুষরূপী ভয়ঙ্করেরাও যে লক্ষ্য না করেছে, তা' নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগও কম নয়। বিশেষ বর্ষাকালে।

এসবই ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর মেঘনাদও। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকেও মিশিয়ে দিয়েছিল সে। এক নেয়ে ডিঙ্গায় মাল সাজিয়ে, বৈঠা বেয়ে আর লগি ঠেলে

দিকপাশ না দেখে ছুটে গেছে মেঘু। একদিন এমনি করে লালমিঞা গিয়েছিল, সে পারবে না কেন! কিসের ভয়, আর কেন ভয়। প্রাণের জন্য তো! এ পথে হার হলে, প্রাণের প্রয়োজন তো আপনি ফুরিয়ে যাবে তার কাছে। কিন্তু যখনই টাকা নিয়ে ফিরেছে, তখনই ফিরেছে দিনের বেলা। সাহস ছিল তার। কিন্তু পথের মধ্যে দশজনের সঙ্গে সে পারবে না, এটুকু সে বুঝত।

দু'বছরের মধ্যে কারখানায় লোকের প্রয়োজন হল। মালের চাহিদা বেড়েছে। পরিমাণ বাড়াতে হয়েছে প্রায় আগের মত। গদী না খুললে আর নয়।

কে বসবে গদীতে। লালমিঞা। লালমিঞা বলল, 'মরে গেলেও আর গদীতে বসব না। মেঘুর কর্মচারীর কাজ করে দিতে পারি। ওতে আমার কোন হক্ নেই।'

মেঘু অরাজী হল না। তাই বসুক লালমিঞা। কর্মচারীর বেশে বসেই কাজ চালিয়ে যাক সে; কিন্তু তার পক্ষে বসার উপায় নেই। সময় নেই।

গদী খুলল। লোকে বলল, লালমিঞার গদী। মেঘু ভাবল, বলুক। গদী তো লালমিঞারই। সুলতানের দেনা শোধ করেছে সে। তাকে শোধ দেবে লালমিঞা। নতুন কারিগর রেখেছে। তাদের মাইনে ছাড়াও আগের কারিগরদের অর্দ্ধেক খরচা বহন করে এসেছে সে। কেন না, বাড়তি কাজের দামটা যাবে কোথায়।

সে হিসাবের ভাবনা মেঘুর নয়। হিসাব করে লালমিঞা। বড় নিয়মতান্ত্রিক লোক। নিজের হিসাব আর মেঘুর হিসাব, কড়ায় গণ্ডায় ঠিক রাখে। একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

মেঘুকে হিসাব দেখতে ডাকলে সে ঘাড় বাঁকায়। লালমিঞা ঘাড় ধরে হিসাব দেখায়। ওসব চলবে না। তারপরে দুদিন বাদে বদনাম দেবে, তা সে সহ্য করবে না। তাতে মেঘুর লাভ বই ক্ষতি নেই। হিসাব শিক্ষা হয় তার। ব্যবসায়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা দিনের আকাশের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে চোখের সামনে। লুকোছাপা নেই। দুর্বোধ্যতা কেটে আসে আপনি।

মুখে মুখে হিসাব চলবে না। লিখতে হবে নিজের হাতে। নিজের হিসাব, টাকা আনা কড়া ক্রান্তি, সব নিজেকে লিখতে হবে। জানিনে বললে চলবে কেন। কিনে আনো ধারাপাত, আবার হাত মক্‌সো করো তালপাতায়। ছাড়ান নেই। নেমেছ যখন, ডুব দিয়ে ওঠ। দেখ, কত জল।

একদিন লালমিঞা হিসাব কষে দেখিয়ে দিল, বাজারের পাওয়ানা ছাড়াও মেঘুর মুলধন তিনশো টাকা স্থায়ীভাবে জমেছে। খরচ খরচা সব বাদ দিয়ে। জমেছে তিন শোর বেশী। জমেছে পাঁচ শো। ঘুন্‌সিতে চাবি বাঁধুক মেঘু। ওই চাবি ছাড়া কেউ জানবে না টাকার কথা।

সে-ই ভাল। কিন্তু মেঘুর তো গদীতে বসে থাকলে চলবে না। তারতো দিনে রাত্রে কাজ। তার সেই কাজের তো কামাই নেই।

কিন্তু সে কাজের ভার অপরকে দিতে হবে। যাকে দেবে, তাকে খুসী ক'রে দিতে হবে। সে বাঁচলে, তোমাকে বাঁচাবে। এক নিয়মে বরাবর চলে না। নিয়ম বদলায়। প্রয়োজনে আইনের হেরফের করতে হয়। এখন আর একলা ঘরামিতে ঘর উঠবে না। লোকের হাতে ভার দিতে হবে বিশ্বাস করে। নিজেকে খুঁটি আগলাতে হবে। মস্ত বড় কাজ। ওই খুঁটির মাথায় সব। ভেঙ্গে পড়লে তোমারই ঘাড় ভাঙ্গবে আগে। সকলের আগে মরণ তোমার।

নিয়ম বদলে গেল। মাল নিয়ে যাওয়ার কাজ পেল অন্য লোকেরা। বিশ্বাসী লোকেরা। তা'ছাড়া, দৈনিক প্রায় বিশজন পাইকের এখন দোকান থেকেই মাল নিয়ে যায়।

গদী হল। বাজারে দোকান ঘর করতে হল একটা। খুচরো বিক্রির দোকান। ব্যবসা বাড়ল, খরচও বাড়ল। গদীতে পাইকেরদের জন্য একটু পান তামাকের ব্যবস্থা করতে হয়। দশটা কথা বলতে হয়। খবর নিতে হয়।

তা ছাড়া বারমাসই কি আর ওই ছোট ডিঙ্গাতে দৈনিক মাল চালান যাবে। তা নয়। এবার একটা নিজের নৌকা করা দরকার। বড় নৌকা। বিলান দেশ। নদী নালা ঘরের আগদুয়ারে, পাছদুয়ারে। ওইটি আগে দরকার। বড় নৌকা হলে, সপ্তাহান্তে একবার করে মাল চালান দিলেই হবে। সময়

আসবে, যখন্ আর নিজের নৌকা দৌড়াদৌড়ি করবে না। কারবারীরা আসবে তাদের নৌকা নিয়ে।

এক সঙ্গে থোক টাকা দিয়ে নৌকা তো আর হবে না। ধীরে ধীরে কর। পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র, চার মাস ধরে কাজ চালাও। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠও হাতে পাবে। আষাঢ় মাসে নৌকা ভাসাবে। শুভদিন দেখে ভাসাতে হবে।

নৌকা হ'ল। কিন্তু গদীতে লোকে বাস করে না। ভিটা মাটি করতে হবে। ঘরে বসাতে হবে ইষ্ট ঠাকুর। সেখানেও লক্ষ্মী বসাতে হবে।

একদিনের কাজ তো নয়। এক বছরে হোক। পাঁচ বছরেই হোক্ না কেন। উদ্‌যোগ আয়োজন করতে হবে। এখন থেকেই লাগতে হবে। ভাবতে হবে সেসব।

লালমিঞা বলে, 'আমি কি তোর বাপের চাকর যে চিরকাল তোকে সামলাব। কোনদিন খোদা ফরমান দেবে, আমি চোখ বুজব। তখন চাচা চাচা করে চেঁচালে হবে!'

তবে কি করতে হবে? বিয়ে করতে হবে। সংসার পাততে হবে। নইলে বয়সের নষ্টামো ধরবে না! হোক্ মেঘুর মত খাঁটি ছেলে। খাঁটি সোনা দিয়ে পাপের কাজ হয় না? ওটা হল আর এক খুঁটি। ঠিক না থাকলে সব আল্‌গা। কাজ কর্ম গদী পয়সা সবই। নইলে কোনদিন দেখা যাবে সব রসাতলে গিয়ে বসে আছে।

তা ঠিক। এদিকে নজরও পড়েছে সকলের মেঘুর উপর। মেঘু, মেবা, মদনসা'র ছেলে। পদবীতে দাস। কিন্তু জাতে সাহা। লোকে সাহাই বলে। সবাই দেখছে, দিনে দিনে মেঘুব শ্রীবৃদ্ধি। মদনসা' ঘুরেছে যে লক্ষ্মীর পেছনে পেছনে, সেই লক্ষ্মীকে খুঁজে নিয়ে এসেছে মেঘু।

লক্ষ্মণসা' তো কতদিন ডেকে ডেকেই কথা বলেছেন। বুড়ো লক্ষনসা'। এখন তার ছেলেরাই গদী দেখে। সে বড় একটা গদীতে আসে না। কিন্তু এলেই মেঘুর খোঁজ করে। খোঁজ করে, লালমিঞা না আবার ছোঁড়াটাকে ফাঁকি দেয়। মায়ের চেয়ে যার দরদ বেশী, তাকে বলে ডাইনি। যে হাতে

ধরে দাঁড় করাল, তার ফাঁক ধরে লক্ষনসা'। খোঁজ নেয় লোকের কাছে, গদীর কাজ কারবার দেখাশোনা করে কে।

শুধু তাই নয়। লক্ষণসা' তার নাত্নির সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় মেঘুর। তার বড় ছেলের প্রথম মেয়ের সঙ্গে। প্রথম নাত্নি, লক্ষণসা' দেবে থোবে ভাল। নাত্নিটিও পরমা সুন্দরী। কেন, মেঘু দেখেনি? একবাড়িতে বাস করেছে, দেখেছে কতবার। যদি বিয়ে করে, তবে মেঘুর বাপের ভিটেটুকুও যৌতুক দেবে সে নাতজামাইকে।

এসব সংবাদ মেঘুর চেয়ে লালমিঞার কানে আসে বেশী। যাকে নিয়ে এত কথা, তার কানে বড় একটা যায় না। তবু কাজের অন্ত নেই। চার বছর কেটেছে। অবস্থাও অনেকখানিই উন্নত হয়েছে। তবু এখনোও মেঘু ন্যাকড়া পরে কারখানার কাজে হাত লাগায়। মনিবের সঙ্গে কাজ করতে অনেকের অসুবিধা হয়। কিন্তু মনিব সেরকম নয়, সেইটুই রক্ষা। সকলের সঙ্গে বসে বিড়ি খায়, কাজ করে, হাসি ঠাট্টা করে। দেখে বোঝার যো নেই এই মানুষই এসবের মালিক। আসলে মেঘুর নিজেরই এখনো সে বোধ নেই।

লালমিঞা প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছে। এদিককার কাজের দায়িত্ব সবই মেঘুর উপর। তবু গদী সামলানো তার দ্বারা হতে চায় না। আর লালমিঞা সেটাই তাকে দিয়ে রপ্ত করিয়ে নিতে চায়। না চাইলে চলবে কেন?

লালমিঞা একদিন বলল, 'তোর দাদাশ্বশুর যে বড় ভাবনায় পড়েছে রে মেঘু।'

মেঘু বলল, 'দাদাশ্বশুর কে চাচা?'

'কেন লক্ষনসা'।'

'কি করে?'

'সে যে তার ছেলের ঘরের বড় নাত্নির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তোর বাপের ভিটেটাও তোকে যৌতুক দেবে।'

'আচ্ছা! তবে ভাবনা কিসের বলছিলে?'

'কেন, লালমিঞা ব্যাটা তোকে ফাঁকি দেয় যদি।'

মেঘু কয়েক মূহূর্ত নির্বাক বিস্ময়ে হা ক'রে তাকিয়ে রইল। তারপরে হেসে উঠল হা হা ক'রে।

কিন্তু লালমিঞা গম্ভীর হ'য়ে বলল, 'কিন্তু তোর দ্বারা তো ব্যবসা হবে না মেঘা।'

'কেন?'

'আমাকে তোর এত বিশ্বাসের কারণ কি। মনে রাখবি, বিশ্বাস এক কথা আর আনাড়ির মত পরের হাতে সব রেখে দেওয়া আর এক কথা। ওটা বিশ্বাস নয়, ওর থেকেই আসে অবিশ্বাস। আমি আজ থেকে আমার যেটুকু আছে, সেটুকু গুটিয়ে নিলাম। আমার দ্বারা আর ব্যবসা হবে না। আমার ছুটি চাই।'

মেঘু অসহায়ের মত বলল, 'তা কি করে হয় চাচা?'

'সব হবে।'

ব'লে আর কোন কৈফিয়ৎ দিল না লালমিঞা। পরদিন থেকে গদীতে আসা বন্ধ ক'রে দিল সে।

মেঘু জানত, জোর ক'রে কিছু হবে না। সে খালি খোঁজ রাখে, লালমিঞার দিন চলছে কি ভাবে। হিসাব শিখেছে সে। লালমিঞার পাওয়ানাটা ঠিক মত পৌঁছে দেওয়ার ভার নিল সে নিজের হাতে। এমন কি দোকান বাজার হাট করে দেওয়া পর্যন্ত।

বাজারে মেঘুর স্বজাতিরা তাতে গোসা করল সবাই। হতে পারে লালমিঞা ভাল মানুষ। তা বলে নিজে একটা কারবারী হয়ে তার কাজ করে দেওয়া চাকরের মত, এটা ঠিক নয়।

কিন্তু সব কথাই আড়ালে আড়ালে। এদিকে আবার মেঘনাদ বড় গোঁয়ার। দিনে দিনে তার চেহারাটি হয়েছে যেন মস্ত একটা সিংহের মত। কী চেহারা। যেমন রং তেমনি চোখ মুখ। কথা বলতে সাহস হয়না কারুর। বলে শুধু পুরনো আমলের বিপিন, আর একমাত্র লালমিঞা। গদী আর কারখানার বাকী লোকেরা মেঘুকে ভয় পায় বটে। কেন না, অত পরিশ্রমী

মানুষ, কখন কি বলে বসবে, তার ঠিক কি। কিন্তু সবাই ভালবাসে। সে ভালবাসার মধ্যে অনেকখানি বিস্ময়ও আছে। বিপিন বড় বন্ধু হয়েছে মেঘুর। বয়সে তার চেয়ে বড় বিপিন। কিন্তু দুজনে একেবারে হরিহরাত্মা। বিপিন দুর্দিনে ছাড়েনি লালমিঞাকে। আর মেঘুর ব্যবসায়ের প্রথম থেকে সে তার একজন দুঃখের সঙ্গী। তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহায্য ক'রে চলেছে মেঘুকে। তা'ছাড়া বন্ধুত্বটা দুজনের কাজের মধ্য দিয়ে। মনিব কারিগরের সম্পর্কের মধ্যে নয়। দরকার হলে, বিপিনও ধমকেছে মেঘুকে। এখনো ধমকায়। হুকুম করে এটা সেটা এনে দেওয়ার জন্য। তবে একটু সামলে, দশজনের আড়ালে। শত হলেও মনিবের একটা মান আছে তো।

আর ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একটা খারাপ অভ্যাস মেঘুকে দিয়েছে বিপিন। সেটি কিছু নেশা ভাং। অবশ্য, এ কারখানা ঘরে যারাই কাজ করে, প্রায় সকলেরই সে দোষ কম বেশী আছে। লালমিঞারও ছিল। মেঘুও রপ্ত করেছে। কথাটা লালমিঞাও জানত। বাধা দিতে পারেনি। কি ভাবে এ ব্যাপারে বাধা দেওয়া যেতে পারে, সেটা লালমিঞার বুদ্ধির অগোচরে। কেন না, নিজেও তাই করেছিল। নইলে অত পরিশ্রম বোধ হয় সম্ভব হত না সেদিন তার পক্ষে।

সামান্য অবসরের মধ্যে এক সঙ্গে বসে নেশা করাটুকু বিপিনের সঙ্গে মেঘুর অন্তরঙ্গতার আর একটি কারণ। তবে ব্যাপারটা এখনো সীমা ছাড়িয়ে যায়নি, সম্ভবও ছিল না। মেঘুর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে বটে নেশাটা। বাধ্যবাধকতা আসেনি এখনো। মূল মন্ত্রটা ব্যবসা।

বিপিন প্রায় জন্ম বাউণ্ডুলে। ঘর সংসার করেনি সে কোনদিন। যত্র আয় তত্র ব্যয় করে এতখানি জীবন কাটিয়ে এসেছে সে। জীবনের অনেকটা সময় একলার পেটটা চালাতেই হিমসিম খেয়েছে। এ বয়সে আর ঘর করবার কথা মনেও হয় না তার।

কিন্তু বাজারের একটি মেয়েমানুষের কাছে যাতায়াত আছে তার। সেটা সকলে যেমন জানে, মেঘুও জানে তেমনি। বিপিন একদিন মেঘুকে নিয়ে

গিয়েছিল সেখানে। মেঘুর ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে। মেয়ে নয়, মেঘুর চেয়ে সে অনেক বড় ।

কথাটা লালমিঞা জানতে পেরে বিপিনকে ধমকেছিল খুব। সেই থেকে বিপিন আর কোনদিন তাকে নিয়ে যায়নি। মেঘুরও স্পৃহা ছিল না। তবে মেয়েমানুষটি সেদিন ঠাট্টাচ্ছলে মেঘুর কাছে কিছু চেয়েছিল। যা হোক কিছু, মেঘু যেন ভালবেসে দেয় তাকে।

মেঘু দিয়েছিল কিনে একটি ভাল শাড়ী। লালমিঞা তাও জানত। জেনেও কিছু বলেনি তাকে। খালি বিপিনকে বলেছিল, 'ওকে ওভাবে ডোবাসনি বিপনে। ও বড় ভালমানুষ। কথা বলে চ্যাটাং চ্যাটাং, আসলে একেবারে গোবেচারা। ওর কাছে চেয়ে চেয়ে ওকে একজন সর্বস্বান্ত করতে পারে। আমি তো বুঝি ওকে। ওর দিনকাল ভাল হলে, তোর যা খুসী তাই চেয়ে নিস্, কিন্তু রাঁড় বেশ্যার কাছে টেনে নিয়ে যাস্নি।'

কথাটা বিপিনকে ওইভাবে বলেছিল লালমিঞা। কারণ, সে মরলে বিপিন-ই হবে মেঘুর সর্বক্ষণের সঙ্গী। বিপিন সেকথা রেখেছিল।

তখন থেকেই লালমিঞার ভাবনা বেড়েছে। গদী ছেড়ে যাওয়ার কারণও তাই। চাপে পড়ে যাতে মেঘু ওদিকে একেবারেই নজর দিতে না পারে। তা' ছাড়া, লক্ষ্মণসা'র নাত্নির সঙ্গেই যদি তার বিয়ে হয়, হোক! মাথার উপরে তবু কেউ থাকবে।

কিন্তু মেঘু সেদিকে একবারে বেঁকে দাঁড়াল। আবার সে পথে পথে ফিরবে, তবু লক্ষ্মণসা'র সঙ্গে আর সম্পর্ক পাতাবে না।

প্রায় দু'বছরের মধ্যে একদিনও লালমিঞা আসেনি। কিন্তু একদিন তাকে আসতে হল। রাগে দুঃখে লালমিঞা সেইদিন অভিশাপ দিতে এল মেঘুকে।

ঘটনাটা হল, 'মনোহর' বিস্কুটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গুনোহাটির বদরুদ্দিনের মনোহর বিস্কুটের বড় নাম ডাক চারদিকে। সমস্ত পরগণা জুড়ে মেঘুর প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র বদরুদ্দিনের মনোহর। ব্যবসায়ের প্রথম দিন থেকেই মনোহর একটি ছোট্ট কাঁটার মত বিঁধেছিল মেঘুর বুকে।

আজ সুযোগ পেয়ে, বদরুদ্দিনের আসল কারিগর মনোহরকে নিয়ে এল সে নিজের কারখানায়। অবশ্যই বেশী মাইনের চুক্তিতে। কাজটা তার সুবুদ্ধির নয়, দুর্বুদ্ধিপ্রসূত। আসলে কোন বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে এ কাজ করেনি সে। করেছে বাধা অপসারনের ক্ষিপ্ততায়।

সংবাদটা লালমিঞাকে একেবারে দিশেহারা করে দিল। সে যখন এল, মেঘু তখন কারখানায় মনোহরের সঙ্গেই কথা বলছে। লালমিঞাকে দেখে বলে উঠল, 'চাচা এসেছ ?' লালমিঞা চীৎকার ক'রে উঠল, 'খবরদার। ওই মুখে আর চাচা ডাকিস্নে। তোকে আমি বলতে এসেছি, তোর কোনদিন ভাল হবে না।'

মেঘু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন চাচা ?'

'কেন ? যে পরের ভাল দেখতে পারে না, তার নিজের ভাল কোনদিন হয় না।'

'কি করেছি আমি বল।'

—শয়তান, তুই বদরুদ্দিনের কারিগর ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিস্। লোভী কোথাকার।

'এখুনি ওকে ওর মনিবের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আয়, নইলে তুই সর্বস্বান্ত হবি।'

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে লালমিঞা। পড়ে যাবে হয়তো এখুনি। মেঘু তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বলল, 'তাই দিয়ে আসব চাচা। এখুনি দিয়ে আসব চাচা। এখুনি দিয়ে আসব। তুমি একটু সুস্থির হয়ে বস।'

লালমিঞা বলল, 'বসব না যতক্ষণ না ওকে দিয়ে আসবি। আর বলে রাখি, ক্ষমতা থাকে, নিজের লোক দিয়ে ভাল মাল তৈরী করবি। পরের জিনিসে লোভ করবি তো মরবি। মনোহর বদরুদ্দিনের। তোর নয়।'

মেঘু তখুনি খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দিল মনোহরকে। এ বিষয়ে বিপিনের হাত ছিল না। বরং তার অসন্তুষ্টির কারণ রয়েছে। মনোহর উড়ে এসে জুড়ে বসবে তার জায়গায়। এটা সে সহ্য করবে কেমন করে।

লালমিঞা আর দেরী করল না। হিসাব দেখে বুঝল, অন্যদিকে মেঘু ঠিক আছে। এবার ধরল সে মেঘুকে বসতবাড়ির জন্য।

আপত্তি করল না মেঘু। তাদেরই সেই পুরনো গাঁয়ে জমি কিনে বাড়ি উঠল। বাড়ির তদ্বির তদারকের ভার পড়ল বিপিনের উপর।

গাঁয়ে বড় একটা ঢুকত না মেঘু। এবার ঢুকতে হচ্ছে। যেতে হচ্ছে প্রায়ই গাঁয়ের মধ্যে। সবাই ডেকে ডেকে কথা বলে, জিজ্ঞেস করে এটা সেটা।

পথের মাঝে দেখা একদিন নসীরাম গণকঠাকুরের সঙ্গে। মেঘু ভাবল, এই বুড়ো বোধহয় আর কোনদিন মরবে না। জন্মে অবধি দেখছে সাদা চুল আর সাদা ভ্রূ জোড়া। এমন কি চোখের পাতাও সাদা। মুখটি কিন্তু কালো। আজো তেমনি আছে নসীরাম।

মেঘুকে দেখে ভ্রূ তুলে মুখ কুঁচকে থমকে দাঁড়াল নসীরাম। ফোগলা দাঁতে হেসে বলল, মদনের ব্যাটা মেঘু না?

নর-শ্রেষ্ঠ বামুনকে প্রণাম করা রীতি। কিন্তু কোমর বেঁকল না মেঘুর। বলল, 'হ্যাঁ। ভাল আছেন ঠাকুরমশাই।' নসীরাম সেকথার ধার দিয়েও গেল না। বলল, তাইতো, কপালে যে তোমার রাজটিকা দেখছি বাবা। মা লক্ষ্মী তোমার সঙ্গে রয়েছেন দেখছি। বেশ বেশ। ভাল আছ তো বাবা?

মেঘু কথা বলতে শেখেনি। আদব কায়দা বোঝে না। বলল, 'তা এখন বেশ আছি ঠাকুর মশাই। কাজ করি খাই দাই।'

ব'লে সরে পড়ার তাল খোঁজে মেঘু। নসীরাম বলল, 'সেই তো ভাল বাবা। ওকেই বলে মা লক্ষ্মীর কৃপা। শুনলাম, বাড়ি করছ। সৌভাগ্যের সূর্য দেখছি তোমার কপালে। তবে বাবা, একটি রাহু বেষ্টনের লক্ষণ দেখছি। সেটি তো ভাল নয়।'

মেঘু বলল, 'ওটা কেটে যাবে।'

নসীরাম তাড়াতাড়ি বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু তোমাকে বাবা একটু শুচি হতে হবে। গদীটা শত হলেও অন্য জাতের ছিল। মাথামাখিও করছ। একটু পূজো পাজা দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে। আর তোমাকেও ফি বৈশাখে মঙ্গলচণ্ডীর—'

মেঘু ততক্ষণ হাঁটা ধরেছে। মঙ্গলচণ্ডী ঠাকরুনের ব্রত করতে পারে সে। কিন্তু নসীরামের কথায় নয়। আর লালমিঞার গদী অশুদ্ধ নয়। যেদিন খোলা হয়েছে, সেইদিনই লক্ষ্মী গণেশ বসিয়ে শুদ্ধিকরণ হয়েছে তার। তাও লালমিঞার অভিরুচি। বসতে না দিলেই বা বলার কে আছে। আর তার কপালের সূর্য্যের রাহুবেষ্টনি যে লালমিঞাকেই উদ্দেশ্য করছে, সেটাও সহজে বুঝল সে। বুঝে, নসীরামের প্রতি ঘৃণাটা বেড়ে গেল আরও।

মেঘু বোঝে একটি কথা। মন খাঁটি রাখতে হবে। কাজ করতে হবে খেটে। ওর চেয়ে শুচি শুদ্ধি আর কিছু নেই তারপরে কপালে দুঃখ থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আসলে লালমিঞার কাছ থেকে সরে আসার উপদেশ দিতে চায় বুড়ো গণকঠাকুর। কথাটা শুনে তাই রাগ হয়েছে মেঘুর। কথার জবাব না দিয়েই চলে গেছে সে। ওসব ভবিতব্য শুনতে রাজী নয় সে।

মেঘুর নতুন বাড়ির পথে লক্ষণসা'র বাড়ি। যাওয়ার পথে হঠাৎ একদিন ডাক পড়ল সেখানে। ডেকেছে ঝি পাঠিয়ে, অন্তঃপুরের বউ গিন্নিরা। যাওয়াটা সঙ্গত নয়। কিন্তু ঝিটা বলল, দিব্যি দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। না গেলে সকলে বড় দুঃখ পাবে।

মেঘুর গায়ে ময়লা জামা কাপড়। কিন্তু চেহারাটা আগুনের মত। এমন কি তার মাথার চুলগুলিও কম্পিত অগ্নিশিখা। আর চোখ কি! যেন মহাদেবের ঢুলু ঢুলু আঁখি। গোঁফজোড়া এর মধ্যেই গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে তার মুখে।

অন্তঃপুরে গেল সে। এক রাশ মেয়ে মানুষের ভিড়। কেউ কথা বলে না। সকলেই চেয়ে চেয়ে হাসে ফিক্ ফিক্ ক'রে। প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা। লক্ষ্মণসা'র অন্তঃপুরে চিরকালই রূপের বড় ছড়াছড়ি।

কিন্তু মেঘু মুখ তুলতে পারে না। অনেককেই সে চেনে এর মধ্যে। তার কৈশোরের স্মৃতি তো সে ভোলেনি। এর মধ্যেই কারুর কারুর সঙ্গে তার বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সম্পর্ক বিচিত্র নয়, অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য। গোপন নয়, অথচ একটা গোপনতা আপনি এসে আড়াল করেছিল তার মধ্যে। আজ সেসব কথা মনে করলে রক্তের মধ্যে কেমন একটা পাক দিয়ে ওঠে। কিন্তু কিশোর দেহের সেই দুর্বোধ্য যন্ত্রণা আজ আর নেই।

মেঘু এই নারী ব্যূহ থেকে বেরিয়ে যাবে কি না ভাবছে। এমন সময় একটি বউ বলল, 'কই, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বস।'

ব'লে একটি মস্ত বড় কাঁঠাল কাঠের মসৃণ পীড়ি পেতে দিল। বউটিকে চিনল মেঘু। অনেক অসহ্য আদর ও সোহাগ পেয়েছে সে বউটির কাছ থেকে। এখন বয়স হয়েছে, কিন্তু রূপে যেন ভাটা পড়েনি আজও। বউটি লক্ষ্মণসা'র বড় ছেলের বউ। মেঘু বলল, 'বসব না, কাজ আছে। কিছু বলবেন নাকি?'

বউটি বলল, 'বলব বৈ কি। না বসলে বলি কি করে। এখন তো আর সে মেঘু নেই। মস্তবড় কারবারী হয়েছ। তা' বলে কি—'

মেঘু বলল, 'না না, সে কি কথা। বিস্কুট বিক্রী ক'রে খাই।'

মেয়েরা সব খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। ওবাবা! কথা জানে! এ আর সেই মদনসা'র ব্যাটা মেঘা নেই।

বউটি ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'তবু বসতে হবে বাপু।'

মেঘু বসল! বউটি বলল, 'বাড়ি করেছ। বাস করবে কবে থেকে।'

মেঘু বলল, 'করলেই হল একদিন।'

আবার হাসি। অন্য একটি বউ বলল, 'তা' বললে কি হয়। পূজো টুজো দিতে হবে!' মেঘু হাসল। বলল, 'মাথা গোঁজার দরকার। একলা মানুষের আবার পূজো কিসের?'

'কেন, দোকলা তো হলেই হয়।'

মেঘু নীরব। লক্ষ্মণের বড় বউ ডাকল, 'কই লো ষোড়শী, মেঘুকে দুটো পান দিয়ে যা।' বোঝা গেল ষোড়শী আসতে পারছে না লজ্জায়। টেনে আনতে হল তাকে। লজ্জায় কুকড়ে কোনরকমে পান দুটি দিয়েই পালাচ্ছিল। একজন ধরে ফেলে মেঘুকে বলল, 'দেখ তো আমাদের এই মেয়েটিকে কেমন লাগে?'

মেঘু দেখল। সত্যিই সুন্দরী। বছর ষোল বয়স। বলল, 'ভালো!'

আর একজন বলল, 'মনের কথা বল।'

মেঘু বলল, 'মনের কথাই বললাম।'

বড় বউ বলল, 'তবে মেয়েটাকে তুমিই নাও মেঘু। আমার শশুরেরও খুব ইচ্ছে।' মিথ্যে না যে, মেঘু অবাক হয়েছে। কথাটা ভাবার মত করে কোনদিন ভাবেনি সে। আজও দুর্বোধ্য বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্তে চুপ করে রইল। তারপর তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ওসব এখন বলবেন না। আমার মাথায় অনেক বোঝা। পরের কথা পরে।'

বলতে বলতেই হাঁপিয়ে উঠল মেঘু। মনে হল, সে যেন কত যুগ তার গদী আর কারখানায় যায়নি। এই পরিবেশ তার সহ্য হচ্ছে না আর। মাথায় তার দিবারাত্রি অন্য চিন্তা। কথাটা বলে, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল সে। গিয়ে উঠল একেবারে কারখানায়! বিপিন বলল, 'হাতে পান কিসের?'

পান দুটোও খাওয়া হয়নি। বিপিনকে দিয়ে বলল, 'খাও। দিয়েছিল একজন।' বিপিন চতুর। বুঝল, একটা কিছু হয়েছে।

পরে অবশ্য জেনে নিয়েছিল সে ব্যাপারটা। আর এও জেনে নিয়েছিল, লক্ষ্মণসা'র নাতনিটি সুন্দরী বটে। তবে মনিব তার ও বাড়িতে বিয়ে করবে না কিছুতেই।

কিন্তু লালামিঞা আর দেরী করতে পারল না। বাজারের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে সে বিয়ে স্থির করল। মেয়ের বাপের বাড়ি সোনাচুলির চর। অবস্থা ভাল নয়। বাপের সামান্য একটি দোকান আছে। তাতে কোনরকমে চলে। ভাই আছে গুটি ছয়েক। তার মধ্যে তিনটি থাকে কলকাতার কাছাকাছি। কাজ করে কলে কারখানায়। বাকী তিনটি বাপের কাছে সোনাচুলির চরেই থাকে।

কারখানার লোক জন, আর বাজারের জানাশোনা লোকদের নিয়ে বিয়ে করে বউ নিয়ে এল মেঘু। বিয়ে করতে গিয়েও তার স্বস্তি ছিল না। ব্যবসার চিন্তাই তার মাথায় ঘুরছিল।

সবাই বলল, সুন্দরী বউ, তবে কালো। কালো সুন্দরী।

ঢাকা মেল গড়াতে গড়াতে এসে ধীরে ধীরে ব্রেক কষল আবার। লীলার মাথাটি আল্‌গোছে এসে ঠেকল মেঘনাদের বুকে।

মেঘনাদ ফিরে তাকাল। এই সেই বউ। সুন্দরী বউ। তবে কালো। কালো সুন্দরী।

মাথাটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য মেঘনাদ হাত তুলেও থেমে রইল। সরিয়ে দিল না। তাকিয়ে রইল লীলার ঘুমন্ত মুখের দিকে। তেল চকচকে কালো মুখ। স্ফুটোন্মুখ নীল অপরাজিতার মত চোখের পাতা। আগুনের মত লাল ঠোঁট। অভিমানে ফুলে উঠেছে যেন। তারই মধ্যে মধ্যে মান-রঙ্গের গোপন হাসি। চোখের দৃষ্টি নামতে দেখা গেল সুউচ্চ বুক। নিম্নাঙ্গের অনেকখানি আড়াল করে রয়েছে।

সোনাছুলির চরের মেয়ে, সেই লীলা। এই তো সেদিন বিয়ে করে নিয়ে এল একে মেঘনাদ। মুখের ভাব বড় একটা পরিবর্তন হয় না মেঘনাদের। যেন মুখের চামড়ার নীচে রক্তবাহী শিরাগুলি তার বিকল। সেই কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা কাটতে চায় না। কিন্তু চোখে তার মুগ্ধ বিস্ময়। এমন করে কোনদিনের তরে বোধ হয় লীলার দিকে তাকায়নি সে। লীলা নয়, ঝুমি বলেই ডাকে সে।

বাইরে পাখী ডাকছে। পাখী বউ খুনী শাশুড়ি। ডাকছে, বউ জাগো, জাগো, জাগো! রাত পুইয়ে এল নাকি। না, তার বাকী আছে এখনো অনেক। গাড়ীটা দাঁড়িয়েছে পথের মাঝে, একটি গ্রামের ধারে। সামনে সিগন্যাল পায়নি, তাই।

রাত্রির ট্রেনের কামরায় সেই একঘেয়ে দৃশ্য। নিদ্রা, তন্দ্রা, হাইতোলা, ঢুলুনি আর বিড়ি খাওয়া। জেগে আছে শুধু সেই ছেলেটাই! পর পর বিড়ি খেয়েছে অনেকগুলি। এখন নিশ্বাসের সঙ্গে একটা শব্দ হচ্ছে সাঁই সাঁই করে। হাঁপানির মত। কিন্তু ছেলেটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এতক্ষণ বোধ করি নিজের ভাবনাতে ভুলে গিয়েছিল তার সামনের সহযাত্রী ও যাত্রিণীর কথা। মেঘনাদকে ফিরতে দেখে আবার তাকাল সেদিকে। তাকিয়েই

অপেক্ষা করতে লাগল, কখন মেঘনাদ লীলাকে ধাক্কা দেবে। দেবে সুনিশ্চিত, এটা সে জানে। এতক্ষণ ধ'রে তাই দিয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, ধাক্কাধাক্কির দৃশ্যটা তার কাছে ভারী আনন্দদায়ক। বিশেষ লীলা যখন চমকে বোকার মত তাকায়, তখন তার ভেতরে কৌতুকের নিঃশব্দ হাসির ঢেউ ওঠে।

অপেক্ষা সে করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। অনেকগুলি মিনিট কেটে গেছে। গাড়ীও ছেড়েছে, কিন্তু কি আশ্চর্য! ভয়ঙ্করমুখো লোকটা ধাক্কা দিচ্ছে না, সরছে না। এমন কি বাইরের দিকেও তাকাচ্ছে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঘুমন্ত বউটার দিকে।

জীবনের এই অল্প বয়সেই, মেয়ে পুরুষের ভালমন্দ বহু বিচিত্র দৃশ্য দেখতে সে অভ্যস্ত। কৌতূহলিত হ'য়ে, তার অভিজ্ঞতার ছকে ফেলে ভাবতে বসল মেঘনাদের এই অদ্ভুত ব্যবহার। লোকটা হাত তুলেও থেমে রইল! কি করতে চায়!

অদ্ভুত কিছুই করতে চায় না মেঘনাদ। কিছু করার কথাও নয়। সে তার অতীত পথের একটা জংসন ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। দাঁড়িয়েছিল, আবার চলতে আরম্ভ করেছে।

যে স্মৃতি তাকে আলিঙ্গন করেছে আজ, সে যে বিষের বাঁশী। না, সে এক বিশাল বিষধর সাপ। বিষে তার জ্বালা। স্পর্শ তার হিম শীতল। লীলাকে দেখতে দেখতে সে তলিয়ে গেল তার মনের অতলে।

বিয়ে করে নিয়ে এল সোনাচুলির চরের মেয়েকে। চরের মেয়েদের একটু দুর্নাম আছে। বিশেষ বিক্রমপুরের বর্ণহিন্দুরা চরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে অনেক সময়েই অনিচ্ছুক। কারণ সম্ভবত, চরে যারা বাস্তু স্থাপন করে, তাদের বংশের প্রাচীনত্ব গৌরব ও অবস্থা একটা সন্দেহ জাগায়। হা-ঘরে মানুষেরাই শুধু চরে ছুটে যায়। জীবনে যাদের স্থিতি নেই। চর-সমাজে বিশ্বাস ও সংস্কৃতির শিকড় বড় আলগা। জীবন উদ্দাম, ভয়হীন। চরের

প্রকৃতির মধ্যে আছে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা। চরবাসীদের রক্তধারার মধ্যেও সেই প্রকৃতিই প্রবাহিত। চর সমাজে উত্থান ও পতন বড় দ্রুত। রূপান্তর নিয়ত।

মেঘনাদ বর্ণহিন্দু নয়। তা'ছাড়া, চর সমাজের ভাল মন্দ ভাববার অবকাশও ছিল না তার। বিয়েটাই তার কাছে অদ্ভুত অপূর্ব কোন রূপ ধরে দেখা দেয়নি। প্রয়োজন সম্পর্কেও ধারণা বড় ক্ষীণ। একটা চলতি ব্যবস্থার কাছে স্বাভাবিকভাবে মাথা নোয়ানোর মত ব্যাপার।

বিয়ের আগের দিনও জিজ্ঞেস করল লালমিঞা, 'মেঘু, ভেবে ছাখ। লক্ষ্মণসা'র নাত্নিকে বিয়ে করাই তোর ভাল, আমার মতে।'

মেঘু বলল, 'তা হয় না চাচা।'

'কিন্তু, সোনাহুলির মেয়ের বাপ বড় গরীব। তোকে একটা সোনার আংটি ছাড়া সে আর কিছু দিতে পারবে না। আর সামান্য দান-সামগ্রী। তবে গরীব হলেও লোকটা ভাল।'

মেঘু বলল, 'সেই ভাল। পরের পয়সায় বাবুগিরি করতে চাইনে।'

কথাটা আসলে কোন বড় আদর্শ-জ্ঞান থেকে মেঘনাদ বলেনি। বলেছে তার নিজের বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে।

বিয়ে করে উঠে এল নতুন বাড়িতে। ফরিদপুরে বোনের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিল। বোন তখন আতুড়ে, আসতে পারেনি। তবু, বৌ-ভাতের বাড়িতে লোকের অভাব হয়নি। মাসী পিসী খুড়ি এল অনেক। সেই সঙ্গে সম্পর্কে ভাই বোনেরও ছড়াছড়ি।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করেনি শুধু লক্ষ্মণসা' এবং তার বাড়ির মেয়েপুরুষেরা। উপরন্তু রটনা হল সোনাহুলি চরের এক মুসলমানের মেয়েকে নাকি বিয়ে করে এনেছে মেঘু। ব্যবস্থা করেছে লালমিঞা। মেঘু বিয়ে করেছে টাকার জন্য।

যাক্ ওসব কথা। বিয়ে সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল মেঘুর, সেটা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে উঠল বৌ-ভাতের রাত্রে লীলার সঙ্গে কথা বলে।

মেঘুর জীবনে ছিল অনেক ভাবনা, অনেক চিন্তা। নিয়ত সমস্যায় মন তার ভারাক্রান্ত। কিন্তু সে ভাবনা, চিন্তা ও সমস্যা মাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে।

সে তার ব্যবসা ও বানিজ্য। তার ধ্যান জ্ঞান, তার জীবন মরণ, তার আশা ভরসা। সাফল্য মানুষকে আশা যোগায়। গত বছরগুলিতে যে সংগ্রাম মেঘু করে এসেছে, সে সংগ্রাম তার আজো শেষ হয়নি। সংগ্রামের চেহারাটা পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। ঘর গদী, যা কিছু সে করেছে, সেটা ব্যবসার জন্য করেছে। বিয়ে ব্যাপারটাকেও সে তার জীবনের কোন নিভৃত সুখ রহস্য হিসাবে জ্ঞান করেনি। যাদের ঘিরে তার কাজ, তাদের সকলের অভিপ্রায় অনুযায়ী একটা কাজ করেছে সে।

কিন্তু নিজের কারবারের কাছে তার কোন ফাঁকি নেই, থাকবেও না। যদি সেই ফাঁকি নিয়ে কেউ আসে, তা সে সহ্যও করবে না।

তার প্রেম ভালবাসা সোহাগ, এমন কি, মনের সঙ্গে একটু নিভৃত আলাপ এ সব কিছুই তার ব্যবসাকে ঘিরে। সে নিজেই একজন কারখানার কর্মী। বিপিনের সঙ্গে নেশা ক'রে সে চীৎকার ক'রে বলে, 'কলা বিস্কুটের রং দেখেছিস বিপনে, শালা. মেমসাহেবের গালের চেয়ে সুন্দর। লোকে খাবে আর মেঘনাদের নাম করবে।' নেশা না করেও বলে চিড়িতন মার্কা ঝুড়ি বিস্কুট দেখিয়ে, 'ঠিক যেন একটা ছোট খুকীর মুখ। হেসে ফেলবে এক্ষুনি, না ?'

মানুষের যেখানে প্রকৃত প্রেম, সেখানেই প্রকৃত সংগ্রাম। সেখানেই তার প্রকৃত সততা ধ্যান ও জ্ঞানের স্ফুরণ। ভক্তি শ্রদ্ধাও আসে সেখানেই। মেঘনাদেরও তাই। এখানে তার হৃদয় অমলিন সোনা। এ সোনার হৃদয় পাতে কারুর ছায়া পড়ে না। ভাগ বসাতে পারেনি কেউ। ভাগ দিতেও নারাজ সে।

কিন্তু তার এই ধ্রুবতারাগামী মনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল লীলা। ওই সোনার পাতে ভাগ বসাতে চায় সে। সওদাগর যে লক্ষ্মীর সাধক, সেই লক্ষ্মীর সঙ্গেই লীলার প্রথম বিবাদ। সে যেন চ্যাং মুড়ি কানি মনসার মত লকলকে জিভে ফোঁস করে উঠল। যে হৃদয় ও মন সঁপে দিয়েছ গদী কারখানার উপর, ভাগ চাই সেই হৃদয় ও মনের।

লীলার পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়, অসুন্দরও নয়। কিন্তু এত অস্বাভাবিক ও অসম্ভব আর কিছু মনে হয়নি মেঘনাদের কাছে।

বউ ভাতের রাত দুপুর পর্যন্ত সে বিপিনের সঙ্গে এক গূঢ় আলোচনায় ব্যস্ত রইল। বউ-মেয়েরা এসে তাড়া দিয়েছে ঘরে ঢোকার জন্য। বলেছে, নতুন বউ একলা রয়েছে ফুলশয্যার ঘরে, একি করছে মেঘনাদ। বিপিনও বারবার উঠে যেতে চেয়েছে রাত্রের মত। মেঘনাদ ছাড়েনি। সে এক বিশেষ আলোচনায় মত্ত।

সে বলল বিপিনকে, জানিস্, বিয়ের দিন রাত্রে যখন আমাকে মালপো খেতে দিল, তখন সেই মালপো খেতে খেতে আমার এই নতুন মশলাটার কথা আপনি মাথায় এসে পড়ল। যদি কাজ হয়, তবে এ মিষ্টি বিস্কুটে ঢিঢি পড়ে যাবে সারা দেশে, দেখিস্।'

অর্থাৎ একটা নতুন মাল তৈরীর প্ল্যান ঘুরছে তার মাথায়। এই নতুন মাল যতক্ষণ না সে নিজের হাতে কারখানায় তৈরী করছে, ততক্ষণ তার বিয়ে, বউ, সবই মিথ্যে।

তবু রাত্রি দুটোর পর ঘরে ঢুকল সে। এসে দেখল, লীলা ঘুমোচ্ছে। নতুন কেনা জার্মাণী টেকো হ্যারিকেনের উজ্জ্বল আলো সারা ঘরে। ঘরখানি সাজানোও হয়েছে মন্দ নয়।

কিন্তু সেদিকে মনযোগ দেওয়ার মুহূর্তেই মেঘুর মনে পড়ে গেল বদরুদ্দিনের মনোহরের কথা। বাতিটা কমাবে মনে করেছিল। কমানো হল না। মনোহরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার মেঘনাদ মার্কা, বিজয়ের কোন উচ্চ শিখরে উঠবে! সেই ভাবনায় ডুবে গেল সে।

মনোহরকে একদিন সে নিয়ে এসেছিল তার কারখানায়। ফিরিয়ে দিয়েছে আবার লালমিঞার কথায়। সেদিন জীবনে আর একটা পাঠ গ্রহন করেছিল সে লালমিঞার কাছ থেকে। সমব্যবসায়ীকে হিংসা করতে পারবে না কোনদিন।

এর নাম হিংসা কি না কে জানে। কিন্তু মনোহর কাঁটার মত খচ্ খচ করে তার মনে। বদরুদ্দিনের মনোহর বলতে সকলে অজ্ঞান। মেঘনাদও তেমনি কিছু দিতে পারে না?

আশ্চর্য! সামনে তার নতুন বিয়ে করা বউ। সে সম্পর্কে যেন সে এখনো অবহিত নয়। হয় তো অবহিত আছে কিন্তু অবকাশ পায়নি এই দিকটির কথা ভাববার।

লক্ষ্যও করল না, ঘরের বাইরে কাদের ফিস্‌ফিসানি, দুপ্‌দাপ্‌ পদশব্দ। বাইরে কাদের চাপা হাসির ঝঙ্কার এই রাত্রিকে এক নতুন রহস্য ও মোহে আচ্ছন্ন ক'রে তুলছে। নতুন ঘরের নতুন বেড়া বড় আঁটসাঁট। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ফাঁক করতে চাইছে কারা। একটি সামান্য ছিদ্র। সে ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বিশ্বরহস্যের এক গোপন ও বিচিত্র দৃশ্য ফুটে উঠবে চোখের সামনে। সেই ষড়যন্ত্রের ফিকিরে ঘুরছে একদল নরনারী। সমাজের প্রচলিত এক অদ্ভুত আনন্দ। প্রথম প্রেম ও মিলনের তারা গোপন সাক্ষী হতে চায়। একদিনের জন্য। প্রথমদিনের জন্য।

শুক্লপক্ষের রাত। কিন্তু বর্ষাকাল। বৃষ্টি নেই, আছে আকাশ জুড়ে ছেঁড়া মেঘের ভিড় আর পূবে হাওয়ার মাতামাতি। পূবালি ঝাপটার শব্দ কি! ধলেশ্বরী তীরের বনপালা মাতিয়ে ঘরের টিনের চালার কানাতে লেগে কেটে খান খান হয়ে যাচ্ছে হাওয়া। পাগলাবাঁশীর শেষ রেশের মত এক বিচিত্র শব্দ উঠছে হাওয়ার। ধলেশ্বরীর বুকে গান ধরেছে কোন ঘরছাড়া জোয়ান মাঝি। কথা শোনা যায়না, শুধু হাওয়ার বুকে ব্যথিতের তীব্র আর্তনাদের মত ছুটে চলেছে সে শব্দ গ্রাম গ্রামান্তরের উপর দিয়ে।

সারাদিন ধরে গান করেছে এয়োরা। এদেশে এয়োদের বলে নাইয়র। তারা গান করেছে বেহুলা লক্ষীন্দরের বিবাহ-রাত্রির উপাখ্যান, শিব ও সতীর মিলন কাহিনী।

তাদেরই সুন্দর হাতের আঁকা পিটুলির আল্‌পনা সারা বাড়ির উঠোন ও ঘরের মেঝে আছে ছেয়ে। মাঙ্গলিক মানসিক ব্রত ও পূজার ধান সিদুঁরে ছড়াছড়ি চারদিক।

উৎসবের চিহ্ন সারা বাড়িতে। উৎসবের আলোড়ন সকলের বুকে। বউ-ভাতের উৎসব। মেঘনাদের বুকেও উৎসব জেগেছে। কিন্তু সে অন্য উৎসব, যার এখনো সুরু হয়নি। পূবাইল হাওয়ার শন্‌শন্‌ তারও বুকে। কিন্তু সে শন্‌শন্‌ কোন প্রেমোন্মাদ মিলনাকাঙ্খীর নয়।

মেঘনাদের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে উঠেছে সারা মুখ। আর ধীরে ধীরে একটি সূক্ষ্ম হাসির ঢেউ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার মুখে।

আচমকা দমকা নিশ্বাস, রিনিঝিনি ও খস্ খস্ শব্দ শুনে চমকে মুখ তুলল মেঘু। দেখল, বেড়া কাটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে রক্তাম্বরী শাড়িতে ঢাকা লীলা। ফিরে দেখল, বিছানা শূন্য।

দেখা মাত্র মনে তার নতুন জোয়ার এল। এক সুখের চিন্তার সঙ্গে, আর এক সুখের অনুভূতি দ্বিগুন আনন্দে ভরে দিল তার মন। মনে তার কোন অপরাধ ছিল না। তিন দিন ধরে সে লীলাকে দেখছে। দেখে, কি যে মনে হয়েছে, সে জানে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ চাপা অথচ তীব্র একটা অনুভূতি ঝলকে উঠেছে মনের মধ্যে। কিন্তু সে এত সামান্য যে দাগ কাটেনি।

এখন তার নিজের ভাবনার অকূল পাথারে একটা কিনারা পেয়েছে সে। সেই আনন্দেই লীলা তার কাছে বাস্তব মূর্তিতে দেখা দিল। দুই আনন্দ ধারায় পূবে বাতাসের চেয়েও বেশী মাতন ধরিয়ে দিল তার বুকে। বাতি না নিভিয়েই লীলার কাছে এগিয়ে গেল সে।

প্রেমের পাঠ পড়া ছিল না মেঘুর জীবনে। মন ভোলানো কথা জানে না বলতে। পীরিতির রীতি-নীতি ও আইনকানুনের নেই অধ্যবসায়। সামনে গিয়ে বড় বড় থাবায় টেনে ধরল লীলার বলিষ্ঠ সুঠাম দুটি হাত। (না ধরাটাই নিষ্ঠুরতা ও প্রেমহীনতা বলে জানে সে) ধরল, ধরে কাছে আকর্ষণ করতে গিয়ে দেখল, মানুষ নয়, মূর্তি পাথরের। তাকে নড়ানো চড়ানো যায় না !

কেন ? ওহো, লজ্জা হয়েছে নতুন বউয়ের ! এই স্বাভাবিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা-ই বোধ হয় প্রথম সঞ্চয় করল সে নারী সম্পর্কে। হেসে কথা বলতে গিয়ে কথা ফুটল না তার গলায়। নীরবে, আরও জোরে আকর্ষণ করল সে লীলাকে।

কিন্তু না, পাথর তো নয়। লীলা আচমকা হাত ছাড়িয়ে নিল ঝটকা দিয়ে। মেঘু বুদ্ধিমান নয়। কিন্তু ঝটকার মধ্যে লীলার বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আঁচ পেল সে। বিস্ময়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল ?'

লীলার অত ঘোমটার বালাই ছিল না। আশ্চর্য ! নতুন বউয়ের লজ্জার জড়তাও নেই তার ব্যবহারে। সে ফিরে তাকাল মেঘনাদের দিকে।

সে চোখে আগুনের ফুলকি। সোনাতুলির চরের শুকনো বনে জ্বালানো আগুনের লক্‌লকে শিখা জ্বলছে তার চোখে। পরনে তার রক্তাম্বরী শাড়ী। সর্বাঙ্গ ঘিরেই তার সেই অগ্নিশিখা। এক মুহূর্ত মেঘুকে দেখে, অন্যদিকে সরে গেল সে।

মেঘু তাকিয়ে দেখল। মুখের হাসিটি তার যাই যাই ক'রেও যায় না। বউ তার কেন রাগ করল, কিছু বুঝতে পারল না সে। কিন্তু রাগ করেছে, এটা বুঝেছে। হয় তো কোন কারণ ঘটেছে তার। কিন্তু প্রেমের কুঁড়ি ফুটছে তার বুকে। লীলার রাগ ঘোচাবার জন্য আবার তার কাছে গিয়ে হাত দুটি টেনে ধরল। বলল, 'কি হয়েছে তোমার?'

লীলা ফিরে তাকাল। চোখের আগুন একটু যেন স্তিমিত হল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল স্বামীকে। তারপর আবার হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল।

মেঘু ছাড়ল না। বলল, 'কি হয়েছে, বললে না?'

সেকথা কি বলতে হয়?

বলতে হয়। মেঘনাদের মত মানুষকে বলতে হয় সেকথা। কিন্তু সোনাতুলির উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে লীলা সে কথা বোঝে না। জীবনের অভিজ্ঞতা তার সম্পূর্ণ আলাদা। সে আলাদার মধ্যেও আছে একটু বিশেষ রকম।

তা' হলে মেঘনাদের অতীত রোমন্থনের আড়ালে, সংক্ষেপে বলে নিতে হয় লীলার কাহিনী।

চরে মানুষ থাকে দু'রকম। একদল দিবানিশি তেলহীন প্রদীপের মত বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে প্রাণকে। আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ওই প্রদীপ থেকেই শুষছে তেল। এর মাঝখানে যারা, জমিহীন সেই এক দরিদ্র দোকানদারের মেয়ে লীলা। চর জীবনের উদ্দামতার মধ্যে সে মানুষ হয়েছে।

ঘরে তাদের লক্ষ্মী গনেশের পূজা, লৌকিক অলৌকিক আচার অনুষ্ঠান, ছিল প্রায় সবই। কিন্তু চরের ঝোড়ো হাওয়ায় আচার অনুষ্ঠান, বাঁধন বড় শিথিল। জৈবিক তাড়না হল সবচেয়ে বড়, মুখোমুখি ও অঙ্গাঙ্গি। প্রকৃতির সঙ্গে হাতাহাতি ক'রে জীবনধারণ।

লীলা দেখেছে, একটু বড় হতে না হতে তার দাদারা ঘর ছেড়ে চলে গেছে বিদেশে। যে সব ভাইয়েরা আছে, তারা কেউ লক্ষ্মীর সেবা করে না। চাষী ও জেলেদের সঙ্গেই কাটে তাদের জীবন।

চরের হাওয়ায় শুধু ক্ষুধা। দিবানিশি জঠর ও বুক খা খা করে। সেই ক্ষুধা থেকে লীলা রেহাই পায়নি। ছোটবেলা থেকে পায়নি পেট ভরে খেতে। তবুও চরের জল বাতাসে লকলক ক'রে বেড়ে উঠেছে দেহ। বাপের ঘরের ভাঙ্গা গৃহস্থালির উপর কোনদিন নির্ভর করতে পারেনি। আটোল নিয়ে ঘুরেছে জলে জলে। ঘুরেছে জঙ্গলের বুকে, চরাশ্রয়ী অতিকায় গো-সাপের সঙ্গে সঙ্গে। কোঁচড় ভরে এনেছে জীবন্ত কাঁচা মাছ, আর মাথায় করে শাকের বোঝা। সেজন্য চেলা কাঠের এলোপাথারি মার খেয়ে পড়ে থেকেছে উঠোনে। তবু, ঘরের সবাই মিলে খেয়েছে ওই শাক মাছ-ই। দোকান তো নামে মাত্র। ধানচালের সংস্থানটা হত কোনরকমে।

পনর থেকে ষোলয় পড়তে না পড়তে ঝুমির দিকে তাকান যেত না আর। পেটের সঙ্গে দেহের আর একটা ক্ষুধাও ঝুমির মনে নতুন আকাঙ্খার সৃষ্টি করছিল। কিন্তু আকাঙ্খা ছিল সুন্দর। চোখে মুখে তার এক বিচিত্র ভাবের সুষমা। উদ্দামতা ঘোচেনি, প্রকৃতির সঙ্গে তার এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠছিল।

কিন্তু চরের মাঝে লুকিয়ে বুকে হাঁটে যে গোসাপ, গহন অরণ্যের অন্ধকার থেকে তার কুটিল দৃষ্টি এড়ায়নি লীলাকে। লীলা নয়, মুদী নকুড়সা'র মেয়ে ঝুমি। চরের ঘন সবুজ অরণ্যের মত কালো ঝুমি। তার বলিষ্ঠ উদ্ধত দেহ, মেঘরাশির মত চুল, তার ঔদাসীন্য, ঝড়ের মতো হাসি গোপনে বয়ে নিয়ে এল আর এক ঝড়, অদৃশ্যচারী কামার্তের বুকে।

সেইদিন! কী ভয়াবহ, কী বীভৎস দিন। দুপুরের চরে এলোমেলো ঝড়। মানুষের চোখে ঘুম।

চরের বনের ভেতরে প্রবাহিত শীর্ণকায়া লতাই খাল। ঝুমি কচ্ছপের ডিম সন্ধানে রত। টের পেল না, কে এসে বাঁধল মুখ। টেনে নিয়ে গেল ঝোঁপের অন্ধকারে। অঙ্গ বিবসনা। দেহের উপরে তার হিংস্র জানোয়ার।

আশেপাশের আস্তানার গোসাপকুল তাদের অপলক, বিস্মিত চোখে আর লকলকে জিভ বার করে দেখল এই দৃশ্য। দেখল, তাদের চেয়েও দীর্ঘাকৃতি, শক্তিশালী হিংস্র দুটি জীব পরস্পর হাতাহাতি দাপাদাপি করছে। তাদের নিজেদের ল্যাজের ঝাপটায় মানুষের অঙ্গ পচে যায়। কামড়ে ধরলে ছাড়ে না মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি না শোনা পর্যন্ত। সেই গোসাপেরা লাঙ্গুল গুটিয়ে পালাল এই বিরাটকায় পশু দেখে।

মানুষটাকে চিনল ঝুমি কিন্তু তার কুমারী জীবন ও যৌবনের এই ভয়ঙ্কর আক্রমণকে পারল না বাধা দিতে। মনে তো কোন পাপ ছিল না। অপমানে বেদনায় যন্ত্রনায় সমস্ত কথা বলেছিল মাকে। মা বলল বাপকে। বাপ কাটারি নিয়ে এল ছুটে খুন করতে। পালাবার মুখে কোপটা লেগেছিল পিঠে। আজও আছে সেই দাগ।

তারপরেই প্রতীক্ষা এর পরিণতির জন্য। কিন্তু সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত করল সে বাপ মা'কে। গর্ভসঞ্চার থেকে বেঁচে গেছে ঝুমি। তবে চরের বুকে রাষ্ট্র হয়েছে এই কথা। এমন কি দাবী করা হল ঝুমিকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঝুমি রাজী ছিল না।

ফলে প্রতি মুহূর্তে আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু উদ্দামতার সঙ্গে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছিল ঝুমিও। সে ভয় পায়নি সেইসব অদৃশ্যচারী পশুদের। ভয় পায়নি, কিন্তু জীবনের বিশ্বাস ও সংস্কার গেল ভেঙ্গে। যে দেহকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই দেহকে ঘিরে গঠিত হল মন ও চরিত্র। পুরুষকে দেখল সর্বভূক কাকের মত ঘৃণা ও করুণা নিয়ে। করুণাটা নারী হিসাবে নয়, ভাত ছড়িয়ে নয়, শুধু দেখিয়ে, লোভী কাকের খেলা দেখার মত। একদিকে ঘরে বাইরের ধিক্কার ও ঘৃণা, আর একদিকে আবার অধিকাংশের লোলুপ দৃষ্টি তাকে নির্লজ্জ ক'রে তুলল। দূর করে দিল মনের ভয় ও শ্রদ্ধা।

এর মাঝে, দেহকে যে সে সর্বস্ব জ্ঞান করেছে, সে সর্বস্বতার মধ্যে নিজের প্রতি গড়ে ওঠেনি কোন মমত্ববোধ। বোধ হয়, গড়ে ওঠাই সম্ভব নয়। এই অকল্পিত কলঙ্ক মনে তার কিছু বিকারের সৃষ্টি করেছে। উদ্দামতার মধ্যে

যে কোমলতাটুকু ছিল, নতুন যৌবনের ভারে যে ভরা গাঙের শান্তভাব ফুটে উঠেছিল, সেটুকু গেল দূর হয়ে।

আগুন লেগেছে তার সর্বাঙ্গে। তার চোখে মুখে, তার কথায় হাসিতে শুধু আগুন ঝরে পড়ে। কলঙ্ক তাকে অন্ধকারে ফেলেনি মুখ গুঁজড়ে। বোধহয় পরিবেশও দায়ী ছিল সেজন্য অনেকখানি। এই আগুনে তার জীবনের প্রতি ভালবাসার সোনার কাঠিটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছল অনেকটা। অভাবগ্রস্থ জীবনে ছিল না তার স্বার্থপরতা। এখন অঙ্কুরিত হল তার মনে স্বার্থপরতার একটি নতুন বীজ।

ঘর ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে উদয় হয়েছে তার। কিন্তু আশ্চর্য! এই মন নিয়েও পারেনি সে ঘর ছাড়তে। তার চেয়ে বিস্ময়ের কথা, হৃদয় ও মনের এই সব পোড়ানোর আগুনের মাঝেও ছিল তার একটি সামান্য ব্যথার অনুভূতি। সে ব্যথা এক বিচিত্র বিরহের। ভাল না বেসে, প্রেম না করে, এ বিরহ কার জন্য তা সে জানত না। কখনো কখনো আচমকা ব্যাকুল হয়ে উঠত তার মন। বুকের মধ্যে দুটি অন্ধ চোখ হাত্‌ড়ে ফিরত যেন কাকে, কোন্ বস্তুকে।

এর তিন বছর পর হল তার বিয়ে। মনে তার যা-ই থাক্, বিয়ের প্রতি যে তার কোন বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই, এটা ফুটে উঠল তার হাসি ও কথার মধ্যে।

কিন্তু সোনাডুলির এই কলঙ্কবতীর সৌভাগ্যে বিস্মিত ঈর্ষা হয়েছিল অনেকের মনে। মেঘনাদ দাসের মত গদীর মালিকের ঘরণী হতে চলেছে ঝুমি, এ বড় অভাবিত। এমন কি বাদ্য বাজনা শুধু নয়, ঝুমির বিয়েতে পদ্য-উপহার ছাপা হয়ে এল ঢাকা শহর থেকে।

এ বিয়ের যোগাযোগকারী লালমিঞা বা অন্যান্য দু'একজন যে কলঙ্কের কথা না শুনেছে তা' নয়। কিন্তু লালমিঞা গ্রাহ্য করেনি ব্যাপারটাকে। কুৎসা রটনার ব্যাপারটা সে চিরকাল বড় ঘৃণা করেছে। উপরন্তু লীলার বাবাকে সে তার ক্ষুদ্ কুড়োটুকু দিয়েও সাহায্য করেছে বিয়ের জন্য। সেটা বোধ হয় মেঘুর কথা ভেবেই।

মেঘনাদের কানে অনেকে তুলতে চেয়েছে কথাটা। কিন্তু মেঘুর দেহটা শুধু উঁচু নয়, মনটা তার এত নাগালের বাইরে যে, সেখানে পৌঁছুতে পারল না কেউ-ই। সুতরাং বিয়ে হল নির্বিঘ্নে।

ঝুমির মনের যে দিকটা চাপা ছিল তার নিজের কাছে, বউ ভাতের রাত্রে সেটুকু ধরা পড়ে গেল। অর্থাৎ, মেঘুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চাইছিল সে। কাককে ভাত ছড়াবার মত নয়, মরেও না মরা তার কুমারী মন নিবেদন করতে চাইছিল পুরুষকে। একটি নতুন দিক উন্মেষের অপেক্ষায় ভয়ে ও আনন্দে কাঁপছিল তার বুক। বিদ্রূপ, ঘৃণা ও লজ্জাহীন বহ্নিশিখা ছিল তার চোখে মুখে কথায়, তা' শান্ত হয়ে আসছিল।

কিন্তু সারা বাড়ি, আত্মীয় কুটুম্ব, এয়ো নারী ও সে নিজে যখন ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে, তখন তার স্বামী কারখানার একটা মজুরের সঙ্গে হেসে হেসে কথায় ব্যস্ত!

ছেঁড়া মেঘের আড়াল থেকে অনেকবার উঁকি মেরে গেছে চাঁদ। পাগলা পূবে-হাওয়া আকুল করেছে মন। প্রহরের মনে কেটে গেছে প্রহর। সে আসেনি।

যখন এল, তখন অপমানে সেই আগুনের হলকা লেগেছে আবার ঝুমির মনে। এ শুধু অবহেলা বলে মনে হল না। সংশয় হল, মেঘনাদ অন্য কোথাও হৃদয় ও মন বাঁধা রেখেছে কিনা।

মেঘনাদ আবার বলল, 'কি হয়েছে বললে না?'

প্রথম রাত্রির প্রেমের মত লজ্জা ভয় ও নম্রতা ছিলনা লীলার। সে বলল তীব্র গলায়, 'যেখান থেকে আসা হয়েছে সেখানে গেলেই হয়।'

মেঘনাদ বলল সরলভাবেই, 'কোথাও নয় তো। বিপিনের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

অবলীলাক্রমে লীলা বলল, 'আজকের রাতেও? এত কি কাজের কথা?'

মেঘনাদ ভেসে গেল নিজের স্রোতে। ভাবল, তার নবপরিণীতাই হবে আসল শ্রোতা।

উৎসাহে হেসে উঠে বলল, 'তোমাকে তা' হলে বলি শোন। কাউকে যেন বল না এখন।'

এই মুহূর্তে লোকটিকে খুব মন্দ মনে হল না ঝুমির। কৌতূহলও হল খানিকটা। সে নীরবে তাকিয়ে রইল মেঘুর দিকে।

মেঘু বলল, 'বদরুদ্দিনের মনোহর বিস্কুটের নাম শুনেছ তো ?'

লীলা শুধু শোনেনি, খেয়েছে কয়েকবার। কিন্তু তার সঙ্গে আজ রাত্রির, ফুলশয্যার কি সম্পর্ক।

মেঘু বলল, আমার মাথায়ও একটা নতুন বিস্কুটের মশলা ঘুরছে। যদি ঠিকমত কাজটা হয়, তা'হলে আর শালা দেখতে হবে না, মাইরী বল্‌ছি। কি নাম দেব জান ? মেঘনাদের মালপো।'

ব'লে তার এই পরিকল্পনায় ও অনাগত সাফল্যের আনন্দে হেসে উঠল। আবার বলল, 'লোকে বিস্কুটের মধ্যে মাল্‌পো'র স্বাদ পাবে। দেখব শালা, মনোহরকে ছাড়ানো যায় কিনা। তারপরে আর একটা মাল বের করে ছাড়ব তোমার নামে, কি রকম হবে, অ্যাঁ ?'

অপমানটা আরও বেশী বাজল লীলার মনে। তার অভিশপ্ত জীবনের চাপা পড়া বুকে যে আকাঙ্ক্ষাটুকু ছিল নিজেরই অজান্তে, মেঘনাদের সরল হাসিটি তাকে উঠল ব্যঙ্গ করে। তার লাঞ্ছিত জীবনের সূর্যোদয়ের মুখে এ কোন্ পুরুষ। হৃদয়ে যার মেঘনাদের মালপো'র ভাবনা। বিতৃষ্ণায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আজকেও সেই ভাবনা ?'

মেঘনাদ দেখল তার বউয়ের চোখ দপ্‌দপ্ করছে। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। তবু বলল, 'ভাবনা এসে পড়ল তো, কি করব। মাইরী, হাত নিস্‌পিস্ করছে কখন কাজে হাত দেব।' বলে সেই আনন্দেই দু'হাত বাড়িয়ে সোহাগ-ভরে জড়িয়ে ধরল লীলাকে।

লীলা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এ' ছাড়া কি আর কিছু জান না ?'

'আর কি জানব ?'

'তবে চিরকাল ও-ই করোগে।'

মেঘু অবাক হয়ে বলল, 'তা' ছাড়া আর কি করব আমি? এই তো আমার চিরকালের কাজ।'

চীৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করল লীলার। দূরে সরে গিয়ে চাপা তীব্র গলায় বলে উঠল, 'তবে বিয়ে করলে কেন?'

মেঘু আরও অবাক। বলল, 'বাঃ, বিয়ে তো সবাই করে।'

'না। তোমার মত মানুষ মালপো বিস্কুটকে বিয়ে করে।'

মেঘুর ইচ্ছা হল হেসে বলে, 'ঠিক বলেছ।' কিন্তু এত রাগারাগি হলে কি করে বলা যায়। কি বলবে ভেবে না পেয়ে সে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল লীলার দিকে।

কিছুক্ষণ পর লীলা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'এসব বুঝি তোমার আমার চেয়েও বড়?'

মন কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। একেবারে সত্য কথাটাই বেরিয়ে পড়ল তার মুখ দিয়ে, 'সবকিছুর চেয়ে বড়।'

চকিত দোলানিতে রক্ত শাড়ি গলিত আগুনের মত ঢেউ দিয়ে উঠল। লীলা বলল, 'ইস্! কেন হবে তা?'

কথায় আর ধৈর্য ছিল না মেঘুর। এ কি নতুন বউ। লজ্জা ভয়, কিছুই নেই। সে চুপ করে রইল তবু।

তারপরে একসময়ে লীলার কান্নার শব্দে চমকে উঠল। কাছে গিয়ে তুলে নিল লীলাকে নিজের দুই হাতে। মেঘুর শক্তির কাছে লীলা একেবারেই তুচ্ছ। চেষ্টা করেও ছাড়াতে না পেরে ভেঙ্গে পড়ল তার দেহলতা।

তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মেঘু বলল, 'তুমি পাগল!' বলতে বলতে আবেগপ্রবণ মেঘু দু'হাতে বুকের কাছে টেনে নিল তাকে।

ভোরবেলা ঘুমিয়ে পড়ল মেঘু। কেবল বৃথা আক্রোশে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল লীলা তার সারা বিছানাটা জোড়া মস্ত বুকটার দিকে।

পোহাল ফুলশয্যার কালরাত্রি। বউয়ের মুখ কালো। আর ঝকমকে পোষাক ছেড়ে, তেলচিটে ন্যাকড়া পড়ে মেঘু ছুটে গেল গদীতে।

কিন্তু এর পরের জীবনে মেঘুর বাসনা ও কামনার পথে লীলা একটা বাধার মত দাঁড়াল। মেঘনাদের মালপো বিস্কুট নাম কিনল দেশ জুড়ে। সবাই ভাবল, নতুন বউয়ের আগমনে নতুন করে লক্ষ্মীলাভ ঘটল মেঘুর। এরকম একটা চাপা বিশ্বাস মেঘুরও হল। কিন্তু সে জানত, তার জীবনের এ সাফল্যকে ঘৃণা করে ঝুমি। অভিশাপ দেয়, যেন ঘুচে যায় এসব।

এদিকে হল না যখন, লীলা অন্য মূর্তিতে দেখা দিল অন্য দিকে। ঘরে সে পরবাসিণী। আজ যায় শ্রীনগরের রথের মেলায়। কাল যায় ঢাকা শহরে 'টকি' দেখতে। কোন কোন সময় মেঘনাদকেও যেতে হয় বৈ কি। মেঘনাদের হৃদয়ের একটি চাবিকাটি বাঁধা পড়েছিল তার আঁচলে। সে চাবি মেঘুর নিভৃত যৌবন দ্বারের। দ্বার উন্মোচনের দক্ষিণা আদায় করতে ছাড়েনি লীলা।

কিন্তু ঘরে কোন শ্রী নেই। কেন না, এ ঘর কোন মায়া দিয়ে বাঁধতে পারল না সোনাদুলির মেয়েকে। এ ঘরে মেঘুর জন্য রচিত হল না কোন সুপ্ত শান্ত সুন্দর ও প্রেম দিয়ে ঘেরা একটি সুখের কোন্। ছুতোরের ঘরে একটি বদনাম আছে।

ছুতোরের তিন মাগ,
ভানে কোটে খায় দায়,
থাকে থাকে যায় যায়।

এ ঘরের রূপ হল তেমনি। কারটা কে দেখে। এমন কি, সংসার চালাতে সামান্য যে রান্না খাওয়া, সে নিয়মেও ব্যতিক্রম দেখা দিত কোন কোন সময়। লীলা তখন হয়তো কোন বাড়িতে গোলকধাম পেতে খেলতে বসেছে।

দুর্নাম রটেছে লীলার নামে। তবু চরিত্রের গতি বদলালো না তার। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে বিবাদ হয়েছে অনেক। বছর কয়েক পরে আর হয় না। একই ঘরে তাদের পরস্পরের বিমুখী জীবন।

সেটা সয়ে গেল মেঘনাদের। কেন না, তার জীবনের পনরআনা জুড়ে ছিল যে গদী ও কারখানা, সেখানকার শ্রীবৃদ্ধিই তার হাসি আনন্দ সান্ত্বনা। লীলার

খেয়ালের জন্য অর্থ দিয়ে সে খালাস। আর সে অর্থ দিতে কার্পণ্য করেনি সে।

কিন্তু লীলা সবসময় এতেই তুষ্ট নয়। তার অনেক খেয়ালের সঙ্গী হিসাবে সে চায় মেঘনাদকে। তখনই লাগে সংঘর্ষ। বিশেষ কারখানা ও গদী যখন ছেড়ে আসতে হয় তাকে।

দিনে দিনে শুধু লক্ষ্মীলাভ নয়, কারখানার অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। সেই কারখানা গদীতে পর্যন্ত লীলার গতিবিধি। এমনকি কারখানার কর্মীদের মধ্যে কর্ত্রী হিসাবে নিজের প্রতাপ খাটাতে চায় সে। ফলে তার প্রতি একটা বিদ্বেষ ছিল সকলের। শুধু বিদ্বেষ নয়, তার নির্লজ্জ ব্যবহার কারখানার মধ্যে একটা আলোচনার বিষয়বস্তু। অনেকের অশ্লীল গল্পের খোরাক।

কারখানার প্রতি কর্তৃত্ব সবচেয়ে বেশী নিষ্ঠুর করেছে মেঘনাদকে। তীব্র ঘৃণায় নিজের জীবন থেকে সে দূর করে দিতে চেয়েছে ঝুমিকে। আঘাতের পর করেছে আঘাত। কিন্তু ঝুমি কখনো দূর হয়নি। সে ক্ষমতা আর ছিল না ঝুমির। মনের গভীরে কিছু ছিল কিনা কে জানে কিন্তু তার রক্তস্রোতের মুখে একটা বাঁধ খাড়া হয়েছে। স্রোত গতিহারা হয়েছে। এখন শুধু বদ্ধ জলার আবর্ত।

এ অবস্থার একটা পরিসমাপ্তির আশা করা গেছল লীলার সন্তান হওয়ার পর। কিন্তু সন্তান হতেও যা ছিল, মরে যাবার পরেও তাই।

তবে ঝুমি এসে মেঘনাদের কিছু বুদ্ধিলাভ ঘটেছে। তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত বুদ্ধি। সে বুঝল, ছোটকাল থেকে রক্তক্ষয়ী পরিশ্রমে যে রক্তস্তম্ভ সে গড়েছে এবং গড়ছে, তার চরম শত্রু ঝুমি চিরকালই থাকলে তার কাছে। প্রতিমুহূর্তে একে দাবিয়ে রেখেই, তাকে অগ্রসর হতে হবে তার পথে।

তাই তার জীবনে এই লীলার পরিচ্ছেদ শুধু দীর্ঘ নয়। এর বোধহয় আর শেষ নেই।

তবুও লীলা যখন তারই সামনে খিল্‌খিল্‌ করে হেসেছে কারখানার লোকের সঙ্গে, বিপিনকে রক্ষী হিসাবে নিয়ে নৌকায় ভেসে গেছে দূর দূরান্তের মেলায় কিংবা সহরে, তখন তার বুকের মধ্যে উঠেছে টন টন করে। এই টনটনানির

আর এক নাম যে ভালবাসা, তা' সে জানত না। আর স্বীকারও করত না কোনদিন। কেন না নিজের কাছে এই অসহ্য বেদনাদায়ক সত্যটিকে স্বীকার করলে বুঝি সে ভেঙ্গে পড়ত।

তবে কারখানার কারিগরদের সে বিশ্বাস করত। সে মালিক বটে, কিন্তু এখানো সে পরিচয়টা বড় নয়। কারণ, সে নিজে একজন কারখানার কর্মী। এই লোকগুলির হৃদয় ও মনের চেয়ে পরিচিত তার কাছে লালমিঞাও নয়। আপন হতে পারে অবশ্য।

আর বিপিন। তাকে অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন নেই। তাকে সবাই বলে হেড্ মিস্তিরি। তা' ছাড়া মেঘুর সে বন্ধু। তার চেয়েও বড় কথা, এই বিপিনই, ঝুমিরও খুব প্রিয়পাত্র। কাজে অকাজে সে ডেকে পাঠাবে বিপিনকে। খবর নেবে সব বিপিনের কাছ থেকে। এমন কি বিপিনের খবরও। বিপিন যে বাজারের মেয়েমানুষটির কাছে যায়, তার সংবাদও। শুধু ছুটি ব্যাপারে বিপিনের আপত্তি ছিল। ঝুমি যখন তাকে প্রলোভিত করতে চাইত। যে প্রলোভনের মধ্যে ছিল না কোন প্রেম। প্রেমতো নয়ই, প্রলোভনের অর্থই অস্পষ্ট। আর যখন ঝুমি মেঘুকে ও মেঘুর চেহারাকে নিয়ে, বোকা নিষ্ঠুর বলে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত তার কাছে। কিন্তু এখন সেটা গা সওয়া হয়ে গেছে তার। যেমন মেঘুর সয়ে গেছে অনেককিছু।

মেঘু ও ঝুমির চেয়ে বিপিন অনেক বড়। তবু এ দুজনের মাঝখানে সে একটি সেতুর মত। তাদের দু'জনেরই হৃদয়তলের সে সাক্ষী। মেঘুর সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে বিপিনের মদভেদ ছিল। সত্য, এ ব্যবসা বড়, কিন্তু ঝুমিকে এত দূরে সরিয়ে কেন রেখেছে কর্তা।

মনে আছে মেঘুর, বিপিন তাকে একদিন বলেছিল সেই কাহিনী। গতবছর নারায়ণগঞ্জের ব্রহ্মপুত্রে নাঙ্গলবন্ধ স্নানে গিয়েছিল ঝুমি বিপিনকে সঙ্গে করে। নৌকায় করে গিয়েছিল। সারারাত্রি ধরে ঝুমি কথায় ও ভাব-ভঙ্গিতে বিপিনকে নানারকম ইঙ্গিত করেছে। বিপিন জানত, ওটা তার কর্ত্রী ছুঁড়ির খেলা মাত্র। তাকে নিয়ে একটু খেলা করতে চায় সে। রাগ হয়েছিল বিপিনের। ইচ্ছা

হয়েছিল, জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্ত্রীর খেলার সাধ মিটিয়ে দেয়। মনে হয়েছিল, কিন্তু নারী-ভুখ সেই জানোয়ারটা ছিল না তার মধ্যে। সে বলেছিল, 'দেখ ঠাকরুন ঠিক বয়সে বে' করলে তোমার মত একটা মেয়ে আমাকে বাপ বলে ডাকত। শুধু শুধু আমাকে ব্যস্ত করে না।'

ঝুমিও বিপিনকে বলে বিপিনদা। বলেছিল, 'ঠাকুর্দার বয়সী পুরুষ আমাকে দেখলে দাড়ি ঘষে, তুমি তো বাপের বয়সী গো বিপিনদা। বাজার ঘুরে ঘুরে চোখ তোমার খারাপ হয়ে গেছে।'

বিপিন জানত ঝুমির সঙ্গে কথায় এঁটে ওঠা দায়। আর পাত্রাপাত্র জ্ঞান ও রুচিবোধেরও ধার ধারে না সে কথার। সে বলেছিল, 'একটা কথা বলব ঠাকরুন।'

'একটা কেন, দশটা বল না।'

'কর্তার 'পরে কি তোমার একটুও মায়া দয়া নাই। অমন সোনার মানুষ—'

'সোনার মানুষ তো তোমাদের কাছে। মাস গেলে মাইনে পাও। ইচ্ছে করলে ঠকাতেও পার। মাথায় হাত বুলিয়ে নিতে পার দু'পয়সা বেশী। তাতে আমার কি?'

বলতে বলতে ঝুমির চোখে দেখা দিয়েছিল আগুনের ফুলকি। বিপিন বলেছিল, 'কেন, কর্তা তো তোমাকে কোনদিক থেকে বঞ্চিত করেনি?'

তীব্র ঘৃণায় জ্বলে উঠে বলেছিল ঝুমি, 'বেশ্যার ঘর কর, তুমি বুঝবে কি করে? পয়সা ছাড়া আর বঞ্চনার কারণ বোঝ না। মেয়েমানুষ পড়ে থাকবে, তোমরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারপর ফিরে যাবে নিজের কাজে, না? কাজে যদি অত মন প্রাণ ঢেলে থাক, তবে মেয়েমানুষ ঘরে আনার শখ্ কেন? ওটাও বাজারে সেরে এলেই হয়?'

গৃহস্থ মেয়ের মুখে এসব কথা শোনা বিপিনের অভ্যাস নেই। কষ্ট হচ্ছিল তার। তবু শুনতে হচ্ছিল। কেন না, ঝুমির এমন মূর্তি সে দেখেনি কোনদিন। ঝুমি আরও বলেছিল, 'তোমার কর্তা একটা কারখানার পোকা। মরলে ওকে গুঁড়িয়ে ময়দা করে তোমরা বাজারে ছাড়তে পারবে 'মেঘনাদের মালপো' বলে।

গদী ওর প্রাণ। মনে নেই, ফুলশয্যার ঘরে পড়েছিলুম একলা, আর তোমাদের কর্তা রাত কাবার ক'রে এসে শোনাতে এল নতুন মশলার কথা আর মালের কথা। ও-ই কি বিয়ে আর ও-ই কি পুরুষ। প্রাণের ভাগ নেই, মায়া মমতা কিসের? মেয়েমানুষ তোমাদের চেয়ে বুঝি খাটো? কোন্ বিষয়ে? তোমরা ঠকাতে পার, আমরা পারিনে? আমরা পারিনে লণ্ডভণ্ড করতে সব? বিনা পূজোয় তুষ্ট কে? তা' নয়, তোমরা কি রকম জানো? তোমরা পার, মেয়েমানুষকে যা করে হোক, ঘাটে অঘাটে, যে কোন সুযোগ তার সব চুরি করে নিতে। চোরের দল।'

কর্ত্রী নয়, তণ্ডুলের অগ্নিশিখা। এত জ্বালা কিসের? কথা বলতে পর্যন্ত ভয় হয়েছিল বিপিনের। বাপ্‌রে বাপ্! মারবে নাকি? কিন্তু কর্তা কি তার ঠিক তাই? লোকটা তো সে রকম হৃদয়হীন নয়। দেখলে অবশ্য মনে হয় তাই। সন্দেহ নেই, কারখানার পোকা ভেবে ভুল করেছে কর্ত্রী। কর্ত্রীর নিজের মনে কোথায় ফাঁকি আছে। কর্তাকে চিনতে পারেনি।

তারপরেই তীব্র হেসে বলেছিল ঝুমি, 'আমি তোমার কর্তার বউ, তাই। নইলে, একলা পেয়ে তুমি কি আমাকে আজ ছেড়ে দিতে বিপিনদা? দেখ আমার দিকে তাকিয়ে দেখ একবার।'

বিপিন তাকিয়েছিল। ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠেছিল তার চোখ। জ্বালা ধরে গেছল শরীরে। বিস্রস্ত-বসনা ঝুমি। এমন ভয়ঙ্কর সুন্দর দেহ কোনদিন দেখেনি সে। পরমুহূর্তেই উঠে গেছল সে যেখান থেকে, নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার জন্য।

ঝুমি বলেছিল, 'কোথায় যাও?'

'বাড়িতে?'

'কেন?'

'আমি থাকব না।'

'তুমি থাকবে না, আর দশজন আসবে। লাভ কি তাতে?'

'তুমি সেইটাই চাও।'

ঝুমি এক মুহূর্ত তাকিয়ে বলেছিল, 'ভীতু কোথাকার!—বেশ, যাও!'

নৌকা থেকে নেমেছিল, তবে যেতে পারেনি বিপিন। কিন্তু, ঝুমির কথায় একটা যুক্তি ছিল। যুক্তি নয়, একটা দাবি। একটা বিচিত্র দুর্বোধ্য দাবি। লীলার মত মেয়ের এই অদ্ভুত অজানা দাবিটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিল সে মেঘনাদকে। বলেছিল, কর্তা যদি একটু ঘরের অর্থাৎ বউয়ের দিকে মন না দেয়, তা' হলে ফ্যাসাদ কাটবে না।

মেঘু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেছিল, 'মন আর কেমন করে দেব, বলতে পারিস্ বিপিনদা? আমি তো জানি না। যাক্, ওসব কথা আর বলিস্‌নে।'

জীবনের এ অভিশাপকে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে মেনে নিয়েই, মেঘনাদ জীবনের পথে চলবে নিয়ত। ওটাই তার বিধি বলে সে জানে। একদিন সে হরিনামের কণ্ঠি ছিঁড়ে ফেলেছিল তার গলা থেকে। মরবার সময় ছিঁড়েছিল তার বাপ। আর কোনদিন সে ওই কণ্ঠি গলায় পরেনি। সাহা-গদীর মালিকদের মত সকাল সন্ধ্যায় জপে না মালা। ভিক্ষা করে না হরি ভক্তি। নিজের শ্রম ও চিন্তার উপরেই সে নির্ভরশীল। সুতরাং, ঝুমির কাছে তার কিছু প্রাপ্তির আশা নেই। সে যা আছে তাই থাকুক।

এই ঝুমির নামে নূতন 'ঝুমির ঝুড়ি' বলে বিস্কুট বের করেছে সে। সারা দেশে এই নিয়ে কত হাসাহাসি, গান বাঁধবাঁধি পর্যন্ত হয়েছে।

মেঘার মালপো ঝুমির ঝুড়ি।
খেলে পাবে ঝুমি এক কুড়ি॥

অথবা

ঝুমির ঝুড়ি মেঘনাদে খায়।
মেঘার মালপো দিল্লীতে যায়॥

বদরুদ্দিনের মনোহর টিকে আছে। কিন্তু তার যৌবন গেছে চলে। সেটা ছিল তার জীবনে ছোট একটি কাঁটা। কিন্তু ঝুমির মত এত বড় অভিশাপ আর কি আছে। যে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে নিয়ত। ফিরবে তো চিরজীবন ধরেই।

ছিল, এর চেয়ে বড় অভিশাপও ছিল তার ভাগ্যে। তাই তাকে আজ এই গাড়িতে উঠতে হয়েছে। তাই বেজেছে স্মৃতির সেই বিয়ের বাঁশী। তাই এক সংশয়ান্বিত অজানার উদ্দেশ্যে অবিরাম ছুটে চলেছে সে এই মেল গাড়িতে।

ঝুমিকে বুকে মাথা রাখতে বাধা দেয়নি সে। দিলও না আর। ঝুমি আরও লেপ্‌টে এসেছে তার গায়ে। তার খেয়াল নেই যে, লোকে তাদের এরকম ভাবে দেখলে কি ভাবতে পারে। সেই ছেলেটা কি বিচিত্র। কখন বেঞ্চ বদলে লীলার পাশে, পায়ের কাছে বসে ঢুলতে আরম্ভ করেছে।

হুইস্‌লের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে ছুটে চলছে গাড়িটা। এ রাত্রি কি পোহাবে? যেন না পোহায়। এই গাড়ি যেন কোন দিন গন্তব্যে না পৌছায়। মেঘ ফুঁড়ে যেন হেসে না ওঠে চাঁদ। দিগন্ত যেন পরিষ্কার ভেসে না ওঠে চোখের সামনে। মেঘনাদ জনতে চায় না, দেখতে চায় না কোথায় এসেছে সে।

অভিশাপের সেই স্মৃতি ফুটে উঠল তার মনে।

বিয়ের বছর কয়েক পরেই এল যুদ্ধ। একটা আঘাতের সম্ভাবনা দেখে দিল। ময়দা অদৃশ্য হল বাজার থেকে।

তাও উদ্ধার করল লালমিঞা। একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল ঢাকা শহরে। ধানমণ্ডাইয়ের এক বিরাট প্রাসাদে এসে হাজির। ছোট খাটো আফিস। নোকর আর্দালির ছুটাছুটি।

সেখানে মেঘুকে সঙ্গে করে লালমিঞা দেখা করল এক সাহেবের সঙ্গে। সাহেব মুসলমান। মেঘু দেখল, লালমিঞাকে খুব খাতির করে বসালেন তিনি। শুনলেন সব কথা। শুনে তিনি তাকিয়ে দেখলেন মেঘনাদকে।

তারপরে একটা কাগজ টেনে লিখলেন মেঘনাদের নাম ও ঠিকানা। জিজ্ঞেস করলেন, সপ্তাহে কি পরিমাণ ময়দা তার চাই। পরিমাণ শুনে বললেন, 'সপ্তাহে একবার করে আপনাকে নারায়নগঞ্জ থেকে মালটা নিয়ে যেতে হবে। নৌকায় করে নিয়ে যেতে পারেন। ওদিকে ময়দা পাওয়া যাবে না। সিরাজদিঘার দিকে কোন গোডাউন নেই, পারবেন তো?'

মেঘু বলল, 'পারব।'

সাহেব বললেন, 'আপনার কারখানা আছে কি না, সেটা দেখতে লোক যাবে।'

'কাগজে একটা সই চাইলে দেবেন। টিপসইও দিতে পারেন। ওদের কিছু টাকা দেবেন জল খাওয়ার জন্য। পারবেন না দিতে?'

জবাব দিল লালমিঞা, 'নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু কত টাকা?'

'শ' পাঁচেক।'

লালমিঞা বলল, 'পারবে।'

কিন্তু পাঁচশোতে হল না। দিতে হল হাজার টাকা। কোন অপরাধ না করে দিতে হল মেঘুকে। এ কাজটি তার জীবনে নূতন। অনেক অবিচার সে সয়েছে জীবনে। এ সংসারের অবিচারের নিয়ম কানুনের কথা শুনেছে তার চেয়েও বেশী। বিস্মিত হল না সে, কিন্তু রক্তের টাকার জ্বলুনিটা কাটল না। লেখাপড়া জানা চাকুরেলোকগুলি কী সর্বনেশে। দুটি কলমের খোঁচা দিয়ে পথে বসাতে পারে মানুষকে। নইলে জল খেতে হাজার টাকা!

লালমিঞা বলল, 'ওটা তোর নসিব, কিন্তু ওদের টাকা থাকবে না। ওর জন্য দুঃখ করিস্‌নে ব্যাটা।'

তবে একটা কথা। মাইল বিশেকের মধ্যে বদরুদ্দিন সহ প্রায় সকলের বিস্কুটের কারখানাই লাটে উঠে গেল। লালমিঞার পরামর্শ মত মেঘু বদরুদ্দিনকে ময়দা দিয়ে সাহায্য করতে চাইল। বদরুদ্দিন তা প্রত্যাখান করল।

তারপরে লালমিঞার মৃত্যু। মৃত্যুর কিছুদিন আগে লালমিঞা মেঘুকে নিয়ে আর একবার গিয়েছিল সদরে। ঢাকায় উকিলের সঙ্গে বসে লেখাপড়া ক'রে উভয়ে দিল টিপ সই। তারপরে একটা কাগজ তুলে দিল লালমিঞা মেঘুর হাতে।

মেঘু জিজ্ঞাস করল, 'কিসের কাগজ চাচা?'

লালমিঞা বলল, 'বিক্রী কবালা।'

বিস্মিত মেঘু বলল, 'কিসের বিক্রী?'

হেসে বলল লালমিঞা, 'বোকা কোথাকার। গদী আর কারখানার জমি বাড়ি এতদিন আমার নামে ছিল। তোরটা এবার তোর নামে করে দিলাম। নইলে আমার ভায়েরা এসে দখল চাইতে পারে।'

মেঘু আরও অবাক হায় বলল, 'কিন্তু, বিক্রী করলে, তোমার টাকা নিলে না যে?'

লালমিঞা বলল্ চোখ কুঁচকে, 'তোর কাছে অনেক দেনদার আমি। সেইটে শোধ দিলাম। মরবার সময় দেনা রেখে গেলে মুসলমান নরকে যায়। তাই যাব বুঝি আমি?'

মেঘু নির্বাক। শুধু চোখ দুটি ছল্ছল্ করে উঠল। ফিরে যাবার পথে, নৌকার পাটাতনে নামাজ পড়ল লালমিঞা। বুড়িগঙ্গার পশ্চিম আকাশ তখন লাল। লালমিঞা বলল, 'মেঘু, আমার বিবি তোকে ছাওয়াল বলে জানে।'

বলতে হল না। মেঘুর হৃদয়ে যে এমন একটি নরম দিক আছে, তা ভাবাও দুষ্কর। তার চোখে জলের ফোঁটা দেখা দিল।

লালমিঞা বলল, 'কাঁদিস্নে মেঘু। আমারও ছাওয়াল তুই। শুধু আমার বিবির পেটে হোস্নি। তোর মত খাঁটি ছেলে ক'জনার থাকে। আমি মরে যাব শীগ্গিরই। তোর চাচিকে তুই দেখবি তো ব্যাটা?'

মেঘুর হৃদয় তার জিভে কথা যোগাল, 'সে কথা কি তোমাকে বলতে হবে চাচা?'

'সে মরলে কবর দিস্ আমারি পাশে।'

মেঘু দেখল, লালমিঞার বৃদ্ধ চোখেও জল। সে খালি বলল, 'আর ব'লো না চাচা।' বলে সে মুখ ঘুরিয়ে বসল। ওই মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকা, তার কথা শোনা আর সহ্য হয় না মেঘুর। লালমিঞা আপনমনে বলে গেল অনেক কথা। সেকথা, ধলেশ্বরীর একটানা ছল্ছল্ শব্দের মত।

'মহেশ্বরদী পরগণায় মাঝের-চর গ্রাম। ভৈরবের পথে নৌকায় যাচ্ছিলাম মেঘনা গাঙ্গের উপর দিয়ে। তখন আমি মস্ত সওদাগর। দেখলাম, মেটে কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে আমার দিল দৌলত্ দৌলতোন্নিসা। নৌকা বাঁধলাম ঘাটে। মেয়ের পেছনে পেছনে গেলাম তাদের ঘর। দেখলাম

বাপ হাল-চাষী। বললাম, গোলামকে মাপ্ করেন বাপজান্। বিক্রমপুরের অমুক মিঞার ব্যাটা অমুক মিঞা আপনার বেটিকে সাদী করতে চায়। ব্যাটার আছে সামান্য গদী। আর বলতে হল না। বুঝে নিল সব। না খাইয়ে ছাড়ল না। নকশী কাঁথা পেতে, মাটির সান্‌কিতে দিল ভাত। চিঁড়ুর বাড়ির ঝাঁজালো কাসুন্দি, গণ্ডা কয়েক কাঁচালঙ্কা, কুড়িখানেক খয়রা মাছ ভাজা আর দু'বাটি দুধ। সাদী না করেও মনে হল সাদী করেছি। আসবার সময় চৌকাঠের কাছে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিল এক ফোঁটা দৌলত—দলুবিবি। চোখ কী! সেই চোখ দিবাদিশি না দেখলে মেজাজ ঠিক থাকে! মেঘনার জল কালো। কিন্তু তলা দেখা যায়, এমন কালো। মেঘনার মত তার চোখ। সেই চোখের তলায় দেখলাম, একখানা কাঁচা টস্‌টস্ দুর্বাঘাসের মত প্রাণ। মংব্বতের বাতাসে কাঁপছে থরথর করে।'

একটু চুপ করে আবার বলল, 'সাদী হল। মেঘনা জীবন কাটিয়ে দিলে এই ধলেশ্বরীর পাড়ে। মেঘু, কিছু বলব না আর। কিন্তু তোকে আর দলুবিবিকে ছেড়ে যেতে হবে, সে ভাবনা বড় তখলিফ্ দেয়রে।'

মেঘু বলল, 'যাবে কেন?'

লালমিঞা হাসল। বলল, 'যাক্ ওসব কথা। যে সাহেবের কাছে তোকে নিয়ে গেছলাম, সে এক গরীব মুসলমানের ছেলে ছিল। আমি টাকা দিয়েছিলাম, তাইতে লেখাপড়া শিখে অতবড় হয়েছে। বিপদে পড়লে ওর কাছে যাস্, বলে রাখলাম।'

এর তিনমাস পরে মারা গেল লালমিঞা। জীবনে মেঘুর আপনজন হারানোর শোক এই প্রথম। তারপরের বছরগুলি মেঘুর কেটেছে একেবারে নিরঙ্কুশ কারখানা আর গদী নিয়ে। ঢাকা শহরে তার কারখানাকে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা সেটাই তার ভাবনা। ইচ্ছাটা, ইংরেজদের মত নতুন মেশিন কিনে সে বড় কারখানা করবে।

কিন্তু সময় বসেছিল না তার জন্য। ছেচল্লিশে নেমে এল ভয়াবহ দাঙ্গা। তার দুজন কারিগর ভিন্ন আর কেউ মরেনি। মেঘুর গদী কারখানা জ্বালিয়ে

দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কার্যকরী হয়নি। দেশ অরাজক। কারখানা বন্ধ। তারপর শোনা গেল হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের ভাগাভাগির কথা। জুন মাসের শেষের দিকে আলোচনা এত দ্রুত হল যে, মেঘু পাগল হয়ে যাবে মনে হল। দুর্বলতাবশে, ঢাকেশ্বরী, বুড়োশিব, সব জায়গায় মানত করল, যেন দেশ ভাগাভাগি না হয়। কেন না, দাঙ্গা তো চিরকাল চলবে না। কালকেই আবার সবাইকে ক্ষতির খতিয়ান খুলে বসতে হবে।

শুধু আশ্চর্য! এতে কোন দুঃখ দেখা গেল না লীলার। সে বোধ হয় ভাবছিল, এবার তার গর্বিত স্বামীর অহঙ্কারের চূড়া পড়বে ভেঙ্গে। মন্দ কি, মানুষটা একটা অমানুষিক পরিশ্রম ও ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। হয় তো মনটা অন্য আর একদিকে সুস্থির হয়ে বসবে।

জুলাই মাসের প্রথমে সে আর চুপ করে থাকতে পারল না। এই তো আসল বিপদ। লালমিঞার কথা মনে পড়ল। গেল ঢাকা, ধানমণ্ডাইয়ের প্রাসাদে। সেখানে তখনো সেই সাহেব।

শিষ্ট আচরণ করে বসালেন মেঘুকে। শুনলেন সব কথা। তারপরে বললেন, 'যতদূর বিশ্বাস, দেশ বিভাগ হবেই। কলকাতায় আপনার কেউ আছে?'

চকিতে একবার মেঘুর মনে পড়ল তার শ্বশুরের কথা। কিন্তু সে কলকাতায় নয়। কলকাতা থেকে বিশ পঁচিশ মাইল উত্তর শহরতলীতে। বলল, 'কলকাতায় নেই, একটু দূরে আছে।'

সাহেব একটু ভেবে বললেন, 'সে-ই ভাল। কলকাতার বাইরেই কারখানা করতে হবে। আপনি সেখানে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

চলে যাওয়ার ব্যবস্থা! পায়ের তলায় মাটি কেঁপে উঠল। উৎকণ্ঠায় উদ্দীপ্ত চোখের সামনে নেমে এল অন্ধকার। তার তিলে তিলে গড়া রক্তস্তম্ভটার গোড়ায় শাবলের ঘা পড়ল। এর মধ্যেই চলে যাওয়ার ব্যবস্থা! জীবনের আকাঙ্খা, যৌবনের উন্মাদনা যে মহলের পর মহল গড়ছে, তুলতে গেলে সে যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কুটিল সন্দেহে ভ্রূ-আড়াল দিয়ে দেখল সে সাহেবের দিকে। তাড়িয়ে দিতে চায় নাকি তাকে মুসলমান সাহেব।

মেঘুর বাঁকা ভ্রূর ওঠানামায় ভ্রূক্ষেপ নেই সাহেবের। বললেন, 'দিনকাল ভাল বুঝছি না। ভরসা দিতে পারলে আপনাকে থাকতে বলতাম। আপনি আমার ইষ্টজনের দোসর। আপনি আর আমি যা পেয়েছি, মূলে সেই মোল্লার মোল্লা লালমিঞা। আপনাকে লুকিয়ে লাভ নেই। বড় খারাপ দিন সামনে। কখন কি হয় বলা যায় না। আমার পরামর্শ যদি চান তবে চলে যান আগেই। গিয়ে, সেখানে কারবার খোলার চেষ্টা করুন। এখন থেকে চেষ্টা করলে একটা কিছু হতে পারে। অবস্থা ভাল হলে ফিরে আসতে কতক্ষণ!'

না, সাহেবকে সন্দেহ করতে পারল না মেঘু। কেবল মাথার মধ্যে দুর্ভাবনা একটা চড়ুইয়ের মত উড়ে বেড়াতে লাগল ফর্‌ফর্‌ করে। সে তাকিয়ে ছিল একটা বোবা পাগলের মত। সাহেব তার হাত ধরলেন, 'এই-ই সময়। লালমিঞার সতাতো দু'ভাইয়ের এবার নজর পড়বে আপনার উপর। খুব সাবধান! সেদিকে নজর রাখবে আমার লোক। সয়তান তো সুযোগেরই সন্ধান করে। আঁধার হলে শেয়াল গাঁয়ে ঢোকে। দাঙ্গা থেমেছে—লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ।'

সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। বুকে ফিক ব্যথা নিয়ে মেঘনাদ তাই তো দেখল। দাঙ্গা বরাবর ঢাকার শহরেই হয়েছে। ঢাকা শহর থেকে কালে ভদ্রে দাঙ্গা ছড়িয়েছে চাঁদপুর কিংবা চাটগাঁ শহরে। দূরে গ্রামে হাটে কিংবা বাজারের মানুষেরা খালি গুজব শুনেছে, ঢাকার শহর থেকে দাঙ্গাবাজরা নাকি আসছে। আসেনি। ভয়ে ভয়েই কেটে গেছে দুদিনের মেঘ।

এবার কাটল না। এবারে অন্যরকম। তার চেহারাই আলাদা। নিদারুণ সর্বনাশের সমারোহ নিয়ে এসেছে সে। ভয় অবিশ্বাস সংশয়, রাগ ও ঘৃণা এবার দূর গাঁয়েও এসেছে। পাশাপাশি, মুখোমুখি বিদ্বেষ ও আস্ফালন। মেঘনাদ কবে ভেবেছিল, তার কারখানা জ্বালিয়ে দেওয়ারও আবার ষড়যন্ত্র হতে পারে। তাও হয়েছে।

সাহেব বললেন, 'আপনার টাকা পয়সা কি ব্যাংকে থাকে?'

মেঘনাদ বলল, 'না। ঘরেই থাকে।'

'খুব খারাপ। তা' ছাড়া টাকা কখনো ফেলে রাখতে নেই। ব্যাংকে থাকলে সুদ পেতেন। ক্যাশ টাকা আর গহনা, সবই নিয়ে যাবেন। এই নিন আমার ঠিকানা। আমাকে চিঠি দেবেন। বাকী সম্পত্তির ব্যবস্থা করার আগে আমাকে জানাতে পারেন। এই আমার পরামর্শ। এখন আপনার ইচ্ছা।'

ফিরে এল মেঘু। মিছিল বেরিয়েছে শহরের পথে পথে। পাকিস্তান চাই! নবাবপুর, ইসলামপুর, বাবুবাজার, চকবাজার, সমস্ত পথগুলি হেঁটে হেঁটে পার হয়ে এল সে। কোথাও দাঁড়াল। বসল একটু। কি খবর, কি রকম মনে হচ্ছে? হতাশা। শুধু হতাশা, অবিশ্বাস, সংশয় ও বিদ্বেষ। পাকিস্তান দাও, হিন্দুস্থান দাও। এই সব পথে পথে ঢাকার ব্যবসাকেন্দ্র। উঠতে বসতে সকলের একই আলোচনা। গত বছরের দাঙ্গার দাগ রয়েছে এখনো এখানে সেখানে। ভাঙ্গা পোড়া। মহাতাণ্ডবের নখাঘাতে শহর জুড়ে ক্ষত। দগদগে ঘা।

এ পথে সে পথে বেকারী। শহরের বড় বড় সব বেকারী কারখানা। শহর ছাড়িয়ে দূর গ্রামে এদের অপ্রতিহত গতিকে রোধ করেছে মেঘনাদ। বুড়িগঙ্গার ওপারের বিশাল এক অঞ্চলে, ঢাকা শহরকে বুক দিয়ে ঠেলে রেখেছে সে। আশা ছিল, একদিন খাঁটি আর নতুন জিনিস দিয়ে সারা মুন্সিগঞ্জ মহকুমার চাহিদা মেটাবে।

মিছিল। শুধু মিছিল! কে বার করতে বলেছে, কারা বের করেছে, সব যেন একটা দুর্বোধ্য বিষয়ের মত জট পাকাচ্ছে মাথায়। হাজার হাজার লোক মেতে গেছে। হাজার হাজার লোকের লাভ। সকলের লাভ, ক্ষতি শুধু মেঘনাদের?

হাতের মধ্যে সাহেবের ঠিকানাটা চটকাতে চটকাতে সে বাদামতলীর ঘাটের দিকে এগুল। সেমিজ অথবা শুধু সায়া পরে ঢুলুঢুলু চোখে দিনেরবেলাও দাঁড়িয়ে আছে মেয়েগুলি। শহরের বাউণ্ডুলে আর লোচ্চাদের জটলা। মেঘনাদের বিরাট চেহারাটা নিয়ে অনেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। দিনের বেলাতেই নাগর হতে চায় নাকি? জিজ্ঞেস করল কেউ কেউ।

মেঘনাদ তাকিয়ে দেখল। বাদামতলীর ঘাটে এসে দেখল অনেক চালের আড়ৎ ঝাঁপ বন্ধ। কিছু কিছু ভাঙ্গাচোরা পোড়া। ধূলোয় ছড়ানো চাল। ঘাটে স্টিমার। কুলিরা তুলছে মাল। পশ্চিমে নবাব বাড়ি।

সব আছে অথচ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ছে সব কোথায়। দেখা যায় না। পা টলে খালি। নৌকায় গেল না মেঘু। সন্ধ্যাবেলা বসে রইল ঘাটে। সন্ধ্যারাত্রি না নামতেই ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। ঝিমিয়ে গেল শহরটা। বুড়িগঙ্গার জলে দেখল, লালমিঞা যেন ঢেউয়ে বসে নামাজ পড়ছে। দু চোখে জল। নামাজ পড়ে কাছে এসে বলল, 'ভেবে কি হবে মেঘু। থেমে থাকিস্‌নে। একবার থামলে সর্বনাশ। সাহেব যা বলেছে, তাই কর। বেরিয়ে পড়। দিন কখনো সমান যায় না। পথে অনেক কাঁটা। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না বাপ্‌! আজ দেশ জুড়ে সবাই লালমিঞা হয়ে গেছে রে। সকলের সর্বনাশ, তোর একলার নয়। সাহা ঘরের ছেলে তুই। বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়।'

বাঁধানো পোস্তার গায়ে আছড়ে পড়ছে বুড়িগঙ্গা। জল ছিটকে লাগছে গায়ে। ধনপতি সওদাগরের ঝিমুনো রক্তধারায় মৃদু জোয়ারের আভাস দেখা দিল। ঠেকে যাওয়া চার সপ্তডিঙ্গা দুলে উঠল। সামনে রক্তনদী, তারপরে আগুনের সমুদ্র। সমুদ্রের স্রোতে তরল আগুন আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে লেলিহান অগ্নিশিখা। ওসবই তো অপদেবতার মায়া। আকাশের বুকে পিশাচী অট্টহেসে বলছে 'যাস্‌নি। রক্তনদী গিলবে, অগ্নিদেবের খ্যাপা বাহন পুড়িয়ে মারবে। ওরে যাসনি, যাসনি।' এই তো মায়া। প্রেতিনীর খেলা।

উঠে দাঁড়াল মেঘু। একদিন তার বাবা এসে এমনি করে বেরিয়ে পড়তে বলেছিল তাকে। অনন্তির ঘাটে গহনার নৌকায় বেরিয়ে পড়েছিল সে। আজ লালমিঞাও বেরিয়ে পড়তে বলছে।

স্টিমার ভোঁ ভোঁ করে উঠল। ছাড়বার সময় হয়েছে। টিকিট কেটে স্টিমারে উঠল মেঘু। মধ্যরাত্রে তালতলায় নেমে গেল। স্টিমার অন্যপথে ভেসে গেল বরিশালের দিকে। মেঘু নৌকায় করে ভোরবেলা এসে পৌঁছুল সিরাজদিঘায়। ঘাট যেন ছন্নছাড়া। ভাঙ্গা হাট। বন্ধ কারখানা। বন্ধ গদীঘর।

মেঘু গেল লালমিঞার বাড়ি। লালমিঞার দলুবিবি পীড়ি পেতে বসাল। মিঞাসাহেবের বেশী বয়সের বিবি। মধ্যঋতু আশ্বিনের মত ঢলোঢলো। টাবুটুবু গাঙের বুকে ধীরগতি ভাটার টান লেগেছে। প্রতিবেশীদের একরাশ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার সাজিয়ে বসে আছে। ব্যথাচাপা হাসি মুখে লেগে আছে সর্বক্ষণ! মেঘুর মুখে সব শুনে বলল, এর উপরে কথা নেই। সাহেব যা বলেছে, তাই করুক মেঘু। দৌলতেন্নিসার জন্য ভাবনা নেই, ধানী জমি আছে কিছু। গাছগাছালি আছে দু'চারটে। রাখালটা ভাল ছেলে। জীবন কেটে যাবে। মেঘু বেরিয়ে পড়ুক। তবে, খবরটা যেন দেয়। নইলে চাচী বড় ভাববে।

বাজারের ভেতরে বিপিনকে খুঁজে পেল মেঘু সেই মেয়েমানুষটির ঘরে। কারখানা বন্ধ। কাজ নেই। দু'মনী ময়দার ড্যালা নিয়ে মাখবে, তন্দুরের আগুনে পুড়বে। তবেই মেজাজ ঠিক থাকে। কাজের মানুষ, এখন সর্বক্ষণ নেশা করে পড়ে আছে। বোধ হয়, এই তার শেষ পড়ে থাকা। মেয়েটিকে খাওয়াতে পরাতে না পারলে ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে।

বিপিনকে সব কথা বলল মেঘু। শুনে বিপিন বলল, 'চলে যাও।'

মেঘু বলল, 'তুই যাবিনে বিপিনদা।'

বিপিন বলিল, 'আমি কোথায় যাব? তোমার গলায় ঝুলে থাকব না শুধু শুধু। এখানকার লোক মারে মারবে, রাখে রাখবে। এটা তো দেশ। এ জায়গা ছাড়তে হবে বলে নিজের দেশ চাটগাঁয়ে মন টেকেনি কোনদিন। তুমি যাও। গিয়ে কাজ কারবার আরম্ভ কর। হালচাল দেখ। তারপরে যেতে হয় যাব।' বলে দুজনে দাঁড়াল মুখোমুখি। টনটন করে উঠল বিপিনের বুকের মধ্যে। এতবড় চেহারাটা তার মনিবের। বাদার বাঘের মত গোঁফ। কিন্তু এত অসহায়। তারপর হঠাৎ ভয় করে উঠল বিপিনের। মনিব-গিন্নীর কথা মনে পড়ল। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। মেঘু খাঁটি মানুষ। পরিশ্রমীও বটে। কিন্তু সকলে মিলে ওর পেছনে লাগে যদি!

আর বিপিন যেতে চায়না শুনে, মেঘুর যে মুখের চেহারা হল, বিপিন তাতে

আরও ঘাবড়ে গেল। টাকা থাকলে শত্রু থাকে। ওর শত্রু অনেক। মনিবগিন্নী শত্রু না হোক, এক সংসার-ছাড়া মেয়ে। এ মানুষটিকে ডুবিয়ে দেওয়া তেমন শক্ত নয়। লালমিঞা বুঝত সেটা ভাল। সে মেঘুর হাত ধরে বলল, 'আমি যাব, তুমি ভেব না কত্তা। এখন যাব না। তুমি যাও। যেদিন তোমার ডাক আসবে, সেইদিনই চলে যাব।'

তবু মেঘুর মুখভাবের পরিবর্তন হল না। রাজ্যহারা ছদ্মবেশী রাজার মত সে এসে দাঁড়াল কারখানার সামনে। কারখানার ঢেউ খোলা টিনের বেড়ায় লেখা রয়েছে, মেঘনাদের রুটি বিস্কুটের কারখানা। নিচে, 'ঝুমির ঝুরি পাওয়া যায়। খাইতে মজা লাগে।' আরও নিচে, 'মেঘনাদের মালপোয়া, খাঁটি ছাড়া নয় ভুয়া।' তন্দুরে পোড়াবার কাঠ স্তূপীকৃত রয়েছে সামনেই, কালো অঙ্গারের ছাই জমেছে।

ফিরে এল মেঘু। তারপর চিঠি লেখালেখি চলল। দিনক্ষণ বাছাবাছি চলল।

এরই মধ্যে একদিন বাজার দিয়ে আসতে শুনল একটি কচি গলা। সেই কচি গলা দোকানীকে বলছে, 'চারপয়সার ঝুমির ঝুরি দেও না!'

মেঘু থম্‌কে দাঁড়াল। দোকানী তাকে দেখতে পায়নি। বলল, 'মেঘুসা'র বাড়ি যা। ওইখানে ঝুমির ঝুরি আছে কাড়ি কাড়ি। মেঘুসা'র বউ একবার আঁচল ঝাড়লেই হয়।'

বলে হেসে উঠল। মেঘু উঁকি দিয়ে দেখল, একটি ছোট মেয়ে। তাকে ডেকে নিয়ে এল গদীতে। মালখানায় মাল নেই। সব শূন্য। গদীতে থাকে কিছু নমুনার জন্য। সেই নমুনার জিনিসই কিছু পড়েছিল তখনো, সব উপুর করে সে ঢেলে দিল মেয়েটির পাঁচহাত শাড়ির আঁচলে। দিয়ে বলল,

'ঝুমির ঝুরি উঠে গেল! আর পাওয়া যাবে না, বুঝলি?'

মেয়েটি হতাশ গিন্নীর মত বলল, 'আমার ছোট ভাই যে তা হ'লে কাঁদবে খালি।' বলে নিজে বিস্কুটগুলি লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখে ঢোক গিলল।

মেঘনাদ বলল, 'কাঁদবে?' সে যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটার

দিকে। মেয়েটি ভাবল, লোকটা রাগ করেছে বুঝি। সে পেছন ফিরে, ভয়ে ভয়ে চলে গেল। জিভে জল এসে পড়েছে বেচারীর। তবু একটা মুখে দিতে পারল না।

মেঘনাদ অথর্ব, শক্তিহীন, বোবা। কোনও এক ছেলে কাঁদবে তার ঝুমির ঝুরির জন্য। যেন সে এক কি বিচিত্র ব্যাপার। অর্থ বুঝল না। অনুভব হল না যেন কথাটির মর্ম। তবু কোনও ছেলের ট্যা ট্যা করে কান্না বাজতে লাগল তার বুকে।

আর ঝুমি হাসতে লাগল খিল্‌খিল্ করে। লীলা লীলায়িত হয়ে উঠল নতুন ছন্দে ছন্দে। সে কিছু চেয়েছিল। নতুন কিছু। এই নিটোল ছন্দে বয়ে চলা ব্যবসা কারখানা ও গদী জীবনের ভাঙ্গন। মেঘনাদের জীবনে একটা আঘাত। ভয়ংকর আঘাত। সে আঘাতে গোঁ ধরে বয়ে চলা স্রোতের ধারা অন্যদিকে ছুটে যাবে। কিন্তু সে যে একেবারে এই পথে ছুটবে, সে ভাবেনি। নতুন প্রতিষ্ঠার কথা সে চিন্তা করে না। যাযাবরীর মত সে শুধু পথের মোড়ে নতুন জগত দেখতে চায়। নতুন নতুন জগতে সে হেসে বেড়াতে চায়। যেমন চায় ওই ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা।

কিন্তু তার গোছানো দেখলে হাসি পায়। সে এ ঘর থেকে ও ঘর করল ছুটে ছুটে। বোচকা পুঁটলি বাঁধল, ট্রাঙ্ক গোছাল, হেসে হেসে, গড়িয়ে গড়িয়ে। যেন তার মুক্তির ডাক এসেছে। আড়াল থেকে দেখল মেঘনাদকে। ভ্রূ তুলে, ঠোঁট বাঁকিয়ে ভাবল, হল তো? এবার ভূত নামবে ঘাড় থেকে। যেন সেই ভূত নামানোর জন্যই মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদ আসছে। কংগ্রেস আর লীগ দেশময় নেমেছে কোদাল কুড়োল হাতে। নয়া সেটেলমেণ্টের নতুন কানুনগো'এর দল।

লীলা জানে না, কার পরামর্শে, কোন্ পরামর্শে দেশত্যাগ করছে মেঘনাদ। সে শুধু জানে, দেশ ভাগাভাগি হবে। হিন্দু থাকবে একদেশে, আর একদেশে মুসলমান। সেইজন্য চলেছে তারা। এইবার তার স্বামী অবকাশ পাবে, লীলার দিকে ফিরে তাকাতে। পাবে নাকি?

কিন্তু ফিরে তাকাল না মেঘু। যে বস্তু থাকতে তাকাতে পারেনি, সেই বস্তু ধ্বংস হওয়ার দিনে সে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে।

দিন এল। নৌকা করে এল তারা ভাগ্যকুল জাহাজঘাটায়। সঙ্গে পৌঁছে দিতে এল বিপিন। স্টিমার থাকে প্রায় মধ্য নদীতে। নৌকায় করে উঠতে হয়। নৌকায় করে দোকানীরা পশরা নিয়ে যায় স্টিমারের গায়ে। কলা, রসগোল্লা, মোহনভোগ, বিস্কুট।

কে একজন টিন বাজিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে বাবু, আসেন, সিরাজদিঘার মেঘার মালপো। খেলে আর ভুলতে পারবেন না।'

স্টিমারে উঠতে গিয়ে থম্‌কে গেল মেঘনাদ। প্রথম চোখাচোখি হল বিপিনের সঙ্গে। বিপিনও তার দিকেই তাকিয়েছিল। দুজনেই তাকিয়ে দেখল সেই লোকটির দিকে। দেখল, মেঘার মালপো নয়, অন্য বিস্কুট। বিক্রী করছে ওই নাম দিয়ে।

হেসে উঠল লীলা। বিপিনকে বলল, 'ঝুমির ঝুরি অমুকে খায়, অমুকের মালপো দিল্লীতে যায়। কই হে হেড্‌ কারিগর, বলে দেও, মালপো এবার দিল্লী যাচ্ছে।'

অমুক অর্থাৎ মেঘনাদ। স্বামীর নাম নিতে তো পারে না। বলে বিপিনের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'তুলে দেও স্টিমারে।'

চকিতের জন্য বিপিনের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। তরঙ্গায়িত পদ্মা। কূল কিনারা নেই। নিরন্তর বর্ষা-বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে, পাক দিয়ে উঠছে ঘূর্ণা। টুক্‌ করে লীলাকে ফেলে দিলে, খানিকটা জল ছিট্‌কে উঠবে। তারপর সব শেষ।

মেঘনাদ উঠে গেল। লীলাকেও উঠিয়ে দিল বিপিন। লীলা হঠাৎ ফিক্‌ করে হেসে বলল, 'আমি সোনাদুলি চরের মেয়ে। গায়ে ব্যথা দিলে কি হবে। সাঁতরে ঠিক পারে উঠতে পারতাম। মনিবের পয়সা চুরি তো আর হবে না। মনিবের সুখ আর দেখতে হবে না। পার তো নিজে ডুবে মর।'

বিপিন ভীত বা লজ্জিত হল না একটুও। সে খালি দেখল মেঘনাদের দিকে। মেঘনাদ তাকিয়েছিল তীরের দিকে।

স্টিমার ছেড়ে গেল। সিরাজদিঘার লোক বলাবলি করল, মেঘনাদ অনেক জলের মাছ। মতলব করে সরে পড়ল আগে থাকতেই। বড় কিছু ফাঁদবে এবার। বিপিন মনে মনে বলল, তাই যেন হয়।

ঢাকা মেল থামল। স্টেশনের নাম শুনে চমকে উঠল মেঘনাদ। হকচকিয়ে উঠল লীলা। ঘুমচোখে দৌড়ুচ্ছে কুলিরা। অল্প কয়েকজন প্যাসেঞ্জার নামল। লীলার পায়ের কাছ থেকে চোখ রগড়ে উঠে পড়ল ছেলেটা। বলল, নামতে হবে। এই তো আপনাদের ইস্টিসন গো।

মেঘনাদের মনে হল, তার রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেছে। পাথরের মত ভারী আর শক্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। সেই পাথরের সামান্য এক ছিদ্র দিয়ে তীব্র ব্যথার বিষ-বাষ্প নির্গত হচ্ছে। গন্তব্য এসেছে। নামতে হবে। কিন্তু উঠতে পারছে না।

কুলি এল, মাল নামাল। ছেলেটাও ধরে ধরে প্ল্যাটফরমে জড়ো করল কিছু কিছু জিনিস। লীলা কাপড় গুছিয়ে ঘোমটা দিল। ঘোমটা খসল আবার। তারপর ধাক্কা দিল মেঘনাদের গায়ে। ঝামটা দিয়ে উঠল, 'কি ঢং হচ্ছে বসে বসে। নামতে হবে না?'

বলে মেঘনাদের হাত ধরে টানল। টানতে হল না। পাথর আপনি উঠে পড়ল। এখনো হাল্কা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নিশ্চল ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ দেখা যায় আকাশে। যেন ওরা এসেছে মেঘনাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধলেশ্বরীর ধার থেকে। এসে দাঁড়িয়েছে মাথার উপর। এখনো মিটমিট করছে নক্ষত্র। লাইট জ্বলছে স্টেশনে। পূবদিকটা ঘোলাটে সাদা দেখাচ্ছে।

দুটি লোক এসে দাঁড়াল তাদের কাছে। একজন হাফ প্যাণ্ট পরা, গায়ে মোটা ময়লা জীর্ণ খাকী হাফসার্ট। পায়ে মোটর-টায়ার কাটা স্যাণ্ডেল। ঝাকড়া ঝাকড়া কালো কোকড়ানো চুল। গায়ের রং কালো। মোটা মোটা শিরবহুল শক্ত হাত পা। সঙ্গের লোকটি অবাঙ্গালী। কদমছাট চুল, মাথায় বড় টিকি। পরনে নীল প্যাণ্ট, গায়ে ছেড়া গেঞ্জি। কিন্তু খালি পা।

তারপর পরস্পর চোখাচোখি করে আবার এদের দিকে তাকাল। লীলা ঠায় তাকিয়েছিল হাফ প্যাণ্ট পরা লোকটির দিকে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল।

'তুই বিজা না ?'

বিজা, অর্থাৎ বিজয়। সে অমনি হেসে উঠে বলল, 'হ্যাঁ। তুই তো দিদি। আমি শালা চিনতেই পারছিলাম না।'

শালা বলে একটু যেন সঙ্কুচিত হল বিজয়। ভাই বোন পরস্পরকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বিজয় তাকাল মেঘনাদের দিকে। জীবনে দু' একবার দেখেছে সে তার ভগ্নিপতিকে। তাইতেই আন্দাজ করে নিল। কিন্তু লোকটার মুখ দেখে হঠাৎ মুখ খুলতে সাহস হয় না। সাহস হয়, কিন্তু বলার কিছু নেই যেন। যেন একটা প্রকাণ্ড চেহারার গ্রাম্য চাষা ধুতি পাঞ্জাবী পরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্মিত বোকাটে চাউনি। খানিকটা গোঁয়ার ভাব।

লীলা বলল, 'তোর বোনাই, চিনতে পারিস্।'

বিজয় চুলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'খু-উব।'

লীলা আবার বলল, 'বাবা, মা, অন্তে, তিলি, সব ভাল আছে।'

বিজয় ঠোঁট উল্টে বলল, 'আর ভাল। দাদা মরে গেছে অনেকদিন, সে খবর তো পেয়েছিলি। আর অন্তে বান্‌চোত্‌—'

থেমে গেল বিজয়। গালাগালটা বোধহয় ঠিক হল না। কিন্তু মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে পড়ছে। অভ্যাসের ব্যাপার। বলল, 'অন্তে বাড়ি থাকে না। হপ্তা শেষে কিছু দেয়। বস্‌না (বসন্ত) কোথায় পালিয়ে গেছে, কেউ জানে না। তিলির তো বিয়ে হয়নি। বাবা তো সারাদিন পড়ে থাকে, মা ঝগড়া করে। আমি বিয়ে করেছি, তুই তো জানিস্।'

বিজয় বলে আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লীলার গায়ের গহনা দেখে। লীলা খুশী হয়েছে কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু কৌতূহল বেড়ে উঠল। সে আরো কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। বিজয় বলল, 'চল্‌। কথা পরে হবে। ছ'টা বাজে। আমাকে আবার কলে যেতে হবে।'

লীলা ভ্রূ কোঁচকাল, বলল, 'কল কি ?'

বিজয় বলল, 'কল- আবার কি ? চটকলে, মানে কারখানায়। হাজিরা দিতে হবে না ? বোন বোনাই বড়লোক হলে কি হবে। হাজিরাবাবু তো শালা ছাড়বে না।' বলে মেঘনাদের দিকে চেয়ে বিজয় হাসল। মেঘনাদ তার সেই রক্ত-চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বিজয়ের দিকে। হাসি নেই মুখে। শালাকে কোন কুশল জিজ্ঞাসা নেই। সেও দেখছে। যেন ভাববার চেষ্টা করছে, কোথায় এসেছে। কাদের কাছে এসেছে। সে যে তার সবই নিয়ে এসেছে। এখানে হাল ধরে পাল তুলে দিতে এসেছে তার সপ্তডিঙ্গার। তাছাড়া বিজয়কে সে প্রথম দেখেছিল অনেক ছোট। তখন অবিকল লীলার মতই দেখতে ছিল। মাথায় কালো কোকড়ানো পরচুলা পরিয়ে দিলেই একেবারে মিলে যেত হয় তো। অনেক বছর পর দেখা। আজ অনেক সংশয় ও শঙ্কা। অবিশ্বাসও যে নেই তা' নয়। বিশ্বাস করাটাই মেঘনাদের জীবনধর্ম। কিন্তু লীলা তার জীবনে বয়ে এনেছে এক বিরাট সংশয়। বিজয় লীলারই ভাই। আজ লীলারই লীলাক্ষেত্রে এসেছে সে নিজের লীলা ব্যক্ত করতে। এখানে তাকে মন পাততে হবে। ঘট পাততে হবে লক্ষ্মীঠাকরুনের। টাটে বসাতে হবে সিদ্ধিদাতা গণেশ। দেহ খাটাতে হবে। এই বয়সে আর একবার তাকে ভাসাতে হবে ডিঙ্গা। সে সাহস তার আছে। কিন্তু বিশ্বাস। জীবনে অনেক মার খেয়েছে সে। তবু অনেকের বিশ্বাস বন্ধুত্ব ছাড়া মানুষ কবে সামনে এগুতে পেরেছে। একলা নয়, দোকলা চাই। দোকলা নয়, অনেককে চাই।

তাই সে দেখছে বিজয়কে। চোয়াল উঁচনো খাটিয়ে মানুষ। জাহাজের খালাসীর মত দেখতে তার শালা। কলকাতা এখান থেকে কতদূর, কে জানে। কিন্তু বিজয়কে দূরের মানুষ মনে হল না যেন। অর্থাৎ শালা তার কলকাতার মানুষ হ'য়ে যায়নি। কথায় কথায় মুখখারাপ করা, সেটা তো মানুষ তার পরিবেশের মধ্যে রপ্ত করে। সংশয়ের মধ্যে, অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও মনটা একটু আশ্বস্ত হতে চাইছে। তবুও হাসতে পারল না সে। হাসে সে অল্পই। চওড়া বুকটার অন্তর্স্রোতে যখন ঢল নামে হাসির, তখনো মুখে তার কোন ঢেউ খেলে না।

লীলাও খুঁটিয়ে দেখল তার ভাইকে। কথাগুলি আর ঠিক সেই ধলেশ্বরী পারের সোনাচুলির চরের মত নেই। সেই সুর, সেই ভাষা। কেমন যেন অচেনা। এমন কি মানুষটাও। লুব্ধ তীব্র দৃষ্টি। ছন্নছাড়া, হতভাগ্য, স্টেশনের কুলি যেন তার ভাই। সিরাজদিঘার হাটে বাজারে মাঝে মাঝে এরকম লোক দেখা যেত। ভিন্‌দেশী লোক সব। হাট বাজারের কানাচ দিয়ে গাঁয়ে ঢুকে মেয়েদের চোখ ইশারা করত। তারা সব ঢাকা নারায়ণগঞ্জ শহরের ভবঘুরে বদমাইস্। কেমন চোয়াড়ে আর শহুরে। গায়ের জামাটাও ঠিক তেমনি। যেন তেলচিটে বালিশের ময়লা খেরো কাপড়। অনেক সময়, মেঘনাদের কর্মচারীদেও এরকম দেখতে হয়। বিজয়ের পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বলল, 'এটি কে রে?'

বিজয় বলল, 'আমার বন্ধু, চউথি। একসঙ্গে কাজ করি। তোদের জন্য কাল রাত থেকে আমরা দুজন স্টেশনে রয়েছি। মাইরী, আবার এই ভোরবেলা কাজ ··।'

চউথিও তাকিয়ে ছিল লীলার দিকে। চোয়াড়ে মুখ, বোচা নাক আর পাতলা গোঁফ। গায়ে এতগুলি সোনার গহনা দেখে সে একটু বেশী বিনীত হয়ে উঠেছে। সে নাক কুঁচকে হেসে, প্রায় সেল্যুট করার ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল, 'রাম রাম হো বড়ে বহিন্।

'ও মা। বলে কি রে।' ব'লে খিল খিল করে হেসে উঠল লীলা। সে হাসিতে, শহরতলীর এ রাতভোরের স্টেশনটা একটু চমকালো। চাওয়ালা এদিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠল, গরম চা··· ।

চউথি আর একবার হাসল। সে হাসিতে নাক কুঁচকে চোখ দুটো পর্যন্ত ঢেকে গেল। পাতলা এবড়োখেবড়ো গোঁফজোড়া কাঁপতে লাগল একটু একটু। রীতিমত একটা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার মত ভাব করে সে বলল, 'মানে, ইসকা মানে এহি হোতি হ্যায় কি—'

বিজয় বলল, 'থাক্। তোমাকে আর মানে বোঝাতে হবে না। ছ'টা বাজলো বলে। বাঁশী বাজলে আর রক্ষে নেই। এবার নে তো, মালগুলি তোল্। কই জামাইবাবু, আসুন।'

মেঘনাদ চমকে উঠল। হ্যাঁ, যেতে হবে। গাড়িটা চলে গেছে। যাত্রীশূন্য হয়ে যাচ্ছে স্টেশনটা। তাদের ঘিরে আছে কয়েকটা কুলি। যদিও কয়েকটা কুলির মাল নেই মোটেই। মাল কিছু নিয়েছে বিজয়, কিছু চউথি, সামান্য সেই ছেলেটা।

বিজয় ঘুরে বলল, 'আরে? মিস্টার চালিস্ সায়েব যে? তুই ওটা নিচ্ছিস কেন?'

লীলা ভ্রূ বাঁকিয়ে বলল, 'ওমা, তুই এটাকে চিনিস্ নাকি?'

বিজয় বলল, 'চিনিনে আবার? থেকে থেকে উনি যে উদয় হন আমাদের এদিকে।'

'বলিস কিরে। ওযে সেই জাহাজটা থেকে আমাদের সঙ্গে।'

'তাই তো আসে। কখনো গোয়ালন্দ, কখনো খুল্‌নে নয় তো বরশেল। বলে, চাকরি খুঁজতে এসেছি। নাম দেখছ না, বলে মিস্টার চালিস্। পাকা ফেরেববাজ ছেলে বাবা। আবার গান গায়, পেট বাজিয়ে ভিক্ষে করে।'

হেসে হেসে ঢলে ঢলে পড়ল লীলা। দুজন টিকেট কলেক্টর হাসল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। একটা কুলি বলল, 'রং মে হ্যায়।'

রং নয়। হাসিটা স্থান কাল পাত্র মানে না লীলার। কোনদিনই মানেনি। বিজয় বলল, 'এবার ছাড় তো বাবা মালটি। যাও, কেটে পড়।'

ছেলেটা একবার তাকাল মেঘনাদের দিকে। সেখানে সেই নীরব সিংহের মুখ। নেমেও যে মানুষ একটি কথা বলেনি। লীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চারটে পয়সা দিবেন না গো ঠাকরুন, মালটা পৌঁছে দিতাম।'

ভেংচে উঠল বিজয়, 'না কত্তা, যেতে পারেন আপনি। শালা খচ্চড়—'

চউথি বলল, 'টেটিয়া ছোকরা।'

মালটা ছিনিয়ে নিতে গেল বিজয়। আর চালিস্ তার হলদে চোখ দুটো ড্যাবা ড্যাবা করে তাকিয়ে রইল লীলার দিকে। অর্থাৎ, ছাড়তে বললেই ছেড়ে দেবে যেন।

লীলা বলল, 'চার পয়সায় কি হবে তোর?'

চালিস্ ঠোঁট উল্টে বলল, 'এই একটু চা—'

লীলা চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'তার পরে দেশে ফিরে যাবি আবার ?'

বিজয় বিস্মিত ও বিরক্ত হল। দিদি তার গল্প জুড়ে দিল এ ছেলেটার সঙ্গে ? শহর জায়গা তো চেনে না। তাই শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর।

চালিস্ তার জট-পরা চুলে একটা ঝাকানি দিয়ে বলল, 'কি আর করব ? কাজ কাম এট্টা পেলে—'

লীলা বলল, 'তোর গুনোহাটির বদরুদ্দিনের কারখানা তো উঠে গেছে।' চালিস্ চোরা চোখে বিজয়কে দেখে বলল, 'হ্যাঁ। এবার সিরাজদিঘায় চলে যাব।'

'কেন ?'

'মেঘুসা'র বড় কারখানায় কাজ করব। সা মশাই খুব ভাল লোক।'

লীলা হাসতে গিয়ে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেটার দিকে। না, কিছুই জানে না চালিস্। তারপর লীলা তাকাল মেঘনাদের দিকে। বিজয়ও তাকাল। চউথি কিছু ঠিক বুঝল না। সে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল চালিসের দিকে।

চালিস্ বলল, 'ও, নাম শোনোনি না ? মস্তবড় কারবারী, আমি চিনি কিনা। লালমিঞা তো তুকতাক্ জানত। এট্টা মন্তর দিয়েছিল মেঘুস'াকে। হিন্দু হলে কি হবে। সেই মন্তরেই মেঘুসা লাখপতি। মেঘুসা'র বউয়ের নাম ঝুমি, আমি জানি, সব্বাই জানে। ওই যে ঝুমির ঝুরি। খাননি ? শুনবেন এট্টা গান ? শোনেন তবে।

যে খাবে ঝুমির ঝুরি—
সে খাবে ঝুমির এক কুড়ি।'

গেয়ে বলল, 'ও বাবা এক কুড়ি বউ ? তখন—

ঝুমি চিবিয়ে খাবে কুড়মড়ি'

বলেই পেটে চাটি। সঙ্গে মাজা দোলানি আর দাঁতে দাঁতে কড়মড়ানি। এতক্ষণের নীরব দর্শক এক অবিশ্বাস্য নাটক জমিয়ে তুলল প্ল্যাটফরমের উপরে।

ঝুমি আড়ে আড়ে চেয়ে দেখল মেঘনাদকে। কুটিপাটি হল হেসে। বলে উঠল, 'মুখপোড়া, মরণ তোর। ওই এক কথা নিয়ে তুই পিছে পিছে ছুটে এসেছিস্ ?'

বিজয় আর চউথিও হাসতে লাগল।

মেঘনাদ ফিরে তাকিয়েছে। এই প্রথম সে ছেলেটার দিকে দু চোখ মেলে তাকাল। এই প্রথম তার বিষ-বাষ্পাচ্ছন্ন বুকে যেন হাওয়া লাগল একটু। থমকানো রক্ত ধারায় যেন দূরাগত কালিকাচ্ নাচের ঢাকের প্রথম গুড়গুড়ানি লাগল।

পরমুহূর্তেই লীলা খপ্ করে চালিসের হাত ধরে, চোখ পাকিয়ে বলল, 'এই ছোঁড়া মিছে কথা বললি যে ? তুই চিনিস সেই গদীর মালিককে ?'

চালিস্ অবলীলাক্রমে হেসে বলল, 'মেঘু সা'কে ? আজ্ঞে হাঁ গো ঠাকরুন, খুব চিনি। কালো মুস্কো চেহারা, গলায় চার ফেরতা তুলসী মালা। হাতে অষ্টমপোহর জপের থলে, কপালে তিলক…'

এবার হাসির দমকে আঁচল লুটিয়ে পড়ল লীলার। পাতা পাড়া চুল বাঁধা এলিয়ে পড়ল। খোলা বোতাম তেমনি। স্তনান্তরে সোনার হারটি কাঁপতে লাগল থর্ থর্ করে। বিরক্ত হলেও বিজয়ও চাপতে পারল না হাসি। হেসে বলল, 'শালা ফোরটুয়েন্টি।' চউথি হা করে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে দেখছে লীলার হাসি।

মেঘনাদের লাল চোখ দুটি বেরিয়ে এসেছে ভ্রূর তলা থেকে। মনে হল, আশা আছে। এখনো বুঝি আশা আছে। আবার ঝুমির ঝুরি, মেঘার মালপো। আবার কারখানা, গদী, হাসি-কথা উল্লাস। আবার, আবার! এইখানে বিদেশে, নতুন ক'রে এই সপ্তসিন্ধু পারে আবার ভেসে উঠবে তার সপ্তডিঙ্গা! আহা বিপিনদা'টা যদি আসত, তবে শুনতে পেত।

সে ডাকল, 'এই, এই—'

চালিস্ ফিরে তাকাল ভয়ে ভয়ে। বলল, 'আমাকে বলছেন বাবু?'

মেঘনাদ ঘাড় নেড়ে বলল, 'আয়।'

বলে সে এগিয়ে গেল। বিজয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ কটাক্ষে দেখল চালিস্‌কে। চউথি নির্বিকার।

লীলা চোখ কুঁচকে বিচিত্র ভঙ্গিতে পান খাওয়া বাসি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। মেঘনাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, ‘বড় মিঠে লাগছে ছোঁড়ারে, না?’

মুঠি পাকিয়ে ঘুষি দেখিয়ে বলল চালিস্‌কে, ‘চল্‌, গুতিয়ে খেদাব তোকে।’

বিজয় বলল চাপা গলায়, ‘হাঁকব শালাকে এয়সা—’

চালিস্‌ হাসল হা হা করে।

॥ নয়া পাড়ি ॥

ঘুংগুরের আর রোগা জোড়া ঘোড়ার ঠুকঠুক শব্দ ভোর জাগিয়ে চলেছে। শহরতলীর পীচ বাঁধানো সরু রাস্তা। এখনো লাইট জ্বলছে রাস্তায়। অনাগোনা শুরু হয়েছে লোকজনের। শিল্পাঞ্চল। অধিকাংশই কলকারখানার লোক।

গাড়ির ভেতরে দুই ভাই বোন আর ভগ্নিপতি। পেছনে, সহিসের জায়গায় দাঁড়িয়েছে চউথি। পাশে পা ঝুলিয়ে বসেছে চালিস্। যেন এই যাওয়াটা তার পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যাপার। নির্বিকার মুখে বসে আছে। গাড়ির গাড়োয়ান পেছনে ঝুঁকে পড়ে চউথির সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত। চউথিও ব্যস্ত বলতে। ঘোড়া চলেছে আপন মনে।

গাড়োয়ান বলল, চাপা গলায়, 'বিজয় মিস্তিরির বোন?'

চউথি ফিসফিস্ করে বলল, 'হাঁ, খুব বড়লোক। অঢেল সোনা, টাকাও অনেক। বহুৎ ভারী কারবারী বিজয়ের বোনাই।'

মেঘ যত গর্জে তত বর্ষে না। গাড়োয়ান মাথার উপর চাবুক ঘুরিয়ে শব্দ করল, মারল না। বলল, 'বোনাই খুব লেখাপড়া জানা লোক?'

লেখাপড়া? চউথি মনগড়া কথা যখন বলে, তখন আগে পাছে জ্ঞান থাকে না। বলল, 'ওরে বাপ্‌রে, খুব খুব। নইলে আর এত টাকা করেছে?'

ঃ তবে ওর বোনটা ওরকম কেন?

ঃ কি রকম?

ঃ খ্যাল্ খ্যাল্ করে হাসছিল আর বোনাইয়ের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছিল রাস্তায়। খুব খারাপ দেখাচ্ছিল।

চউথি এক মুহূর্ত নীরব রইল। হ্যাঁ, একটু বেশী বেশী লাগছিল চউথিরও। কিন্তু সেটা স্বীকার করা যায় না রতন গাড়োয়ানের কাছে। হলই বা চেনা

লোক। বিজয় তার বন্ধু। বন্ধুর বড় বোন। খারাপই যদি হয়, সেটা বলা ঠিক নয়। বলল, 'মানে থোড়া ব্যায়রাম আছে। মাথার ব্যায়রাম।'

এই মন্তব্যটিই জুত্‌সই মনে হল চউথির।

হায় হায়! বলে জিভ দিয়ে তু তু শব্দ করল গাড়োয়ান। সপাং করে এক ঘা কষাল ঘোড়ার পিঠে। খেঁখিয়ে উঠল, 'শালে তুমকো ভি শির মে বেমাড়ি পকাড় গয়া?'

গাড়ির ভেতরে কল্‌কল্ করছে বিজয় আর লীলা। গাড়ির দরজা খোলা। লীলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিজয় আঙুল দিয়ে দেখাল, 'এই যে জামাইবাবু, আমি এই চটকলে কাজ করি।'

মেঘনাদ উঁকি দিয়ে দেখল। ঝুঁকে পড়ে দেখল লীলা। সুদীর্ঘ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কারখানা। পাঁচিলের গায়ে গায়ে লাইট পোস্ট। এখনো আলো জ্বলছে। লাল আলো জ্বলছে চিমনিটার মাথায়।

লীলা বলে উঠল, 'মস্তবড় কারখানা তো। নারানগঞ্জের সুতাকলের মতই।'

বিজয় হেসে বলল, 'নারানগঞ্জের সুতাকল আর কী! তার চেয়ে বড় বড় কারখানা আছে।'

লীলা বলল, 'তুই কি কাজ করিস্ ওখানে? পাটের দড়ি বানাস্?'

বিজয় আবার হাসল। বলল, 'বিজয় মিস্তিরি দড়ি বানাবে?'

লীলা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। হেসে উঠে বিজয়ের হাঁটুতে চাপড় মেরে বলল, 'ওমা, তুই আবার মিস্তিরি নাকি? বিজয় মিস্তিরি? কি করিস্?'

বিজয় প্রথমে একটু চটে উঠল। এতে হাসবার কি আছে! যেন কোথাও একটা বিদ্রূপের হুল রয়েছে লীলার হাসিতে, কথাতে ও ভাবে ভঙ্গিতে। হতে পারে ছোট ভাই। কিন্তু সে কি সেই আগের বিজয়ই আছে। যার হাঁটুতে চাপড় মেরে স্নেহচ্ছলে বিদ্রূপ করা যায়। কিন্তু অনেকদিন বাদে দেখা। তা' ছাড়া, জীবনে দেখেছে কতটুকু লীলা। জানে কতটুকু। রাগটা সামলে নিল বিজয়। হয় তো দিদি আগের মতই আছে। বুঝতেই পারছে না, দশবছর ধরে

চটকলে কাজ করছে। সে বড় হয়েছে, চেহারা বদলে গেছে। সে আজ উইভিংএর মিস্তিরি। সে বিয়ে করেছে, তার একটা ছেলে হয়েছে।

সে বলল, 'কি আবার করব। মিস্তিরিরা যা করে। তাঁত মেশিন খারাপ হলে সারাই রিপেয়ার করি, এটা সেটা ফিট করি।'

ঠিক কি বললে যে বোঝানো যায় লীলাকে, আন্দাজ করতে পারে না বিজয়। বলল, 'এই আর কি, মিস্তিরির যা কাজ।'

লীলা চেয়ে চেয়ে দেখে বিজয়কে। হঠাৎ বলে উঠল, 'মাইরি তোর চেহারাটা কিরকম বদমাইসের মত হয়ে গেছে। এক নম্বর একেবারে। তোর মুখে এত ছাপকা ছাপকা দাগ কিসের?'

বিজয় রাগ করবে কি? হেসেই খুন।—'মাইরি, বদমাইসের মত না? আর বলিস্‌নে ভাই, শালা এমন ব্রণ গোটা হয়েছিল মুখে। 'আর কলমিলের কাজ, বুঝতেই পারছিস্। মুখের চামরা আর চকচকে থাকবে কি ক'রে। কি বলেন জামাইবাবু?'

মেঘনাদ হাসল কি না বোঝা গেল না। গোঁফ জোড়া সামান্য কাঁপল। বোধ হয় ঘাড়টাও একবার নড়ল। কিন্তু সে বাইরের দিকেই তাকিয়ে রইল। যেন সে এখন থেকেই জায়গাটার হালচাল বুঝে নিতে চাইছে।

লীলা আবার বলল, 'কত মাইনে পাস?'

'এই হপ্তা গেলে, গোটা আঠারো টাকা।'

'হপ্তায় হপ্তায় বুঝিন্?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ কুঁচকে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হেসে জিজ্ঞেস করল লীলা, 'মেয়ে মানুষেরাও কাজ করে পাটকলে?'

'তা করে।'

লীলা বলল, 'জোটেনি কেউ?'

বিজয় অবাক হেসে বলল, 'ভাগ, তোর যত ইয়ে কথা। শালা এমনিতেই

হয় না, আবার কলের মেয়েমানুষের পেছনে। তাদের কি ঘর সংসার নেই, না আমারও নেই ?'

বলে হঠাৎ হেসে উঠল বিজয়। বলল, 'এ্যাদ্দিন বাদে এলি, তুই কি আর কথা খুজে পেলিনে ? তুই যেন কি মাইরি !'

লীলা আড়চোখে একবার দেখল মেঘনাদকে। বলল, 'দেখছি তোকে চান্‌কে, বউতে মন বসেছে কি না। পুরুষমানুষ তো! পেরেক ঠুকলেও নৌকার কাঠ। দিব্যি ভেসে থাকিস্। তোর বউয়ের সুরৎ কেমন ?'

বিজয় বলল, 'ওই একরকম! রংটা কটা, দেখতে শুনতে তত খারাপ নয়। তবে একেবার গোবর হ্যাতা। রাখলে আছে, ফেলে দিলে যেন আপদ গেল। শালা ভয়ংকর ভাল মানুষ। অত ভাল আবার ভাল নয়।'

চাপা তীব্র গলায় হেসে বলল লীলা, 'সেই তো ভাল, ঠকানো সুবিধে আছে।' আবার হাসি। ভাই বোনের একত্র হাসিতে চমকে চমকে উঠছে শহরতলীর ভোরের রাস্তা। বাতিগুলি নিভে গিয়েছে। পথচারীরা সবাই ফিরে ফিরে দেখছে গাড়িটা। যেন বিলাস মত্ত মেয়েপুরুষেরা হুল্লোড় করতে করতে চলেছে।

গাড়ির গাড়োয়ান ভ্রূ তুলে ইশারা করল চউথিকে। অর্থাৎ এসবই পাগলামির লক্ষণ নাকি ? চউথি বড় বড় চোখে ঘাড় নাড়ল। মানে, হ্যাঁ। বুঝেছ ? আর চালিস্, গাড়ির পেছনে হেলান দিয়ে বসে আছে। অবাক চোখে চেয়ে থাকা পথচারীদের এক চোখ বুজে অকারণ ইশারা করছে। তুড়ি দিচ্ছে কখনো বা। নয় তো তাল ঠুকছে পেটে। কিন্তু পথচারীরা কেউই অবাক কিংবা বিরক্ত হচ্ছে না তার অঙ্গ ভঙ্গিতে। তারপর যখন গাড়ির ভিতর ভাইবোনের হাসিটা উচ্চরোলে উঠল বেজে, তখন হঠাৎ গান ধরে দিল।

'তোর হাসি দেখে পান জ্বলে সই
কেঁদে যে আর বাঁচবি না।'

বিজয় বলে উঠল গাড়ির ভিতর থেকেই, 'চুপ্ যা'বে চালিস্।'

চালিস্ চুপ। গাড়ি একটা গলির মধ্যে ঢুকল। সরু গলি, খোয়া উঠে উঁচু নিচু হয়ে গেছে। গাড়িটা হোঁচট খেতে খেতে দুলে দুলে চলল। এখনো

ভোরের আলো ভাল করে ঢোকেনি গলিটাতে। পশ্চিমা ভাষায় বেসুর গলায় কে রাম-ভজন গাইছে। গাড়োয়ান হেঁকে উঠল, হট্‌ যাও সামেনে সে।

একটা জলকলের সামনে ভিড় হয়েছে মেয়ে পুরুষদের। গাড়িটাকে গাল দিল তারা। আধো অন্ধকারে যাত্রীদের দিকে তাকাল ক্রুদ্ধ বিরক্ত চোখে। এ গলিতে আবার গাড়ি ?

বিজয় আর লীলা ঝুঁকে আছে বাইরের দিকে। আশ্চর্য! মেঘনাদ অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখছে বিজয়কে। বিজয়ের হাবভাব, কথা। বিজয়কে তার দরকার। একজনকে দরকার, যার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজে হাত দেবে এখানে। বিজয় ছাড়া আর কে আছে। কিন্তু পরামর্শ করার আগে, মানুষটাকে জানতে চায় সে। যাচাই করতে চায়। মেঘনাদ তো দেরি করতে পারবে না। অবশ্য এখনো এ ভাবনা তার মুখ্য হয়ে ওঠেনি। এ তার হৃদয় স্রোতের চোরা ধারা। এখনো মন জুড়ে আছে ষোল আনা গ্রাম, ঘর, গদী, কারখানা। মনজোড়া সেই ভাবনাতে অবশ হৃদয়। তাতে এই ক্ষীণ অন্তঃস্রোতের অনুভূতি এসেছে অন্যমনে। অন্যমনে সে দেখছে বিজয়কে। মনটা ভাল গাইছে। বিজয়কে তার ভালই লাগছে।

চউথি গাড়ি দাঁড় করাল বাড়ির কাছে। একটু পরিষ্কার হয়েছে গলিটার আকাশ। বিজয়দের বাড়িটার সামনে মস্তবড় একটা পিপুল গাছ। পিপুল গাছের তলায় খানিকটা খোলা জায়গা। ইটের দেয়াল আর টিনের দোচালা ঘর। আলকাত্‌রা লেপা টিন। গলিটার দু'পাশেই বাড়ি। এলোমেলো বাড়ি, অসংলগ্ন। অধিকাংশ টালি, টিন আর খোলা। মাঝে মাঝে পুরনো কোঠাবাড়ি। এ গলিটাতে সেগুলি বেমানান হয়নি। এক আধখানা নতুন বাড়িও আছে। এমন কি দোতলা তেতলাও আছে। কিন্তু তেমন কোন কৌলিন্য আয়ত্ব করতে পারেনি যেন। ফুল লতাপাতা কাটা বারান্দার রেলি। গনেশ আর নারায়ণের সিমেন্টের মূর্তি আছে দুটো বাড়ির ছাতের মাথায়। সবই মানিয়ে গেছে গলিটাতে।

বিজয় গাড়ি থেকে নেমেই হাঁক দিল, 'মা, দিদি এসেছে। ঠুমি ঝট্ করে চায়ের জল চাপা।'

টিনের দোতালা বাড়ি থেকে হুড়মুড় বেরিয়ে এল একরাশ লোক। চউথি আর চালিস্ জিনিসপত্র জড়ো করতে লাগল পিপুলতলায়।

প্রথমে ছুটে এল তিলি অর্থাৎ ঠুমি। তারপর মা সুকুমারি। সুকুমারির পেছনে বিজয়ের বউ ষোড়শী। লীলা আর মেঘনাদকে ঘিরে ধরল সবাই। সুকুমারি এসেই হাত ধরল লীলার।

এমন সময় কারখানার বাঁশী বেজে উঠল। বিজয় বলল, 'যাঃ শালা, চা আর খাওয়া হল না। চউথি, চল্ তাড়াতাড়ি।'

বলে সে আর চউথি ছুটে বেরিয়ে গেল। লীলা আর মেঘনাদকে নিয়ে বাড়ি ঢুকল সকলে। বিজয়ের বাবা নকুড় দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। সোনাছুলি চরের মুদী নকুড়সা'। খোঁচা খোঁচা সাদা চুল। মুখটা আরও ছোট হয়ে গেছে। যেন চামরা গুটিয়ে কুঁচকে একটুখানি হয়ে গেছে মুখটা। খাটো হয়ে গেছে অনেকখানি। মাড়িতে দাঁত নেই বোধহয় আর। গর্তে ঢোকা চোখ দুটো করুণ ক্লান্ত।

সে দুহাতে মেঘনাদের চওড়া একটা হাত জড়িয়ে ধরল, 'এস বাবা-জীবন, এস।'

নকুড়সা'র হাত ধরার মধ্যে কিছু ছিল। যেন ব্যর্থ জীবনে অনেক আশা পেয়েছে সে। যেন অনেকদিনের দাবদাহ জুড়োল। যেন এই হাতটি জড়িয়ে ধরার জন্য অনেকদিন থেকে এমনি দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশে। সোনাছুলির চর যেদিন ছেড়ে এসেছিল সে, সেইদিনও এমনি করে এসে দাঁড়িয়েছিল মেঘনাদের গদীতে। দেশ গাঁ ছেড়ে চললাম বাবা, বলে এমনি করে হাত ধরেছিল। মেঘনাদের কষ্ট হয়েছিল। অনুভূতিটা তেমন প্রবল ছিল না। লোকটার জীবনের কষ্ট জেনেও প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা তার মাথায় আসে নি।

আজ মেঘনাদ মার খেয়ে ছুটে এসেছে। আজ সামনে সবটাই অন্ধকার,

অস্পষ্ট। অনেক সংশয়, সন্দেহ। তবু সে অনুভব করল নকুড়সা'র ব্যথা। এক ব্যর্থ সওদাগর তার সামনে। লক্ষ্মী যাকে নিয়ে কোন খেলাও কোনদিন খেলেনি। চোখেই পরেনি। লালমিঞা চেষ্টা করেছিল। পারেনি। আজ মেঘনাদ নিজেও অন্ধ-রাত্রের মাঝি। কোন্‌দিকে পাড়ি দেবে, কোন্ পাড়ে ভিড়বে সে জানে না। তবু বুকের মধ্যে টন্‌টন্ ক'রে উঠল তার। শুধু তাই নয়। নকুড়সা'কে দেখে অকূল-পাড়ি মনে এক বিন্দু সান্ত্বনা পেল।

কিন্তু প্রণাম করার কথা মনে হল না মেঘুর। সাহা ঘরে লৌকিকতা আচার বিচারের তো অভাব নেই। তবে প্রণাম করতে তেমন শেখেনি মেঘনাদ। বোধহয়, এই জীবনে নকুড়সা'ও সেসব ভুলে গেছে। মেঘু অবাক হয়ে দেখল, লীলা বাবা মাকে প্রণাম করছে। মেঘু পারল না।

তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কান্নায় সবাই চমকে উঠল। দেখা গেল, সুকুমারি লীলাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। লীলাও কাঁদছে। মায়ে ঝিয়ের এই কান্নায় এক বিষন্ন স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। দুজনে গলা জড়াজড়ি কাঁদতে লাগল তারা। তিলিও চোখে আঁচল দিয়ে কাছে বসল। ষোড়শী কোলে ছেলে নিয়ে ছল্‌ছল্ চোখে বসল কাছে। তার ছল্‌ছল্ চোখ দুটি খালি লীলার সারা গা'টি দেখছে।

নকুড়সা' কাঁদতে পারল না। কান্নার চেয়েও করুণ মুখে নীরবে বসে রইল। মেঘনাদ লীলাকে দেখছে। এমন ক'রে ঝুমিকে কখনো কাঁদতে দেখেনি সে। এমন করে, মায়ের বুকে পড়ে। মায়ের ছোট মেয়েটির মত। ঝুমির কান্না! সে অশ্রু যেন এ্যাসিডের মত খার পদার্থ ছিল! তার কান্না মেঘনাদের জীবনে দুর্ঘটনা আর দুর্বিসহ যন্ত্রণাই বয়ে নিয়ে এসেছে। কান্নাটা তার চরম ক্রোধের ও বিদ্বেষের লক্ষণ ছিল।

আজ ঝুমি কাঁদছে। কী বিচিত্র কান্না। কী সুন্দর। কত বেদনাদায়ক। ঝুমিকে এমন ক'রে কাঁদতে দেখে বুকের মধ্যে টন্ টন্ ক'রে উঠল মেঘুর। তার ঝুমি, তার-ই। সে এমন ক'রে কাঁদলে যে তার সহ্য না। তার আদর করতে ইচ্ছে করে। বুকে নিয়ে, থামাতে ইচ্ছে করে কান্না। হঠাৎ এই মুহূর্তে মনে

হয়, সত্যি, লক্ষ্মীমতী ঝুমি। তার ঝুমির ঝুরি তাকে অনেক দিয়েছে। আবার সে কিছু করবে। এবার আদর করে নাম দেবে, ঝুম্ কুড়কুড়। একেবারে নতুন জিনিস। এমন কেউ কখনো খায়নি।

নীরব নয়, সরব কান্না। শুধু কান্না নয়। কথা-কান্না। সুকুমারি কেঁদে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে চলেছে অনেকগুলি বছরের কথা। কেমন করে মারা গেল হেমন্ত। সুকুমারির বড় ছেলে হেমা। এই জীবন, শহরতলীর এ ভাঙ্গা ঘরে অষ্টপ্রহরের দরিদ্র জীবন! বসন্ত, অর্থাৎ বস্‌না, তিলির ছোট। সে বেরিয়ে গেছে। কেন, কে জানে। ঘরে ভাল লাগে না। প্যাণ্ট্ পরে, সার্ট গায় দেয়, 'ছিরগেট্' খায়, শিস্ দেয়। একেবারে খারাপ হয়ে গেছে সে। আর তিলি, গলার কাঁটা। সোনাতুলির সা'ঘরের মেয়ে। দশ বিউনী মাগীর সমান হল। বিয়ে হচ্ছে না, টাকা নেই। বিজার বউ, যশোরের মেয়ে। তবু বিজা-ই যা একটু এ পোড়া সংসারের সান্ত্বনা। তারপর ঝুমি! আহা, মায়ের ভাগ্যবতী মেয়ে! কতদিন বাদে দেখা। আর যে কোনদিন দেখা হবে, এমনি করে পাওয়া যাবে বুকে, সে আশা ছিল না।

যত কথা, তত কান্না। জীবনের যত শোক, সব বাধামুক্ত হয়ে হা হা করে বেরিয়ে পড়েছে। লীলারও মনে পড়েছে দাদার কথা। হেমন্ত। চোখে দেখা হল না আর। সে যে পোড়ারমুখী, পাপিষ্ঠা। ভগবান দেখতে দেয়নি। আর কতদিন পর দেখা। তারও বুকের মধ্যে কম উথালিপাথালি করেছে!

ঘর ভরে গেছে লোকে। এ বাড়ির আরও তুই ভাড়াটেরা এসেছে, পাড়ার লোক এসেছে কিছু কিছু। বিজয় মিস্তিরির পরিচয়েই সবাই পরিচিত। মিস্তিরির বোন-বোনাই এসেছে। তু'তিনজন হিন্দুস্থানী মেয়েও এসেছে। প্রতিবেশিনী তারা। কান্না দেখে সবাই গম্ভীর, কিন্তু কৌতূহলিত। সবাই দেখছে লীলার গায়ের গহনা, আর প্রকাণ্ড মানুষ মেঘনাদকে। একটু চাষাড়ে. কিন্তু একটা দশাশাহী মানুষ বটে। গোঁফ কী, হ্যাঁ, বিজয় মিস্তিরির ভগ্নিপতি একটা মানুষের মত। দেখলে ভয় করে। লীলার কালো রূপে সবাই মুগ্ধ।

সকলেই যে খুশী আর মুগ্ধ, তা নয়। ওর মধ্যেই কেউ কেউ ঠোঁট বেঁকাল। চোখ কুঁচকে চলে গেল। কান্নার পর সামান্য পরিচয়ের পালা। হ্যাঁ, এই সুকুমারির বড় মেয়ে। না, অভাগীর ছেলেপুলে নেই, একটি যা-ও বা হয়েছিল, মারা গেছে। মা ষষ্ঠীর কৃপা নেই। কেউ বলল, সে-ই ভালো, বেঁচে গেছে। কেউ বলল, আহা! অমন লক্ষ্মীমন্ত বাপমা।

চালিস্ ততক্ষণে মালপত্র সব তুলে ফেলেছে ঘরে। তুলে পিপুলতলায় বসেছে গালে হাত দিয়ে, তাকিয়ে দেখছে ঘরের দিকেই। ঘরের সবাই কাঁদছে। তার মায়ের কথা মনে পড়ছে। হয় তো মা এখন কোথাও কোন বিলে অথবা জলায় নেমেছে! কলমি শাক ছিঁড়ছে কিম্বা ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে কুঁচো মাছ ধরার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে হয় তো তার ন্যাংটো ভাই-বোনগুলি। তার বেগম মা। অর্থাৎ মায়ের নাম জোহরা বেগম। রহমনের কথা তাদের হয় তো মনেই পড়ছে না এখন। রহমন, অর্থাৎ চালিস্ নিজেই।

ঘরের ভিতরে সুকুমারিই প্রথম কান্না থামাল। বলল, 'তিলি, দ্যাখগে যা, চুলো ধরল কি না। চায়ের জল চাপাগে। বিজাটা খেয়ে যেতে পারল না।'

তিলি বলল, 'বউকে যেতে বল মা।'

বউ তখনো হাঁ করে তাকিয়েছিল লীলার দিকে। আড়চোখে দেখছিল মেঘনাদকে। তার কোলে শোয়া ছেলেটাও আঙ্গুল চুষতে চুষতে লীলাকেই দেখছিল।

সুকুমারি বলল, 'কই গো বউ, ওঠ ওঠ ওঠ, হাঁ করে দেখছ কি?'

উঠতে যাচ্ছিল ষোড়শী, হাত চেপে ধরল লীলা। বলল, 'ওমা, বিজাটা কি পাজী গো মা। বলল, বউটা যেন গোবর ন্যাতা। কেমন দিব্যি টস্‌টস্ করছে। বিজাটাই বরং ভূত। কি বলিস্ লো বউ। আমি কিন্তু তোকে তুমি টুমি বলতে পারব না, আগেই বলে রাখছি। বড় কড়া ননদ, বুঝলি?'

ব'লে আরো কাছে টানল। ষোড়শী একটু হাসল। হাসিটি কেমন করুণ। সুকুমারি বলল, 'সে তুই যা-ই বল্‌না, তাতে কি। তোর কত ছোট, তিলির বয়সীই হবে। তবে বড় কাজে কুড়ে।'

লীলা বলল, 'তাই নাকি লো?' ব'লে সকলের সামনেই মেঘুকে দেখিয়ে বললে, 'তোর নন্দাইকে দেখেছিস্?'

সুকুমারির অভিযোগে কোন বিকার ঘটল না ষোড়শীর মুখের। তেমনি হেসে একটু ঘোমটা টেনে দিল। মেঘুর সবটাই ভাল লাগছিল, ঝুমির গালে তখনো জলের দাগ। কান্না ফোলা চোখ।

লীলা খুঁটিয়ে দেখলে ষোড়শীকে। ফর্সা রং কিন্তু অবহেলায় বেশ খানিকটা বিবর্ণ। মাথায় চুলও অনেক, বাঁধে না, জট পাকাচ্ছে চুলে। নাকের নাক-ছাবিটি ছাড়া এক চিমটি সোনাও গায়ে নেই, কাঁচের চুড়ি আর শাঁখা।

লীলা বলল, 'হ্যাঁ মা, বউটাকে কি ওর বাপ মা একটু সোনাও দেয়নি?'

জবাব দিল তিলি, 'দিয়েছিল, হার, চুড়ি, দুল, রুলি। সব বিক্রী হয়ে গেছে।'

নকুড় সা'র নাক দিয়ে কয়েকটা শব্দ বেরুল। সুকুমারি গম্ভীর মুখে বল্‌ল, 'যা রাক্ষুসে পেট এই সংসারের।'

নকুড় বলল, নিজের কপাল দেখিয়ে, 'এই কপালখানি তো সঙ্গেই রয়েছে। এ পাপ ধুলে যায় না, চাচলে যায় না, বরাত।'

মেঘুর মন বলল, থাক না এসব কথা এখন। তা-ই থাকল, লীলা আর ও প্রসঙ্গে গেল না। ছেলেটাকে তুলে নিল নিজের কোলে, বলল, 'বাবা।'

নকুড় বলল, 'কি রে!'

'বিজার ছেলে কিন্তু তোমার বংশের রং বদলে দিল। ছেলে তো বেশ ফর্সা হয়েছে।'

নকুড় বলল, 'হ্যাঁ, বদলে দিয়েছে মা। তবে ফর্সা রং কালো হতে কতক্ষণ বল্। বরাতের কালি না ঘুচলে সবই কালো।'

ছেলেটা চীৎকার জুড়ে দিল। লীলা তাকে তুলে দিল ষোড়শীর কোলে। ষোড়শী চলে গেল শ্বাশুড়ির সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের ভিড়ও ইতিমধ্যে পাতলা হয়েছে অনেকখানি।

লীলা ফিরল তিলির দিকে। বলল, 'কি লো, তুই তো একটা ধুম্‌সী মাগী হয়ে গেছিস।' তিলি লীলার সঙ্গে কথা বলার জন্যই বসেছিল। তিলির আর

এক নাম ঠুমি, ঝুমির সঙ্গে সাট মিলিয়ে ঠুমি রাখা হয়েছে। গম্ভীর হেসে বলল, 'তা' কি করব বল ?'

ঠুমির হাসিটা রীতিমত গম্ভীর শুধু নয়, মানুষটাই যেন রীতিমত ভারী। ঝুমির মত ঘন কালো নয়। তবে কালোই। শক্ত বলিষ্ঠ দেহ। ঝুমির মত একহারা নয়, দোহারা। সেজন্য স্ফীতিটা নজরে পড়ে একটু বেশী। ঝুমি ইচ্ছে করলে, তার দেহের তীক্ষ্ণতা খাপে মুড়ে আড়াল করতে পারে। তিলি পারে না। শরীরের বাঁকা রেখাগুলি তার বেশী উচ্ছ্বসিত। দৃষ্টি খোঁচা খায়। লহমায় নজরে পড়ে। ঝুমির বাড়াবাড়ি নেই। সুষ্ঠু অথচ এ বয়সেও তীব্র।

ঝুমি বলল, 'এখনো বিয়ে হ'ল না তো কবে হবে ?'

তিলি হেসে উঠল। বলল, 'তার আমি কি জানি।' ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'না হলে কি করব বল্।' বলে নিঃশব্দে হাসল ভ্রূ নামিয়ে। বোধহয়, হঠাৎ লজ্জা পেয়েছে বলে ফেলে। ঝুমি চকিতে একবার দেখে নিল মেঘুকে। মেঘু শ্বশুরের সঙ্গে দেশের কথা বলছে। বলতে বলতে ঝুমির দিকে চোখ ঘুরছে তার। তিলির দিকেও। তার বাড়িতে লোক ছিল না। ছিল শুধু ঝুমি। সে ঝুমি আলাদা। বাড়ির বাইরেই যে সারাদিন গোলক ধাম আর তাস খেলেছে। অথচ বাড়ি ভরা মানুষ, তাদের হাসি কথা, এসবে তো বিতৃষ্ণা ছিল না মেঘুর। ঘর ভরতি থাকবে, সে নিজে থাকবে গদীতে কারখানায়। সেখানেও ভরা ভরতি। সর্বত্র শুধু ভরা। আত্মীয় সজন কারিগর কর্মচারী, সব কিছুতে ভরা। অনেক সংশয় সন্দেহের মধ্যেও, অনেক লোকের মাঝে ভাল লাগছে তার। মা বাপ ভাই বোনের মাঝখানে ঝুমিকেও অন্যরকম লাগছে।

তিলি বলল, 'চল্ দিদি, তোদের ঘরে যাই।'

লীলা বলল, 'আমাদের আবার ঘর কোথায় ?'

'তোদের জন্য একটা ঘর নেওয়া হয়েছে, এঘরের পাশেই। খালি ছিল। পাঁচ টাকা ভাড়া।'

দুজনে তারা সেই ঘরে এল। ছোট্ট অন্ধকার ঘর। মাটি দিয়ে ইঁটের গাঁথুনি দেওয়াল। চলা ফেরা করার জায়গাও নেই। দোচালা টিনের শেড

যেখানে ঢালু হয়ে নেমে শেষ হয়েছে, সেখানেই এ চতুষ্কোন খুপরিটা রয়েছে। চালাটা মাথায় ঠোকে প্রায়। লীলা বলল, 'ওমা, এর ভাড়া পাঁচ টাকা! তোর বোনাই তো ঢুকতেই পারবে না। অসুরের মত চেহারা—।'

চমকে উঠল তিলি। স্বামীকে অসুর বলছে তার দিদি! বলল, 'অসুর বলছিস্ যে?'

লীলা বলল, 'সেই রকমইত দেখতে, দেখলিনে?'

অবাক হলেও তিলি ভাবল, হয় তো ওইটুকু তার দিদির প্রেমের খুন্‌সুটি। বলল, 'তোকে খুব ভালবাসে, না?'

'কে? তোর বোনাই? মরন! মুখে আগুন ভালবাসার! সারা দিন রাত্রি তো ময়দার ড্যালা নিয়ে পড়ে থাকে। মেয়েমানুষের কিছু বোঝে না ও।'

তিলি বলল, 'যাঃ, তুই যেন মাইরি কি!'

'তুই একবার চানকে দেখ্ তা' হলে?'

'ও মা গো!' মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠল তিলি। তারপর বলল, 'আমার তো দেখেই ভয় করে। কিন্তু তোকে কেমন করে দেখছিল বেচারী।'

লীলা বলল, 'ওই রকম দেখে।' বলে আচমকা নিশ্বাস ফেলল একটা। তিলি বলল, 'কতদিন বাদে তোকে দেখলাম দিদি। মাইরী, মনেই হত না যে আবার কোনদিন দেখা হবে। খালি শুনতাম, তুই খুব বড়লোক, মেলা টাকা তোর।'

লীলা বলল, 'আমার আবার টাকা কিসের। টাকা তোর বোনাইয়ের।'

'তোর নয় বুঝি?'

লীলা ঠোঁট উল্টে বলল, 'চাইনে। ময়দার ড্যালা বেচা টাকা দিয়ে তোর বোনাই পাহাড় তুলুক, আমার কি?'

তিলি অবাক হল। দিদির গলায় যেন আগুণের আঁচ। তীব্র অসন্তোষ। কিন্তু কেন? সবাই বলে, মেঘু ভাল মানুষ। খাঁটি মানুষ। আর এত গহনা দিদির গায়ে। গহনা শাড়ি। হোক টিন বেড়ার বাড়ি। তবু চারঘরওয়ালা বাড়ি। চাকর, রাখাল, গোয়াল গরু। তবে? হ্যাঁ, তবে মেয়েমানুষের তো

সর্বনাশের কত দিক খোলা রয়েছে। কতদিক। সেইদিকে বোনাই ঠকায়নি তো? কিন্তু বোনাইকে দেখে তো তা মনে হয় না। আর কোথাও কিছু করবে, এমন মানুষ বোধ হয় নয়।

তিলি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। সংসারের কথা বলল। বউকে মা শুধু শুধু লাঞ্ছনা করে। কেন কে জানে। বউটা কিন্তু ভালমানুষ। সাতে পাঁচে থাকে না। অনেকসময় সোনাদা রাগ করে। সোনাদা হল বিজয়। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু কোনদিন বউ নিয়ে যদি সরে পড়ে, তবে কি হবে। সবাই যে না খেয়ে মরবে। মা বোঝে না। তিলির উপর কথা বলতে এলে সে শুনিয়ে দেয়। তাঁর সঙ্গে পারে না। যত দোষ বউটার। অবশ্য একটু গোবেচারী, ঘুমকাতুরে, কেমন যেন বিমর্ষ সর্বক্ষণ! প্রথম এরকম ছিল না। এখনই হয়েছে। অনন্ত থাকে কাছে পিঠেই। জুয়া খেলে, মদ ভাং খায়। শোনা গেছে, একটা মেয়েমানুষও আছে তার। হপ্তা শেষে বাবা যায়, গিয়ে টাকা চেয়ে নিয়ে আসে। ইচ্ছে হলে দেয়, নয় তো নয়। বস্‌না তো ভেগেই গেছে। কেন জানে না, বস্‌নাকে নাকি তিলির ভালই লাগে। সংসারের সাতে পাঁচে ভাল লাগেনি তাই সরে পড়েছে। এবার গেছে অনেকদিন হল। আবার আসবে নিশ্চয়ই। দিদি এসেছে শুনলে একবার আসবেই। দিদির কথা সে বলত প্রায়ই।

হঠাৎ গলা চেপে ফিস্‌ফিস্ করে বললে তিলি, 'জানিস্, বাবারও গুন্ কম নয়। গাঁজা ধরেছে বুড়ো বয়সে।

সুকুমারি চেঁচিয়ে বলল, 'ঠুমি, মেঘু আর ঝুমিকে জল দে, হাত মুখ ধু'ক। দোকান থেকে মুড়িটুড়ি যা হোক এনে দে।'

লীলা বলল, 'তুই দোকানে যাস্।'

তিলি বলল, 'কে আর যাবে? পাড়ার মধ্যেই দোকান, জানাশোনা সকলেই।'

লীলা অপাঙ্গে একবার তিলিকে দেখে বলল, 'অনেক বড় তো হলি। কারুর সঙ্গে.........'

দিদির গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল তিলি, 'তুই কি অসভ্য মাইরি।'

'অসভ্য কেন, বল্ না?'

তিলি একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'ভেসে যেতে আর কি আছে, বল্ না। পাড়ে উঠতে হবে তো? তোর না হয় মেঘনাদ দাস জুটেছে। ভাসতে পারি, তুলবে কে? ভাসিয়ে নিতে তো অনেকেই আছে।'

বলে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। লীলা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল তিলির দিকে। যেন বিশ্বাস হয়নি তার পুরোপুরি। ভাসিয়ে নিতে যখন অনেকে আছে তখন নিশ্চয়ই অনেকের সঙ্গে ভাবও হয়েছে। তিলি বলতে চায় না তাকে। সে তিলির দিকে চেয়ে আঙুলের কড় গোণে আর বিড়্‌বিড়্ করে।

তিলি বলল, 'ওকিরে দিদি? কি করছিস্ কি?'

লীলা বলল, 'তোর বয়স হিসেব করছি।'

তিলি আবার হেসে উঠল খিল্‌খিল্ করে। 'দূর দূর। তুই একেবারে মুখ-পুড়ি। হিসেব করতে হবে না চব্বিশ পার হয়ে গেছি গত জষ্টি মাসেই।'

লীলা বলল, 'হ্যাঁ, তাই হবে। তুই আমার চেয়ে প্রায় ছ'বছরের ছোট।'

তিলি বলল, 'তা কি বলবি এবার বল্।'

লীলা বলল, 'কি আবার। বয়স হয়েছে, চাপতে শিখেছিস্। সহজে কি আর বলবি।'

তিলি বলল ঘাড় দুলিয়ে, 'চাপবো কেন। দশগণ্ডা লোক জুটিয়েছি, হল তো? এবার চল্, আমার সঙ্গে দোকানে যাবি?'

যেতে আপত্তি নেই লীলার। বাইরে যেতে আপত্তি তার কবেই বা ছিল। আজ নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ। বলল, 'চল্, তোদের দোকানপাট দেখেই আসি।'

তিলি বলল, 'তুই আবার বউ মানুষ। লজ্জা করবে না তো?'

লীলা বলল, 'বউ হয়ে লজ্জা করিনি। বাপের বাড়ি মেয়ে এসে লজ্জা পাবে?'

হাসতে হাসতে দু'বোনে বেরিয়ে গেল। রাস্তাটার নাম, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। রোড না হয়ে লেন হলেই যেন শোভা পেত। তা' ছাড়া এখানকার

পৌরসভা কেন যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা দেখাতে গেল, অনুমান করা মুশকিল। বোধ হয়, এটা প্রফুল্লচন্দ্রের ভাগ্য। পৌর কর্তাদের গৌরববোধ।

ইতিমধ্যে খানিকটা বেলা হ'য়েছে। রোদ উঠেছে আকাশে। আকাশের এদিকে ওদিকে মেঘও ছড়িয়ে আছে।

ঝুমি ঠুমি দুই বোনকে রাস্তায় দেখে অনেকে উঁকি ঝুঁকি দিল। মেয়েরাই বিশেষ করে। কয়েকটি ছোট মেয়ে তো সঙ্গে সঙ্গেই চলল। একটি বউ চেঁচিয়ে জিগেস করল, 'ও ঠুমিদি, কোথা যাচ্ছগো দুই বোনে?'

তিলি বলল, 'দোকানে।' বলেই দু বোন হেসে উঠল খিলখিল করে। অকারণ হাসি। এ দেখে, ও দেখে। পথ চলতে চলতে আবার ফিরে ফিরে দেখে কেউ কেউ। কে? বিজয় মিস্তিরর বোনেরা? কেউ বলল, খাসা! কেউ বলল মনে মনে, নচ্ছার।

দোকানদার অমৃত। লোকে বলে অমর্ত মুদী। যশুরে মানুষ। কুণ্ডুকুলের শিরোমণি, জাত বৈষ্ণব। বিজয়ের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোক। সে সুবাদে ঘনিষ্টতা আছে। কপালে বুকে ডানায় রসকলি আঁকা। গলায় চার ফেরতা কণ্ঠি। নাভির নিচে কাপড়। কোমর ভরে কালো দাগ। অবসর সময়ে ওই-খানে চুলকনো অমৃতর বিলাস।

দুই বোনকে দেখেই অমৃত একেবারে অবৈষ্ণোবচিত লাফ দিয়ে উঠল। আপ্যায়নটা অবশ্য বৈষ্ণবোচিতই হল। বাকী খদ্দের যারা ছিল তাদের ফেলে বলে উঠল, 'কে, তিলুদিদি? সঙ্গে নিশ্চয়ই বড়দিদি। কী ভাগ্যি! শুনেছি এঁয়ারা এসেছেন। আসেন আসেন, বসেন।'

লীলা তিলি, দুজনেই হেসে উঠল। তিলি ফিস্‌ফিস্ করে বলল লীলাকে, 'যে দশগণ্ডা জুটিয়েছি, এটি তার একটি।' বলেই আবার দুজনে হাসি।

তিলি মুখ ফুটে বলল, 'বসব না অমর্তদা। আধসের মুড়ি দাও।'

আধসের? এত মুড়ি খাবে কে? কিন্তু অমৃত কিছু বলল না সে বিষয়। তার তেলচিটে বেঞ্চিটা দেখিয়ে বলল, 'বস, বস। আসোই তো না আজকাল।

আজ বড়দিদি এসেছেন, তা-ই। খালি তো মুদী নই, বিজয়দা'র শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোকও তো বটে। কি বলেন বড়দি!'

বলে এমন করে লীলার দিকে তাকাল যে, লীলা হেসে লুটিয়ে পড়ল তিলির গায়ে। অন্যান্য খদ্দেরদের মধ্যেও হাসিটা ছড়াতে লাগল। দু' একজন বিরক্ত হল। তিলিকে অনেকেই চেনে। লীলাকেই দেখছে সবাই আজ। লীলার অলঙ্কার দেখছে বড় বড় চোখে।

অমৃত বলল, 'বস, দুটো মিষ্টি আনাই।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল তিলি। বলল, 'মুড়ি দেবে, না চলে যাব? মিষ্টি খাওয়ার সময় নেই এখন।'

তিলির এ গাম্ভীর্যকে বড় ভয় অমৃতর। যেন দুরন্ত দামড়া বাছুরটি ধরবার জন্য দড়ি নিয়ে এদিক ওদিক করা। টপ্ করে ফাঁসটি গলিয়ে দিয়ে বাঁধা। কিন্তু ধরে বাঁধা যায় না কিছুতেই। দামড়া বাছুর তো নয়, তিলি যে সেয়ানা বক্না। হতাশ হয়ে যেন সাময়িকভাবে দড়িটা কোমরে বাঁধল অমৃত। হেঁ হেঁ করে বলল, 'দিচ্ছি গো দিচ্ছি, রাধেকৃষ্ণ। দেখেন বড়দি একলা থাকি, হাত পুড়িয়ে রেঁধে বেড়ে খাই। আর এই কল মিল জায়গা। চোদ্দ পুরুষ অনাচার না করলে, এ জায়গায় কোন শালা আসে না। তা' একটু…'

তিলি বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি আর পনর পুরুষে অনাচার কর না অমর্তদা।'

কে একজন বলে উঠল, 'যা বলেছ তিলুদি।'

দুই বোনই তাকাল। এ পাড়ার বিষ্টু। কাজ নেই লোকটার। সংসারেও কেউ নেই। ভবঘুরের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। মাথা ভরতি চুল। মুখটা দেখলে বোঝা যায় বেশ সুপুরুষ দেখতে ছিল। রীতিমত শক্ত সমর্থ লম্বা চওড়া মানুষ। এখন আর মাংস নেই, শুধু হাড়। হাড়গুলিও এত মোটা যে, ওকে রোগা মনে হয় না কখনো।

অমৃত ভেংচে উঠল, 'যা বলেছ তিলুদি। সাত সক্কালে ধার চাইতে এসে আবার ফোড়ন কাটা কেন? যাও, কিছু পাবে না।

বিষ্টু বলল উদাসীন শ্লেষ ভরা গলায়, 'খচে গেলে দাদা ?

সেদিকে কান না দিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে অমৃত বলল, 'তা হ্যাঁ বড়দি, দেশের হালচাল কেমন দেখে শুনে এলেন। ভাগাভাগি নির্ঘাৎ, না ?

অমৃতকে দেখে অবধি লীলার হাসি সম্বরন হচ্ছে না। বলল, 'তাই তো শুনেছি।' অমৃত তু তু করে উঠল, 'আহা, অতবড় কারবার। আর সিরাজদিঘার মত বন্দরে। তবে হ্যাঁ, খাঁটি মানুষ। আবার হয়ে যাবে। ফাঁদতে পারলে এখানেও জমবে মন্দ না।' গলা চেপে বলল, 'তবে হ্যাঁ, ওই পশ্চিমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। খুব জোর কমনিশন্ চালাতে হবে।'

কমনিশন্ হল কম্পিটিশন্। গলা ছেড়ে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, যশোর জেলাটাও কি পাকিস্তান হয়ে যাবে বড়দি ?'

তা তো জানে না লীলা। ভাগাভাগি কবে হবে, কতখানি হবে, সে তার কিছুই জানে না। কোথায় ব্যবসা ফাঁদলে কি হবে, সে কথা সে তিলেকের তরেও কোনদিন ভাবেনি। সে তো ছুটছে। দিবানিশি ছুটছে কিসের পেছনে। এক নিদারুণ অতৃপ্তি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে পেছনে ফেলে ছুটেছে সে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্যা হয়ে। সে কেন অতশত ভাববে। যার নিজের ঠিক নেই, সে পরকে দেখতে যাবে !

অমৃতকে জবাব দিল তিলি, 'মেয়েমানুষ অত খোঁজ করে না। তুমি মুড়ি দাও দিকিনি।'

অমৃত মুড়ি দিল। পাল্লা ঝোঁকতা দেখে দু মুঠো কম দিল। দিয়ে আবার একমুঠো ফাউ দিল। তিলি বলল, 'বেশী দিলে যে।'

অমৃত বলল, 'না দিয়ে যে পারিনে গো।

তিলি বলল, 'কত বেশী দিলে, আমিও হিসেব রাখছি।'

বলে আবার দু'বোন হেসে উঠল। শেষ মুহূর্তে মুখ খুলল লীলা। বলল, 'মুদীর চেয়ে পাল্লাটার পেরাণেই রস বেশী দেখছি।'

সকলেই হেসে উঠল। কোঁচড় ভরে মুড়ি নিল তিলি। কিন্তু অমৃতের মুখটা কালি হয়ে গেল। পাল্লার চুরিটা ধরা পড়ে গেছে। সেজন্য পাল্লার প্রাণ

বলে অমৃতর প্রাণে খোঁচা দিয়ে গেল। কিন্তু কি করবে? অভ্যাস হয়ে গেছে এমন, যাকে ভাল লাগে পাল্লাটি তাকেও ঠকিয়ে বসে।

দুই বোন বেরিয়ে এল রাস্তায়। সবাই তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। অমৃত কোমর চুলকোতে চুলকোতে মনে মনে বলল, 'হুঁ। দুটিই সমান।'

হেলে দুলে চলেছে দুই বোন্। দূর থেকে কে গেয়ে উঠল,

'সাথী ছোড় গয়ে,
অব্ কহাঁ বসেরা আপ্‌না'।

তিলি বলল, 'শুনলি তো! ভাসিয়ে নেওয়ার অনেক আছে। জলের অভাব কি? ডুবলেই হয়।'

লীলা বলল, 'কে লো?'

'কে আবার? দশগণ্ডার আর একজন। বোধহয় পকেটমার, নয় তো সিঁদেল চোর। আর একটু ভাল হলে হয় তো, ফেরেরবাজ গুণ্ডা, চাওয়ালাও হতে পারে।' বলে হাসতে গিয়েও হাসিটা উদ্দাম হয়ে উঠল না। লীলা হাসল খিলখিল করে। সত্যি, ভেসে যাওয়ার জন্য কত নদী আছে এ বিশ্ব সংসারে। নদী খাল বিল গাং। কাঁচা পাকা পঙ্কিল গভীর নর্দমাও আছে ছড়িয়ে আনাচে কানাচে, পথের আশে পাশে। তাতেও কত স্রোত্। ভেসে যেতে কি আর আছে। শুধু পার পাওয়া যাবে না কোনদিন। অথচ প্রতি পদক্ষেপে চোরাবালি। তলা ক্ষয়ে যাওয়া পাড়। প্রতি মুহূর্তে পড়ি পড়ি, মরি মরি। তবুও ন যযৌ, ন তস্থৌ। ভাসা যায় না, দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। দিদি এর কি বুঝবে! যার আছে মেঘনাদ দাশ, তিলির কথা সে বুঝবে না

বুঝবে না! যার আছে মেঘনাদ দাশ, অষ্টপ্রহর তারও জীবন জলতরঙ্গে বাঁকা। সেই বাঁকা স্রোতের গতিবিধি তিলি বা কি বুঝবে!

নকুড় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংবাদ নিল দেশের। মেঘনাদকে সে বরাবরই একটু ভয় করে। ভয় নয়, বোধহয় সমীহ করে। জামাই হলে কি হবে। জামাইয়ের জীবনবৃত্তান্ত তার কাছে এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী। তা ছাড়া তার বিশ্বাস

লোকটার উপর মা লক্ষ্মীর নজর আছে সব সময়। সুনজর সেটা। নইলে, লালামিঞা তো তাকেও সাহায্য করেছিল কিছু। সে তো কিছুই করতে পারল না জীবনে। আর এই মদনসা'র ব্যাটা তার জামাই। দূর পথে পাড়ি দিতে মদনসা অনেকবার এসেছে তার দোকানে সোনাডুলির চরে। নকুড় মুড়ি বাতাসা খাইয়েছে তাকে। খবরাখবর জিজ্ঞেস করেছে। মদনসা'র দুঃখে আহা উহু ও যে না করেছে, তা নয়। হোক ভাঙ্গা দোকান। তবু মদনসা'র মত তাকে দেশে দেশান্তরে বেড়াতে হয়নি ঘুরে। সে বরং মদনদাশকে পরামর্শ দিয়েছে, 'বুঝলেন কি না দাশমশাই, অনেক বয়স হল। আর ঘোরাঘুরি করে কি হবে। যা হোক টিম টাম্ সাজিয়ে নিয়ে বসেন সিরাজদিঘার বাজারে। ছেলেটা আছে, তাকেও কাজে লাগান। দুটি মানুষ আপনারা। চলে যাবে কোনরকমে।' নকুড় নিজে ভয়ানক গা ভাসানো মানুষ। জীবনে কখনো সোনাডুলির বাইরে যায়নি। শত অভাবে অনটনেও নয়। সোনাডুলি থেকে যেদিন বেরিয়েছে, সেদিন চিরদিনের জন্যই বেরিয়েছে। সে কি বুঝবে মদনদাশের কথা। মদনদাশ তাই তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকত। যার মাথায় লক্ষ্মণসা'র দেনা, ভিটে মাটি বন্ধক, তাকে নকুড়সা এসব কি বলছে।

সেই মদনদাশের ছেলে। তার জামাই মেঘনাদ। আজ হঠাৎ জীবনে একটা ধাক্কা খেয়ে ছুটে এসেছে এখানে। এ ধাক্কা সামলে উঠতে কতক্ষণ। নকুড় ভাবে, ভগবান যা করেন, তা মঙ্গলের জন্যই করেন। বোধ হয় মেঘনাদকে এ ধাক্কাটা ভগবান দিয়েছেন নকুড়ের মুখ চেয়েই। যেন দেশব্যাপী ধাক্কাটা শুধু মেঘনাদকে কেন্দ্র করেই। হয় তো, এখনো আশা আছে নকুড়ের। মেঘুর ভেতরের অবস্থা সবটা না জানলেও, কিছুটা অনুমান করতে পারে সে। মেঘনাদের সঙ্গে জীবনটাকে জড়ালে, লক্ষ্মীর স্পর্শলাভ ঘটে যেতে পারে এ বয়সে।

নকুড়ের ব্যর্থ হতাশ জীবনে আশার আলো নিয়ে এসেছে মেঘনাদ। তার ভাটা পড়া রক্ত ধারায় চোরা বাণের গুনগুনানি বাজছে। সে নিজে একজন সাহা। হয়তো গদীতে বসার সুযোগ আসবে জীবনে। মহাজন নামের গৌরব

অর্জন করতে পারবে। এই অষ্টপ্রহর ভাঙ্গাচোরা সংসার, অভাব অনটন মিটতে পারে। বিজয়ের কলে খাটা পয়সার সান্ত্বনা প্রয়োজন হবে না। অনন্তের ভিক্ষার দান নিতে হবে না আর হাত পেতে। বসন্ত, বসনা যদি মরেও যায়…। না-ই বা মরল। যা খুশি তাই করুক। লক্ষ্মীমন্ত মানুষ যখন এসেছে এ সংসারে, তখন তার শ্রী ফিরতে পারে। গলার কাঁটা তিলিটার ব্যবস্থা হয় তো মেঘনাদ এবার নিজেই করবে।

তাই যখন সে মেঘনাদের হাত ধরেছিল, সেই স্পর্শের মধ্যে তার অসহায়তা ও আশা ব্যক্ত করেছিল। মেঘনাদ স্পর্শ বোঝে। তলিয়ে বিচার করতে জানে না। শ্বশুরকে তার ভাল লেগেছে। হতাশায় হোক, আনন্দে কিংবা স্নেহে হোক, ওই স্পর্শ টুকুর প্রয়োজন ছিল মেঘুর।

নকুড়সা ঘন ঘন গলার কণ্ঠি হাতড়াচ্ছে। অনেকদিনের পুরোনা কণ্ঠি। তেলে জলে কালো কুচকুচে হয়ে উঠেছে এখন। কোনদিন টেনে ছিঁড়ে ফেলার কথা চিন্তাও করতে পারেনি সে। তেমনি উত্তেজিত মুহূর্ত্ত কোনদিন আসেনি তার জীবনে।

মেঘু বলল ধানমণ্ডাইয়ের সেই সাহেবের কথা। তার পরামর্শ ও মতামত। নকুড় বলল, 'অতি সত্যি কথা বাবা। এখানকার লোকেও দেখছি, দেশ ভাগাভাগি চায়। ধানমণ্ডাইয়ের সায়েব তোমার সত্যি ইষ্টজন। দেশ ভাগ হবেই। আগে এসে ভালই করেছ। এখন তোমার মনে অনেক দুঃখু, কষ্ট-ভয়। বুঝি তো। অমন সাজানো জিনিস ফেলে চলে এসেছ। ভাব, মাথা ঠাণ্ডা করে, মন দিয়ে ভাব। দেখ, শোন, ঘোর এদিক সেদিক। তারপর ভেবে-চিন্তে কাজ আরম্ভ করা যাবে।'

নকুড়সা'র আর তর সইল না। বলে ফেলল, 'বুড়ো হয়েছি। এ হাড়ে ভেল্‌কি খেলবে না ঠিকই। তবু, তোমার কোন কাজে যদি লাগি, সে আমি করব। তোমাকে বলতে হবে না। তোমার বাবা থাকলে যা করত, আমিও তাই করব। তুমি এখানকার হালচাল দেখ, এদিকে দেশেরও যা হয়, একটা কিছু হয়ে যাক। ধীরে সুস্থে আরম্ভ করা যাবে।'

নকুড়সা'কে বিশ্বাস করল মেঘু। ওটাই লালমিঞার শিক্ষা। যদি মন্দ বলে, তবে আগে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করে যদি ঠকতে হয়, তবে ঠক। ঠকে, ঠেকে শেখ। চিরদিন কিছু আর ঠকতে হয় না মানুষকে। তবু বিশ্বাস আর ভরসা তো এক কথা নয়। তেমন ভরসা নেই মেঘুর। বিপিন থাকলে ভরসা করতে পারত মেঘু। তবে আপাতত বিশ্বাসটাই প্রয়োজন। মনের কথা বলেছে নকুড়। অতবড় জিনিস ফেলে এসে মন মুষড়ে গেছে, ভেঙ্গে পড়ছে। আবার আশাও দিয়েছে। হয় তো তাই। মেঘু তার নিজের উপর তো বিশ্বাস হারায়নি।

জমিজমা-ঘরবাড়ি-গদী কারখানার কথা উঠল। কে দেখবে শুনবে, কার উপরে ভার আছে? বিপিনের উপর। বিপিন? নকুড়ের কুঞ্চিত কপাল সর্পিল হয়ে উঠল। শত হলেও একজন কর্মচারী মাত্র।

বলল, 'সেটা কি ঠিক হয়েছে বাবা?'

মেঘু বলল, 'কোন্‌টা?'

আন্দাজ করতেই পারেনি মেঘনাদ। নকুড় বলল, 'এই বিপিনের উপর সব কিছু…'

ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল মেঘনাদের। তার নিজের ভালমন্দের উপর একমাত্র লালমিঞার কথাই তার সহ্য হত। আর মনে মনে যদি কাউকে সহ্য হয়ে থাকে, ভালবেসে থাকে, সে হল বিপিন। নকুড়কে সে কতটুকু জানে, যত জানে বিপিনকে! তার কাছে নকুড় বিপিন আকাশ পাতাল তফাৎ। হলই বা শ্বশুর, আর একজন কর্মচারী মাত্র। বিপিন তার দুর্দিনের সঙ্গী।

সে খালি বলল, 'ঠিকই করেছি। বিপিন ছাড়া আমার আছে কে?'

কথাটা লাগল নকুড়ের বুড়ো বুকে। বিপিন শ্বশুরের চেয়েও বড়! বিশ্বাস বলে কথা। হবে হয় তো তাই। বিরক্ত করতে চায়না সে মেঘনাদকে।

মেঘনাদ বলেই ফেলল, 'বিপিনদা'টা এলে তো বাঁচতাম। আসতে চাইল না। বললে, তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকব না এখন। কাজ আরম্ভ হোক, তারপর যাব। বড় খাঁটি মানুষ।

দু'হাতে কণ্ঠি খুঁটতে খুঁটতে বলল নকুড়, 'তা ভালই।'

মনে মনে বলল, 'কত খাঁটি তা ভগবান জানে।'

তারপর অন্যান্য ব্যবসায়ের কথা উঠল। লক্ষ্মণ সা'র খবর কি। কি রকম চলছে তাদের কারবার। দুরাবস্থার কথা নকুড় জানে। এও জানে লক্ষ্মণসা'র নাত্‌নিকে কেন বিয়ে করে নি মেঘনাদ। কিন্তু লক্ষ্মণসা'র দুরাবস্থায়ও মেঘনাদের দুশ্চিন্তা। বলল, 'কোনরকমে চলছিল। তার উপরে এই ভাগাভাগি। কি হবে বলা যায় না। শত হলেও ব্যবসায়ী মানুষ। চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসব দেখা যায় না।'

মেঘনাদের সরল হৃদয়টি পরিষ্কার ফুটে উঠল নকুড়ের চোখের সামনে। পিতৃশত্রু লক্ষনসা'র প্রতিও কোন রাগ নেই মেঘনাদের। বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু কারুর লক্ষ্মীলাভে তার হিংসা নেই। বরং মার খেলে কষ্ট পায়।

লালমিঞা বলত, শোধ নিবি অন্যরকমে। সৎভাবে। পড়ে গিয়ে আছাড় খেল আর তুই দাঁত বের করে হাসলি। একে বলে জানোয়ারের হাসি। নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়া, দেখবি, হিংসা নিয়ে সে তোর পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। এবার হাত বাড়া, ওকে তোল। তুলে দাঁড় করিয়ে দে। এর নাম শোধ। আর যদি দুষমন মরণ বাড় বাড়ে, তবে তোর সাচ্চাপনার আগুনে সে এমনিই পুড়ে মরে যাবে।

তবে আজকের কথা আলাদা। আগুন লাগতে যাচ্ছে সকলের ঘরে। কে কার ভিটেয় জল দেয়। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। লক্ষনসা'র কথা ভাববার অবকাশ নেই মেঘনাদের। ভাবতে চায় না সে।

জামাই শ্বশুর কথায় ব্যস্ত। দরজার আড়ালে এসে দাঁড়াল লীলা আর তিলি। তিলির হাতে কানা উঁচু কলাইয়ের থালায় মুড়ি। তেল নুন্ পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে মেখে এনেছে। এক হাতে মুড়ি, অন্য হাতে চা'য়ের গেলাস। আসতে আসতে তিলি দাঁড়িয়ে পড়ল!

লীলা বলল, 'দাঁড়ালি যে। তোর আবার লজ্জা করছে নাকি?'

তিলি বলল, 'লজ্জা না ছাই। মাইরী, তোর বরের চেহারা যেন বিজলী কারখানার মিঞা টিণ্ডেলের মত। আমার ভাই বড় ভয় করছে।'

লীলা বলল, 'তখন বললাম যে তোকে চেহারার কথা। দেখ না, চেহারাটা দেখলে ভাল মানুষ মনে হয়। ও তো টিণ্ডেল-ই। নিজের কারখানার টিণ্ডেলের কাজ ওর কখনো পছন্দসই হত না। নিজে গিয়ে তণ্ডুল তাতাতো।'

ঠোঁট উল্টে বলল, 'তবে ভয়ের কিছু নেই। দেখতেই ওই রকম। চল্ না।'

মনে মনে অবশ্য তিলির অন্য কথা ছিল। প্রথম দেখায় সেকথা মনে আসেনি। এখন বড় জড়োসড়ো হয়ে উঠল। তার এই অনূঢ়া এত বড় শরীরটা দেখাতে মরমে মরে যাচ্ছে সে। না জানি কেমন করে দেখবে। কি না জানি ভাববে এতবড় আইবুড়ো মেয়েটাকে দেখে। মানুষের মন যে বড় বিচিত্র! এত বড় মেয়ে ঘরে, বিয়ে হয়নি! অমনি যেন কি এক বিচিত্র রহস্য উঁকি-ঝুকি মারতে থাকে সে মেয়ের চোখে মুখে, সারা দেহে। মানুষের চোখ দিয়ে তিলি নিজেকে অনেকবার এমনি দেখে লজ্জায় ও ব্যথায় জড়োসড়ো হয়েছে। এখন আর হয় না। তবে, মেঘনাদ নতুন মানুষ। অনেকদিন পর দেখা; হয় তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে।

লীলা বলল, 'নাকি, বন্নুয়ের প্রেমে পড়ে গেলি।'

দু'বছর আগে হলে মুড়ির থালা শুদ্ধ মারত তিলি লীলার মাথায়। খালি বলল, 'তোর মুখে আগুন মুখপুড়ি।'

লীলা হেসে বলল, 'মুখে আগুন নয়, তোর মুণ্ডু। তুই কি তাই ভেবেছিস্ নাকি ওকে। ও এখন ওর নিজের কথায় মত্ত। কাউকে ওর মনেও নেই, চোখেও নেই। সে বোধ থাকলে তো ভালই হত।'

'দূর হ, দূর হ তুই।'

বলে তিলি এসে পড়ল সামনে। সঙ্গে সঙ্গে লীলাও এল।

লীলা ঠিক বলেনি। যেমন ঠিক বিচার সে কোনদিনই করতে পারেনি মেঘনাদের উপর। দুবোনকে একসঙ্গে দেখে, মেঘনাদ খুশি হয়ে উঠল। তবে তার খুশি ধরা মুশকিল। হঠাৎ অনেক দিন পরে এক নতুন ঘরোয়া স্বাদ পেল

সে। বাপের বাড়ি এসে লীলার অষ্টপ্রহর অতৃপ্ত প্রখর মুখ যেন শান্তিময়ী দেখাচ্ছে। কাঁদছে, হাসছে, ঘুরছে বোনের সঙ্গে সঙ্গেই। অখণ্ড কাজের জীবনে, বাড়ি ফিরেছে সে চিরদিন অতৃপ্ত মনে। ফিরেছে বেদের ডেরায়। লোক নেই জন নেই, দুটো কথা বলার মানুষ নেই এক লীলা ছাড়া। আর লীলা থেকেছে তার নিজের লীলা নিয়ে।

মুড়ি দেওয়ার আগে হাত বাড়িয়ে মুড়ি নিল সে। মুড়ি কিছু কম হয়েছে তার পক্ষে। তা হোক্! খাওয়াটা তো সব সময় বড় নয়।

নকুড় বলল, 'ঠুমিকে তোমার মনে আছে তো?'

এতক্ষণে গোঁফের ভেতর থেকে মেঘনাদের দাঁত দেখা গেল। বলল, 'হ্যাঁ, মনে আছে, অনেক বড় হয়ে গেছে।'

লীলা চিমটি কাটল তিলিকে। তিলি ছটফট করতে লাগল পালাবার জন্য। যা ভেবেছিল তাই। বড় হওয়া, শুধু বড় হয়ে যাওটাই বড়। নকুড় তাড়াতাড়ি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'কি করব বাবা, এখনো ছুঁড়িকে বে' দিতে পারলাম না। বোঝ তো সবই।'

মেঘনাদ তবু হাসল দু'বোনের দিকে তাকিয়ে। যেন নকুড়ের কথাটা হাসিরই।

নকুড় আবার বলল, 'মুড়ি তো দিলি। একটু হাত-মুখ ধোয়ার জল দে।'

তিলি চা নামিয়ে দিল। মেঘু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'এ কি, চা? ওসব খাইনে। অতবড় বাবু এখনো হইনি। শত হলেও গেঁয়ো বাঙ্গাল তো।'

চা খাওয়াটা তার কাছে বাবু হওয়ার সামিল। ওটা তার ছোটকালের সংস্কার।

তিলি বলল, 'ওটা বুঝি বাবুরা খায়? আমরা বাঙ্গাল গরীবেরাই তো ওই খেয়ে থাকি।'

'চা খেয়ে? ওরে বাপ্‌রে। আমি পারব না। তোমার দিদিকে দেও।'

দুই বোন চোখোচোখি ক'রে হেসে উঠল। তিলি বলল, 'আপনি না খেলে দিদিও খাবে না।'

লীলা বলল, 'আমার বয়ে গেছে।'

যেন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই নকুড় বলল, 'তা'লে আমাকেই দে।'

মেঘনাদ ভেবেছিল, ঝুমি মুখ ঝামটা দেবে তার কথায়। কিন্তু আজ সে যেন সিরাজদিঘার ঝুমি নয়। আজ সে মায়ের মেয়ে, ছোট বোনের দিদির মত কথা বলছে।

তিলি বলল, 'দিদি তুই বউকে জলটা এনে দিতে বল্। আমি তোদের এই চালিস্ না ফালিস্, ওই ছোঁড়াকে চাড্ডি মুড়ি দিয়ে আসি।'

চলে গেল দুই বোন একসঙ্গে। জল এনে দিল লীলা। একটুখানি সময়ের মাত্র ফাঁক। এরই মধ্যে আবার মেঘনাদের মনে ভিড় ঠেলে এসেছে অনেক কথা। এখন মনে মনে শুধু আলো-ছায়ার খেলা। আশা নিরাশার দোলা। তবু ভাল। ধানমণ্ডাইয়ের সাহেবের কাছ থেকে আসার দিন থেকে সে মুখ খুলতে পারেনি। কিছু ভাবতে পারেনি। এখানে এসে পৌঁছুনোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নিকষ অন্ধকার ভরা ছিল মন। এখন মাঝে মাঝে আলো দেখা দিচ্ছে। নতুন করে কাজের কথা ভাবছে সে।

তার নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে নকুড়ও নীরব। সে যেন শোল মাছের পিছনে পিছনে ল্যাজা হাতে শিকারী। নিঃশব্দে অদৃশ্যে ফিরছে জলে জলে। হয় তো উপমাটা একটু নিষ্ঠুর হল। তবু, এমনি ভাবেই যেন, মেঘুর মনের গতিবিধি নিরীক্ষণ করছে সে।

মেঘুও অন্যমনে নিরীক্ষণ করছে এখানকার মানুষগুলিকে। খানিকটা অসাবধানে, অন্যমনে। লীলা জল এনে দিলে। চোখ বাঁকিয়ে একটু তাকাল মেঘুর দিকে। বলল, 'গায়ের জামাটা যে গায়ে গায়ে পচল। বাগেরহাটের কাপড় যে আর চেয়ে দেখা যায় না। খুলতে হবে, না কি ?'

সত্যি, জামাটা এখনো ভিজে রয়েছে। বলল, 'হ্যাঁ, এই যে খুলছি।'

বলে সে লীলার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল। বোধহয় এমনি করে তাকিয়েছিল অনেকদিন আগে। লীলার নাকের ডগা কেঁপে উঠল একটু। হঠাৎ একটু বিচিত্র হেসে বলল, 'মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে মনে হচ্ছে ?'

মেঘনাদ উচ্চরবে হাসতে গিয়ে থেমে গেল। নকুড় রয়েছে। জামাটা খুলে ফেলে তুলে দিল লীলার হাতে। শক্ত বিশাল শরীর। ফর্সা গায়ে ঘামাচি উঠে লালচে দেখাচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে মুখে হাতে জল দিল। বিজয়ের বউ নিয়ে এল গামছা। লীলাকে বলল, 'এই নেও দিদি।'

লীলা বলল, 'আমাকে কেন, তুই দে।'

ভাজকে ঠাট্টা করে বলছে লীলা কথাটা। একটু লজ্জা দেওয়ার জন্য। কিন্তু ষোড়শী ঠাট্টা বোঝে কি না কে জানে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল একমূহূর্ত লীলার দিকে। আবার ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে গামছাটা হাত বাড়িয়ে ধরল মেঘুর কাছে।

লীলা হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে।

চমকে উঠল নকুড়। অনেকদিন আগের, সোনাছুলি চরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে হাসি শুনে। অনেকদিন আগের সোনাছুলি চরের এক বীভৎস ঘটনা। যেন একটা দুঃস্বপ্ন। মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়। কত ভাবনা, কত দুশ্চিন্তা, কত ভয়। অথচ সিরাজদিঘার গদীর মালিক মেঘনাদ দিব্যি সানাই বাজিয়ে বিয়ে করে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। রাত্রেও কাঁটারি শানিয়ে রেখেছিল নকুড়। মনে করেছিল, গলায় বসিয়ে বস্তায় করে ফেলে দিয়ে আসবে ধলেশ্বরীর জলে। সুকুমারি বাধা দিয়েছিল। মেয়ে বলে নয়। হাঙ্গামার ভয়ে। সেই মেয়ে। আজ সংসারে সকলের চেয়ে সুখে রয়েছে। হঠাৎ ছানি-পড়া আধ-কানা হয়ে গেল নকুড়ের চোখ। পিট পিট করে তাকাল লীলার দিকে। এই মেয়েটাই বোধহয় আছে আজ নকুড়কে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। এই মেয়েই হয় তো প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারে তাকে এ জীবনে।

সে কপালে হাত ঠেকিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'ঝুমি নাকি লো?'

ঝুমি বলল, 'হ্যাঁ।'

নকুড় বলল, 'আয় মা, একটু কাছে আয়। চোখে ভাল ঠাওর করতে পারিনে। ভাবলাম, তিলি বুঝি।'

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল লীলার। এত কানা যে, ঠাহর পর্যন্ত হয় না? ঠোঁট

ছুটো বেঁকিয়ে কাছে এসে বসল লীলা। তেমনি অগোছাল। বোতাম খোলা জামা। লুটনো আঁচল। বলল, 'চোখে ওষুধ দেও না কেন?'

মেয়ের পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'আয় মা, বাঁশের মইয়ে চাপি, ত'াপর ওষুধ লাগাব।' তার কম্পিত হাতটা ঘুরতে লাগল লীলার পিঠে। কাঁটারির কোপের দাগটা অনুভব করতে চাইছে নকুড়। যে দাগটা আজ অবধি মেঘনাদ পর্যন্ত দেখতে পায়নি। এই দশ বছরের মধ্যে।

মেঘনাদের হাতে গামছাটা তুলে দিয়ে যোড়শী বলল লীলাকে, 'আমি যাচ্ছি দিদি।'

লীলা বলল, 'চল্ আমিও যাই।'

মেঘনাদ মুড়ি চিবুতে বসল।

তিলি মুড়ি নিয়ে এসে দেখল চালিস্ ঘুমিয়ে পড়েছে পিপুলতলায়। প্যাণ্টের তলাটা ছেঁড়া। সেখানে হাত চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

তিলি ডাকল, 'এই, কইরে চালিস্ না কি। ওঠ, মুড়ি নে।'

চালিস্ এক ডাকেই উঠল। উঠেই এক গাল হাসি। পরমুহূর্তেই চোখ ঘসে বলল, 'ও আপনি আর এক ঠাকরুন বুঝি? আমি ভাবলাম, সেই কর্তাবাবুরই বউ। মুড়ি এনেছেন? দিন।'

ব'লে, কোমরে বাঁধা ন্যাকড়াটা খুলে পাতল। মুড়ি ঢেলে দিতে তিলি অবাক হয়ে দেখল, ছেলেটা হাসছে আর তাকে দেখছে। তিলি বলল, 'হাসছিস্ যে?'

চালিস্ বলল, 'আপনি বুঝি ওই ঠাকরুনের বুইন?'

তিলি হেসে বলল, 'কি করে বুঝলি?'

চালিস্ একগাল হেসে বলল, 'এই আপনাদের ঠাট বাট দেখে। এক জাতের কি না।'

তিলি লীলার মত সব সময় খিলখিল করে হাসে না। বলল, 'কি ঠাট বাট দেখলিরে?'

চালিস্ এক মুহূর্ত চোখ পিটপিট করল। বলল, 'এই কথার রকম সকম, গলার স্বর। বেশ লাগে কি না আমার।'

ব'লে এক মুঠ মুড়ি মুখে পুরে দিল। সারা রাত ঘামে, কয়লার গুড়োয় আর ধূলোয় সারা গায়ে কালির দাগ। তিলি বলল ভ্রূ তুলে, 'হুঁ: আর কি ভাল লাগে?'

'আর?' বলেই মুড়ির পুঁটলি গুছিয়ে ধরল এক হাতে। অন্যহাতে পেটে চাপড় মেরে একটা বিচিত্র শব্দ তুলল, বুক্ বুকুং বুকুং। ভঙ্গি ও শব্দ, দুই-ই হাসিতে নাড়ি ফুলিয়ে তোলে। ওস্তাদে বাড়বে সন্দেহ নেই। তিলি বলল, 'থাম্ থাম্। তুই জুটলি কোত্থেকে? একেবারে সেরাজদিঘা থেকেই নাকি?'

চালিস্ বলল, 'না। রেলগাড়ি থেকে। ওনারা কি সেরাজদিঘা থেকে আসছেন?'

'তাও জানিস্নে?' তিলি বলল, 'মেঘনাদ দাশের নাম শুনেছিস, সেরাজদিঘার বিস্কুটের কারবারী?'

চালিস্ তখনো বলল, 'শুনিনি আবার? অনেকবার দেখেছি।'

তিলি চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠল, 'মিছে বলছিস্ যে মুখপোড়া? ও-ই তো মেঘু সা; যাকে পটিয়ে পাটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এলি।'

চালিসের গলায় আটকালো মুড়ির দলা। গিলে শুদ্ধ পেটটা কেঁপে কেঁপে উঠল বারকয়েক। তারপর কোঁৎ করে দলাটা গিলে হাসল। হলদে চোখ দুটো বড় করে বলল, 'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গেছলাম গো ঠাকরুন।'

তারপর ফিস্ফিস্ করে বলল, 'ঠাকরুন, মা খুড়ির মত আপনি। একটা বিড়ি দিতে পারেন?'

তিলি ভ্রূকুটি করল।—'বিড়ি খাওয়াও ধরেছ? গাঁট কাটতে, হাততালি আর শিস্ দিতে শিখিস্নি?

বলে জবাবের প্রতীক্ষা না করে ফিরতে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, গলিতে ছুটির ভিড় দেখা দিয়েছে। কখন বাঁশী বেজেছে টেরও পায়নি। সাড়ে দশটা

বেজে গেছে এর মধ্যেই। বিজয় এসেই চান করে খেতে চাইবে। গলির ভিড়ে নজর-করতে গিয়ে চোখে পড়ল বিজয়কে। হাতে ঝুলছে বড় একটা ইলিশমাছ। ফের সেই মিস্তিরিপনা। ধার করেছে নিশ্চয়ই। সে রান্নাঘরে ছুটল তাড়াতাড়ি।

চালিসের মুড়ি খাওয়া বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। সে আস্তে আস্তে উঠে উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। দিয়েই চমকে দাঁড়াল। সিংহের মত সেই মানুষ। বসে বসে কথা বলছে আর মুড়ি চিবুচ্ছে। সিরাজদিঘার মেঘনাদ দাশ। মেঘু সা'! গুনোহাটি বন্দরের বদরুদ্দিনের কারখানায় কিছু কাজ শিখেছে বটে। তা' বলে মেঘুসা'র সামনে মিছে কথা। পেছিয়ে এসেই লম্বা। আর কোনদিকে তাকাল না চালিস্।

পথে বিজয় বলল, 'কি রে কালা গেঁড়াবাজ চললি কোথায়। গিলবে চল, তোমার জন্যে ইলিশমাছ এনেছি।'

চালিস্ টের পেতে দিল না যে, সে পালাচ্ছে। বলল, 'সত্যি?' বলেই সুর করে বলে উঠল, 'চাখুম চুখুম চাখুম চুখুম চাখুম চুখুম রে।'

বিজয়েরা অনেকে আসছিল। হেসে উঠল সবাই। একজন বলল, 'এ কোত্থেকে জুটল হে।'

বিজয় বলল, 'অনেক দূর থেকে।'

সবাই এগিয়ে এল। চালিস্ আবার পিছন ফিরে একেবারে বড় রাস্তা। মুড়িটাই যা লাভ ছিল কপালে।

তিলি চা নিয়ে এসে দেখল, পিপুলতলা শূন্য। রাস্তায় ছুটির ভিড়। মনে মনে বলল, কি ছেলেরে বাবা!

ইতিমধ্যে পাড়াটা একটু কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে। সকলেই প্রায় কলে কারখানায় কাজ করে। খাবার তাড়ায় এসেছে সবাই। পাড়াটা যেন নিদ্রিত ছিল এতক্ষণ। জেগে উঠল এখন। সমস্ত গলিটার মধ্যে মাত্র দুটি জলকল। সেখানে পিঁপড়ের মত হেঁকে ধরেছে সবাই। আশেপাশে আছে গোটা দুই তিনেক পুকুর। চিংড়ি লাফানো জলের পরিমান তাতে। দই পাঁক হয়ে উঠল পুকুরগুলি।

এ বাড়িটাও হঠাৎ চেঁচামেচিতে মুখর হয়ে উঠেছে। বাড়ি নয় এ গলির মধ্যে সবই প্রায় বস্তি। একলা বিজয় নয়। অন্যান্য ভাড়াটেরাও এই কলে কাজ করে। ছেলে কাঁদা, রান্নার তাড়া, জল তোলা আর চাল ডালের হিসাবের এই যেন সময়।

লীলা তো ইলিশমাছের দাম শুনে হা। আড়াই টাকা সের! হলই বা গঙ্গার মাছ। মাথায় থাক অমন গঙ্গা।

তা' বললে কি হয়। কারবারী বোনাই এসেছে। ইলিশ মাছের মরশুমে তো, বাজারের কাটা ইলিশের এক টুকরো ল্যাজা ছাড়া কিছু আসত না। ওই-টুকু গন্ধ যদি বা হয়। আজ এনে ফেলেছে একটা। এ বছরের মরশুম তো শেষ। আর কি, শ্রাবণ মাস পড়ে গেছে। বড়জোর দু'টাকায় নামবে, আর একদিন আনা যাবে তা হলে।

বুকের মধ্যে কাঁপছে সুকুমারির। গলায় খুস্‌খুস্ ক'রে চুলকোচ্ছে। কিন্তু চিৎকার ক'রে ঝগড়া আরম্ভ করতে পারছে না। শত হলে ও মেয়ে-জামাই এসেছে এতদিন বাদে। কিন্তু হপ্তার টাকায় নিশ্চয় কম পড়বে।

বিজয়ের সে সব খেয়ালই নেই। ষোড়শীর কোল থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল ছেলেটাকে। খানিকক্ষণ হাসাল, তারপর কাঁদাল, কাঁদিয়ে আবার দিয়ে গেল ষোড়শীর কোলে।

ষোড়শী একবার বিজয়কে দেখে ছেলেটিকে আবার বসিয়ে দিল মাটিতে। ছেলেটা আরো চিৎকার জুড়ল। বিজয় গলা ফাটিয়ে হেসে লীলাকে ডেকে বলল, 'দেখছিস্ তো কি রমক বউ। সে তোরা টের পাবিনে। গোবরস্নাতা হলে কি হয়। ছেলেটাকে কাঁদিয়েছি, তাই মাটিতে বসিয়ে দেওয়া হল রাগ করে। কাঁদ্ কাঁদ্ ব্যাটা, গলা ফাটিয়ে কাঁদ্।'

চারদিকে চিৎকার। অন্যান্য ভাড়াটেদের ঘরেও একই ব্যাপার। যেন কারখানা জয় করে এসেছে সবাই।

লীলা ঘুরছে এদিকে সেদিকে। বাড়িটা যেন মাঝখানে উঠোন রেখে, চারদিকে পায়রার খোপ তৈরী হয়েছে। দেখছে, ঠোঁট বাঁকাচ্ছে। পা ফেলছে

টিপে টিপে। পান গুঁজেছে মুখে এর মধ্যেই। ঠোঁটটি লাল ক'রে পানের পিক ফেল্‌ছে প্যাচ প্যাচ করে। তিলি মাছটা কুটতে যাচ্ছিল। বিজয় তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'দে নিজেই কাটি।'

'মাদী মাছটা, বেশ গড়ন না ?'

তিলি বলল, 'তা বেশ, কত সুদে টাকা ধার করলি ?'

'তা' কত আর।—' বলতে গিয়েই খ্যাঁক ক'রে উঠল বিজয়, 'তোর তাতে কি লো মুখপুড়ি ? ভাগ্, যা জল এনে দে। দ্যাখ, জামাইবাবুর কিছু লাগবে কি না।' বলে সে ঝিনুক দিয়ে খস্ খস্ করে আঁষ ছাড়াতে লাগল।

তিলি মুখ টিপে হেসে বলল, 'ইস্। বোনাই পেয়ে যে একেবারে মেতে গেলিরে দাদা।'

থমকে গেল বিজয়। হঠাৎ গম্ভীর আর করুণ হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'দ্যাখ্ ঠুমি, শত হলেও একটা মিস্তিরি মানুষ। কারবারী বোনাই। না খাওয়ালে লোকে কি বলবে, বল্ ? একদিন দুদিন তো। তারপর তো হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে, বোনাই শালা সবই বুঝবে, তার বিজা-শালার ট্যাঁকের দৌড় কত। দুদিন যাক্ না।'

বলেই গলা ছেড়ে নিজের বউ ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'ঠুমি, মা ষোড়শীকে ওর গণেশের কান্না থামাতে বল্। নইলে শালার দুটোর গলাতেই পা দেব, মাইরী বল্‌ছি।'

ঠুমি তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে কোলে নিল। বলল, 'বউ, তুই দাদাকে জল দে।'

তারপর লীলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রান্না চেপেছে সকলের। সকলের ঘরের পাশে এক ফালি করে বারান্দা। কাঁচা বারান্দা। সারি সারি উনুনের পাশে ভিড় করেছে সকলে। লীলা সকলের রান্না দেখে দেখে বেড়াচ্ছে।

ঘরের মধ্যে জামাই শ্বশুরের তখন ঘোরতর আলোচনা চলছে। মেঘনাদের ব্যবসায়ের কথাই উঠেছে। সে ঢাকার ব্যবসায়ের কথা বলছে। বিস্কুট রুটি

তো দূরের কথা। বাকরখানিওয়ালাদের তন্দুর (উনুন)-গুলি কুকুরের আস্তান হয়েছে। মনে লয় না যে, এ দেশে বাকরখানি তৈরী হ'ত কোনকালে। সপ্তাহে একদিন কোন কোন দোকানে বাকরখানি তৈরী হ'ত। তাও চোরাবাজারের ময়দা দিয়ে। দাম ডবল। এসব ছোটখাটো কারবারীদের সরকার এক চিমটী আটা ময়দারও পারমিট দেয়নি। শত হলেও বাকরখানি তো। কোথাও তৈরী হচ্ছে শুনলে সেখানে লোকে লাইন দিয়েছে। একেবারে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

অধিকাংশ কারখানা তো বন্ধ-ই। হাতে গোনা যেত ঢাকার কারবারী-দের। বাদবাকী সব দোকান গুটিয়ে অন্য কাজে ভিড়ে পড়েছে। অগুনতি পাইকের বেকার হয়েছে। মাল বেচে খাওয়া, তাও সইলে না। ভিক্ষের ঝুলিও উঠেছে অনেকের কাঁধে। বাপরে বাপ্! কী যুদ্ধ! গোলা ফাটল তো এদেশে দুটো। তার গ্যাস্ এত? রায়সাহেবের বাজারের কারবারীরা তো সরকারের ময়দার গুদাম লুট করারই মতলব করল একবার। টের পেয়ে গেল। সব্বাইকে ধরে একেবারে জেলে। ওরা বলল, 'সে-ই ভাল। কাজ কারবার বন্ধ, জেলে থাকা তবু ভাল।' মেঘনাদের তখন অবশ্য ভাল্‌ই অবস্থা। সপ্তাহে পনর থেকে কুড়ি মণ ময়দার কাজ হয়েছে।

নকুড়ের বুকের মধ্যে ধ্বক্ ধ্বক্ করে। কুড়ি মণ ময়দার কাজ? তাহ'লে মণ পিছু কত লাভ? হিসাবে দড় নকুড়। কিন্তু মেঘুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মুশকিল। সে তখন নতুন প্রসঙ্গ পেড়েছে। এই যখন ঢাকার ব্যবসায়ের অবস্থা, সেই সময়, এক সাহেব টিকাটুলির ওদিকে নতুন কারখানা খুলে বসল। কলকাতায় যে মস্তবড় সাহেবী বিস্কুটের ফ্যাক্টরী আছে, তার সঙ্গে ঝগড়া করে সাহেব ঢাকায় গেছে। পাঁচ বিঘা জমির উপরে পেল্লায় কারখানা খাড়া হল। কুড়ি বিঘা জুড়ে তার ঘেরাও পাঁচিল। লাখ টাকার মেশিন এসে পড়ল বিলাত থেকে। সকলের টনক নড়ে গেল। ঢাকা, ময়মনসিং, চাটগাঁ, সকলের কী হুতোশ! যেন বৃষ্টি না নামতেই সবাই মাথায় ছাতা খোলার উপক্রম করল। মেঘনাদও চিন্তিত হয়েছিল বৈ কি। মনে হ'ল যেন, এতদিনের সাজানো

বাগানে মত্ত হাতী আসছে সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে। চারদিকে রটে গেল, এবার হাতুড়ে ব্যবসা উঠল।

কলকাতার সাহেব কোম্পানীকে ময়দা সাপ্লাই করছিল স'ওয়ালেস্। স'ওয়ালেস্ নামটা অবশ্য মেঘনাদের মুখ থেকে বেরুল সালেস্। ঢাকার সাহেবকে সাপ্লাই দিতে আরম্ভ করল স্বয়ং ইস্পাহানি। সাহেবের কারখানা। তার সবই অন্যরকম। নতুন রকম, নতুন নতুন সব কায়দা। টিনের কৌটা আর ঝালাইয়ের কাজের জন্যই প্রথম লোক নেওয়া হল পঞ্চাশজন। যাকে বলে ছিট মাল, অর্থাৎ মচমচে বিস্কুট, তাতে দুধের দরকার। দরকার, কিন্তু অত খরচ করবে কে? পড়তা পড়বে না যে! কিন্তু সাহেব কোম্পানী। আশেপাশের বহু গয়লা'র তো মাসকাবারি বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

তারপরে প্রথম মাল বেরুল। সেই সঙ্গে কাগজ ছাপিয়ে বিলি হল। ঘোড়ার গাড়িতে ড্রাম পাইপ বাজিয়ে, সারা শহরে ছড়িয়ে দিল কাগজ। ইংরেজী আর বাংলায় লেখা ছিল সেই কাগজে, বিস্কুটের নানান কথা। দেয়ালে দেয়ালে ছবির কাগজ। মেমসাহেব আর সাহেব সেই বিস্কুট খাচ্ছে, এই রকম সব ছবি। দোকানে দোকানে নমুনা মাল বিলি হল। সবাই দেখতে লাগল, চাখতে লাগল।

ঢাকার কারখানাগুলির অনেকে গেল, সাহেবের মশলার কারসাজিটা যদি জানা যায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ও ব্যাপার দেশী কারখানার মতই গোপন। কেউ-ই জানতে পারবে না। কলকাতা থেকে এক বাঙ্গালী এসেছেন, তার মাইনেই নাকি পাঁচশো টাকা। একটা ঘরে বসে তিনি শুধু মশলা তৈরী করেন। আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই সে ঘরে। একমাত্র স্বয়ং মালিক সাহেব ছাড়া। কারখানার অন্যান্য লোক তো দূরের কথা!

তারপরে বাজারে বেরুল মাল। পাইকেররা ঘিরে ধরল কারখানা। লেখাপড়া জানা কোট প্যাণ্ট্ পরা ভদ্রলোক নমুনা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামান্তরে, হাটে ঘাটে বন্দরে। বলতে বলতে মেঘনাদের বোধ-হয় বাহজ্ঞান লোপ পেল। ঘরের অন্যদিকে জটলা, হাসাহাসি, অনেক কথা।

বিজয়ের হেঁড়ে গলার চিৎকার। শিশুর কান্না। একটি-ই তো ঘর। ঘরের কোলেই রান্না। মাথায় টিনের শেড, গোলমাল রীতিমত প্রতিধ্বনিত হয়।

কিন্তু মেঘনাদের সে সবে কাজই নেই। নকুড় শুনছে, কিন্তু শোনার মত নয়। অনেক কথা তার কান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু সে মাঝে মাঝে হ্যাঁ হুঁ আচ্ছা দিয়ে চালাচ্ছে। মনে মনে ভাবছে, এ শুনে কি লাভ! মেঘনাদের তাতে কিছু হয়েছে কি? মেঘনাদ বলল, কিন্তু দেশের মানুষকে তো সাহেব চেনে না। আল্‌টপকা কারখানা খুললেই তো হ'ল না। কারা রটিয়ে দিল, বিস্কুটে নাকি গরু শুয়োরের চর্বি মেশানো হচ্ছে। চর্বি কে না মেশায়? ঢাকার মুসলমান কারাখানাগুলি গরুর চর্বি কি আর না মেশায়? শুয়োরের চর্বি বরং ব্যবহার-ই হয় না। ব্যবহার যদি করতেই হয়, ঘি ব্যবহারই নিয়ম। কিন্তু এ আকালের দেশে সেকথা কেউ কল্পনা করতেও পারে না। ভাতের পাতে ঘি জোটে না, আবার রুটি বিস্কুটে। সে হ'ত নবাবী আমলে। কারখানাগুলিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে দালদা কোম্পানী সস্তার ঘি বের করে। সাহেব ফ্যাক্টরীতে দালদা-ই ব্যবহার হচ্ছিল। কিন্তু গুজব বড় বিচিত্র জিনিস। মানুষ সব ফেলে আগে ওইটে শোনে। শহরের লোকেরা ছাড়া, গ্রামের লোকেরা প্রায় বাতিল করল সে বিস্কুট। তারপর দাম? কদর না বুঝলে লোকে দাম দিতে চায় না। মেঘু শুধু কারবারী নয়, হাতেনাতে কাজ জানা কারিগর। সে তো জানে সাহেবের বিস্কুট কি জিনিস! বিস্কুটের গায়ে বাইরের হাওয়া লাগে না। বাইরের আলো দেখতে পায় না। তৈরী হয় আর সঙ্গে সঙ্গে টিনজাত। একেবারে রাং ঝালাই সঙ্গে সঙ্গে।

পড়তা অনুযায়ী দাম দিতে হবে তো! বাজারে মাল ছাড়লে কি হবে। বাজার ছাড়ে না। বাজারের পা ভারী। ঠেলে ঠুলেও চলে না। কায়েমী হয়ে সে দোকানে বসে রইল। এদিকে পাইকেররাও গণ্ডগোল আরম্ভ করল। তাদেরও পড়তা পড়ে না। তারপর সবসময় নগদ টাকায় মাল নেওয়া সম্ভব নয়। কারবারীর সময় অসময় আছে। বিশ্বাস করে ধারে দিতে হবে। কিন্তু

ধারের ধার ধারে না সাহেব কোম্পানী। আগে কারবার জমুক। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপিত হোক, তারপর ভাবা যাবে ধারের কথা।

পাইকেররা সরে পড়ল। সাহেবের এজেণ্ট ঘুরতে লাগল সর্বত্র। বাঁশের বেড়ার এমনি গুণ। সেই বংশযবনিকা ঠেলে এগুয়, সাধ্য কি। শুধু নামে কি আর মাল কাটে। নাম, ভার, ধার, সবই চাই। দুই ধার, একটা কাটবে আর একটা দেবে। তা ছাড়া দাম মস্ত বড় কথা।

সাহেবের মাল ছুটল কলকাতার দিকে। তারপর শোনা গেল, কারখানা শুদ্ধ উঠে যাবে কলকাতায়। কিন্তু গেল না। কিছুদিন পরে শোনা গেল, সাহেব কারখানা বিক্রি করে দেবে। শাঁখ বাজার আগেই হরিধ্বনি উঠল। অর্থাৎ আঁতুড় ঘরেই সন্তান মারা গেল।

বিক্রির কথা শুনে চনমন করে উঠল মেঘনাদের মন। একবার দেখে আসতে দোষ কি?

হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল নকুড়। এতক্ষণ শুনছিল আনমনে। তার কানে গেছে, বিজয় ইলিশমাছ এনেছে। মাছ কাটা আর ভাগাভাগির কথা শুনছিল সে থেকে থেকে। নকুড়ের বাপ মাছ খেত না: বংশ তাদের পরম বৈষ্ণবের। নকুড়ের সময় থেকে নিরামিষ খাওয়াটা বিলাসিতা হয়ে উঠেছিল। শুধু তো কচু, হিঞ্চে, কলমি। আলু কপি পটল জাতীয় তরকারী সোনাদুলির চরের মানুষ চোখে দেখে কম! খায় আরও কম, তার জন্য নগদ পয়সার দরকার। সিরাজ-দিঘার হাট না হলে পাওয়াও মুশকিল ছিল। কচু হিঞ্চের সঙ্গে খালবিলের পুঁটি মৌরলা চিংড়ি কিংবা শোল বোয়াল সিং কই পরম উপাদেয় মাছ হয়েছিল। অভাব আর জিভের আস্বাদের কাছে দই হার মানে বৈ কি। নকুড়ের বাপ থাকতে ওসব বাড়িতে ঢুকতো না বড় একটা। ছেলেমেয়েরা ধরেছে কোচর ভরে। পরের বাড়িতে দিয়ে এসেছে, কলাপাতায় করে রান্না মাছ নিয়ে এসেছে, লুকিয়ে খেয়েছে। নকুড়ও খেয়েছে, বাপ মরার পর অবাধ স্বাধীনতা। গলায় তুলসীর মালাটা ছিল, তাতে পুঁটি মৌরলার স্বাদ তেতো লাগেনি! আঁষের গন্ধে যে এত ক্ষিদে পায়, তা কে জানত।

আজকেও আঁষের গন্ধটা ছড়িয়ে গেছে একটু বেশী। নকুড়ের মোক্ষম ইন্দ্রিয়গুলি ওদিকেই ধাবিত হচ্ছিল। পুরো একটা ইলিশ মাছ এসেছে। কিন্তু হঠাৎ সে চমকে উঠল। কান খাড়া করল কথার দিকে। হঠাৎ একটা ছিদ্র পেয়েছে যেন কালনাগিনী লখীন্দরের বাসর ঘরে। এই ছিদ্র হচ্ছে, মেঘনাদের অন্ধকার রন্ধ্রে প্রবেশের মুখ। মেঘনাদের আসল পাল্লা, সেখানে তার ওজন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় মাপা আছে। অর্থাৎ মেঘনাদের টাকার অঙ্ক। সাহেবের কারখানা কেনার জন্য যার মন কেমন করে, তার কত টাকা থাকতে পারে, নকুর সে অধ্যবসায়ে মেতে উঠল। লাখ টাকার উপরে তো মেশিনেরই দাম! নকুড় তুলসীমালা খুঁটতে লাগল ঘন ঘন। মেঘনাদ বলল, দেখে-আসার আগেই শোনা গেল নিলাম হবে কারখানা। সব এক সঙ্গে নিলে বেশ সস্তাতেই হয়ে যাবে মনে হল। আর মেঘনাদের মনে এইটিই বড় সাধ। যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ হবে, সাহেব যা পারে, দেশের লোক তা পারবে না কেন? সাধনা থাকলে সিদ্ধি লাভ হয়, লালমিঞা বলত। নজর চড়িয়ে কাজ করতে পারলে দেশের কারখানাগুলিও সাহেবী কারখানার মত হয়ে উঠতে পারে। দেশী কারখানায় হাতের কাজে মাল নাই বেশী। সাহেবী কারখানায় এক চিমটি ময়দা নষ্ট হওয়ার উপায় নেই। একদিকে মেশিনে, আর একদিকে সাফাই। কি রকম সাফাই উঠতে বসতে ধোয়া মোছা। মাথায় হাত মোছা চলবে না। আর শয়তানি করলে চলবে না। লালমিঞা বলত, তুই এক শয়তান, তোর মাথার উপরে আর এক শয়তান। তারপরে ঈশ্বর। খবরদার! ভেজাল মিশিও না।

মায়ের কোল ধামসে ধামসে ছেলে বিস্কুট খেতে চাইবে। মা কিনে দেবে, সে বিস্কুট তৈরী হচ্ছে তোমার ঘরে। ছেলেকে বিষ খাওয়াবে! রোগে পড়ে আছে মানুষ। মেঘনাদের বিস্কুট খেতে চাইবে সে, তুমি শয়তানি করলে সে মরবে। খুন করে পয়সা রোজগার করবে? পাল্লা ঠিক রাখো, কাঁটা যেন এদিক ওদিক না হয়। লাভের দিকে যেন ঝোঁকটা বেশী না পড়ে। আবার বিস্কুট রুটি খাওয়াতে গিয়ে রসগোল্লা হাজির করো না। তা হলে ন্যায়ের কাঁটা এমন ঝুঁকবে, তোমাকে নিয়ে ঝুঁকবে একেবারে।

সাহেবী কারখানাগুলি এ নীতির অর্ধেক মানে। তাইতেই দেশের টাকা গল্‌গল্‌ করে চলে যাচ্ছে। দেশের মানুষ পূরো নামলে, গলগল্‌ ক'রে টাকা খাওয়া বন্ধ হবে। ছুটো টাকা ঘরে থাকবে, কিন্তু দোকান ব্যবসায়ীরা সিকি মানতে রাজী আছে কি না সন্দেহ। ভেজাল বিক্রি ক'রে ত'রে গেলে মা কালীর পূজো দিয়ে আসে।

সাহেবরা কি জাহু জানে! মন্ত্র পড়ে দেয় নাকি মালে। যেন খেলেই মানুষ ভুলে যাবে! মেঘনাদের সাহস ছিল, ইচ্ছা ছিল সে মেশিন নিয়ে কাজ আরম্ভ করবে। সিরাজদিঘার কারখানা এমনিতেই সে ঢাকায় সরিয়ে নেবে ভাব-ছিল। সাহেব-কারখানা নিলাম হবে শুনে বিপিনকে নিয়ে ঢাকা শহরে যাওয়ার উদ্যোগ করল। টাকার দৌড়ে পারবে কি না, সে তো পরের কথা। ডাকটা শুনে আসতে আপত্তি কি। একলা মেঘনাদের পক্ষে তো সম্ভবও নয়। অতবড় কারখানা, বিশ বিঘা জমি, বাড়ি, সাহেবের বাংলো, মেশিন। কিন্তু যাওয়া হল না।

এদিকে এই ব্যাপার। অন্যদিকে তখন দাঙ্গার ছুরি শানাচ্ছে গুণ্ডারা। যাওয়ার দিনেই লেগে গেল, ব্যাপার তো এই পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যে এখনো কি আছে!

মেঘনাদ নীরব হল, নকুড় মশগুল নিজের ভাবনায়। একলা নয়, মেঘনাদ দোকলা কিনতে চেয়েছিল সাহেবের কারখানা! অবশ্য নিলামে, তাই যদি হয়, নিলামে দশ টাকার মাল আড়াই টাকায় দাঁড়ায়। খদ্দের বেশী হলে কপাল ফিরতে পারে নিলামওয়ালার। বিস্কুট কারখানার খদ্দের আর কত হতে পারে। তাও অত বড় কারখানা, সাহস আছে ক'জনার।

তা'হলে কত? কত হতে পারে মেঘনাদের পুঁজি। পঞ্চাশ হাজার থেকে করতে হয়। আশি হাজার থেকে লাখখানেক! কিংবা তারও বেশী দেড় লাখ! মেঘনাদ সিরাজদিঘার অতবড় কারবারী, মরতে মরতেও লালমিঞা তাকে কিছু দিয়ে গেছে। হাত সামলালো নকুড়, খুটতে খুটতে তুলসী মালা ছিঁড়ে যাচ্ছিল প্রায়। আবেগ চাপতে পারল না নকুড়, হঠাৎ বলে উঠল, 'বেঁচে

থাকো বাবা, বেঁচে থাকো। মা লক্ষী মুখ তুলে চান তোমার দিকে। সাহেব কারখানার মত কারখানা তুমি যেন খুলতে পার। দেশে তোমার মান হোক। তুমি জন্ম জন্ম মাকে ইট পেতে বসাও। সা' বংশের শিরোমণি হবে তুমি। তোমার বাপ অনেক চেষ্টা করেছে। করে করে প্রাণটা-ই দিয়েছে। বলতে বলতে নকুড়ের গলা ধরে এল। বলল, আমি বড় শক্ত, পাথরের চেয়ে শক্ত। আমার প্রাণটা গেল না। এ বয়সেও বেঁচে থেকে অনেক কিছু দেখতে হচ্ছে আমাকে। নিজে কিছু করতে পারলাম না। ছেলেগুলি সা'বংশের কুলাঙ্গার হয়েছে। বিজাকে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। কুলি মজুর হয়ে গেছে। এই বস্তিতে বাস, অনন্তটার বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল। থাকলে কি হবে। এই কলকারখানার বাজার ওটাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে। বসন্তর কথাও শুনেছ বোধহয়। কি যে পাপ করেছিলাম। হে ভগবান, হে ভগবান!

মেঘনাদ কি রকম বোকা হয়ে উঠল। দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়াই তো উচিৎ। সে অনুভব করতে পারে। বলতে পারে না। কি যে বলতে হয়, সেটাই আয়ত্ব করতে পারেনি আজো। তার তামাটে মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল আরো। যেন, নিষ্ঠুর হয়ে উঠল তার মুখভঙ্গি।

নকুড়ের হাতটা নিসপিস করতে লাগল। মেঘুর হাত ধরতে চায় সে। পারছে না। লজ্জা করছে। তা' ছাড়া, মনটি তার পরিষ্কার নয়। এটুকু সে পরিষ্কার বুঝেছে। তবু, মেঘনাদের হাতে হাত ঠেকে গেল তার। বিদ্যুতের মত সে স্পর্শ। মেঘনাদের বলিষ্ঠ মূর্তিটাকে ভয়ও হয় নকুড়ের। বলল, এই অলক্ষীর ঘরে তুমি এসেছ বাবা। তোমার ছোঁয়ায় যেন এ ঘরে লক্ষী ফেরে। দেখে শুনে আমার সা'পুত্তুরদের যেন মন ফেরে। জানি না, এ অভাবের সংসারে তুমি কেমন করে থাকবে।...'

কে যেন চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল। চমকে উঠল নকুড়। চমকে ক্রুদ্ধ চোখে সে ফিরে তাকাল। উঃ, বড় ধ্বক্‌ধ্বক্ করছে বুকের মধ্যে! যেন সে কি এক বিরাট কার্যোদ্ধার করতে যাচ্ছিল। এক ভয়াবহ অমঙ্গলের

মত খিলখিল করে হঠাৎ বেজে উঠল হাসি। দেখল ঠুমি ঝুমির বুকে লুটিয়ে পড়ে হাসছে।

নকুড়ের কুঞ্চিত-চামড়া মুখ ভয়ংকর হয়ে উঠল। সে কি একটা বলে উঠতে গেল চেঁচিয়ে। সামলে নিল পরমুহূর্তে। সামলাতে গিয়ে কেশে উঠল ঘর্ঘরে গলায়। ঝুমি রয়েছে। ঝুমিও হাসছে। যদি সে রাগ করে। দাঁতহীন মাড়ি ঘষে খালি মনে মনে বলল, হারামজাদী ছেনাল!

মেঘনাদের গোঁফের দুপাশে গভীর দাগ পড়ে গেছে হঠাৎ। নকুড়ের জন্য সে ব্যথিত হয়ে উঠেছে। সে বলতে চাইছিল কিছু। বলতে চাইছিল, যদি সে এ সংসারেই থাকে, তাতে ভাববার কি আছে। খুব ভাল ভোগে, সুখে কিংবা সোহাগে তো কোনদিনই থাকেনি। অভ্যস্তও নয়। ওসবের বাড়াবাড়ি হলে তার অস্বস্তিই হবে। বিয়ের পর তাকে কেউ কোনদিন সামনে বসে খাওয়ায়নি। তার জন্য যে বিরাগ কিংবা অভিমান, সেটুকুও কোনদিন রপ্ত হয়নি জীবনে। লীলা গোড়া থেকেই সেটুকু না করে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। সে চিৎকার করে ডেকে বলেছে, 'আর দুটি ভাত চাই যে!' ভাত দিয়েও লীলার বসবার সময় হয়নি। কিংবা ইচ্ছে হয়নি। এখানে আসার চারদিন আগেও নিজের হাতে নিয়ে খেয়ে এসেছে মেঘু। এঁটো পরিষ্কার করে ফেলে রেখেছে থালা। একটি নমঃশূদ্র মেয়ে কাজ করত। সে ধুয়ে দিয়েছে। কেউ কোনদিন কোঁচানো কাপড়টি বাড়িয়ে দেয়নি হাতের কাছে। কাপড় ময়লা হলে হয় তো বিপিন বলেছে। অথবা আর কেউ। লীলাও বলেছে। হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে নাকে কাপড় চাপা দিয়েছে। 'উঃ!, কী গন্ধ!' বলে ঘরের থেকে ফরসা কাপড় এনে ছুঁড়ে দিয়েছে। বলেছে, 'ঘরে মেয়েমানুষ আছে সেটা মনে রেখ।'

মনে ছিল না নাকি? গদীতে বসতে গিয়েও তো বার বার মনে হয়েছে, আর একজন আছে সে বাড়িতে। সে ঝুমি! ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে যে ঘর সে তুলেছে, সেই ঘরে কে আছে সে ভুলবে কেমন করে। তবে সে যে ভোলে না, এটুকু জানতে দিতে চায় না সে নিজেকেও। তাকে বাড়িতে ডেকে যে

কেউ আদর আপ্যায়ন করেনি কোনদিন, তার জন্য সে অভিযোগ করেনি কখনো। কখনো কখনো একলা বাড়িতে ঝুমির অভাববোধ হলে সে হেসেছে হা হা করে। অভাব না হোক, অভাবহীনতার মধ্যে থেকেও তার জীবনে পরিবর্তন হয়েছে কতটুকু। তার কোন কষ্টই হবে না এখানে থাকতে।

মেঘনাদও ফিরে তাকাল তিলি লীলার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'হাসছ যে তোমরা? কি হল?'

তাতে হাসিটা বাড়ল আরো। তিলি বলেই ফেলল, 'তোমাকে দেখে।'

সত্যি তাই। তাকে দেখেই হাসাহাসি করছিল তারা দুই বোন। লীলা বলছিল, 'ওই ছাখ্, দেখছিস্ তো। নিজের কারবারের কথায় জামাই-শ্বশুর কেমন মেতে গেছে। এখন তুই হাজারবার এখান দিয়ে যাতায়াত কর, তোকে চোখেও দেখতে পাবে না। এ বাড়িতে আগুন লাগলেও টের পাবে না।'

তিলি আবার সেটুকু পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছে। বারকয়েক সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে। মেঘুর খেয়াল হয়নি। মুড়ি খেতে খেতে কখন মেঘুর থালা খালি হয়ে গেছে, সে টের পায়নি। খালি থালাটাই হাতড়েছে বারকয়েক। তিলি বলেছে, 'আহা, বেচারীর আরো দুটি মুড়ির দরকার ছিল গো দিদি।'

লীলা বলেছে, 'তোর মুণ্ডু। ওকি খিদেয় খাচ্ছে নাকি? কি খাচ্ছে সেই খেয়ালই নেই। দশ থালা দিলে তাই খেয়ে নেবে।'

তিলি গিয়ে খালি থালাটি তুলে নিয়ে এসেছে। মেঘু টেরও পায়নি। তখন থেকে দুই বোন হাসাহাসি করছে।

মেঘনাদও হেসে উঠল। নিঃশব্দ হাসি। সে হাসিতে তার মুখটা বোকা বোকা দেখাতে লাগল।

তিলি হঠাৎ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তোর লোকটাকে কিন্তু দিদি ভালমানুষই মনে হচ্ছে।'

লীলা বলল, 'হ্যাঁ কি রকম ভাল, সে ঘর করলেই বুঝতে পারবি।'

ওদিকে বিজয়ের চীৎকারে কান পাতা দায়। সে একাই একশো। মাছ কুটে এখন আবার বাটনা বাটতে বসেছে। এতক্ষণ কারখানায় খেটে এসেও তার ক্লান্তি নেই। মা বউ দাঁড়িয়ে আছে সামনেই। উনুনে তেল ফুটছে। অন্যান্য ঘরণী পাশাপাশি যারা রান্না করছে, তারা সবাই হাসছে বিজয়ের কাণ্ড দেখে।

এটা রসাধিক্যের ব্যাপার নয়। বিজয় মানুষটি একটু ওইরকমই। হেঁকে ডেকে চেঁচিয়ে, প্রাণ খুলে দশটা কথা বলে, দু ঘা মেরে, পাঁচটা গালাগাল দিয়ে চলে সে। বাটনা বাটতে বাটতেই মনে মনে হাসছে আর আপন মনে বলে চলছে, 'কি করব। কপাল! শালা এমন মেয়ের সঙ্গেই বাপ মা বে' দিয়েছে, উনি আবার মিস্তিরির বউ হতে পারবেন না। গলায় কণ্ঠী বোষ্টম আর মুদী হলেই উনি ভাল বাটনা বাটতে পারতেন।'

বলে আড়ে আড়ে দেখছে বউয়ের মুখের দিকে। সে বেচারী ঘোমটার আড়ালে এতক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ছিল। এবার নিঃশব্দে জুড়েছে কান্না।

সুকুমারি ভাবছিল অন্যরকম। এক তো তিলির গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো ভাল লাগছে না। কে জানে, দুটিতে গলাগলি করে, ছেনালের মত হেসে গলে কি ফুস্ ফুস্ ওজগুজ করছে। তার উপর বিজয়ের এই কাজ। সুকুমারি জানে। এসব হচ্ছে বউকে কাজের চাপ থেকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য। খেতে জোটে না, শুতে রাঙ্গা পাটি। হারামজাদা বোনাইয়ের জন্য সোহাগ করে ইলিশমাছ নিয়ে এসেছে। এখন বউয়ের সোহাগে বাটনা বাটতে বসেছে। লজ্জা করে না!

কিন্তু প্রাণ খুলে চেঁচাতে পারছে না আজ সুকুমারি, শত হলেও জামাই রয়েছে। অনেক দিনের হলেও জামাই তাদের কাছে নতুনই।

ঘরের মধ্যে তিলি বলল মেঘুকে, 'তুমি যে ওখেনেই খুঁটি পুঁতে বসলে। এস, দেখে যাও তোমার শালার কীর্তি।'

মেঘনাদ উঠে এল। দুই বোনের সঙ্গে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বিজয় হো হো করে হেসে উঠল। এতক্ষণ সে আপনি আপনি বলেছে মেঘনাদকে। এবার তুমি করে বলল। বলল, 'দেখছ তো, কি রকম সংসার করি? ওই যে

দেখছ ঘোমটা ঢাকা তোমার শালাজটি, ওসব ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা। শালা ভাজার মাছ এপিট ওপিট করে খায় ঠিক।'

বলেই খ্যাল খ্যাল করে হাসি। তার পরেই গাঁক করে উঠল, 'এই ঠুমি পেত্নী বনুইকে তেল গামছা দে। রাত জেগে এসেছে, লোকটা খাবে শোবে না?'

তিলি বলল, 'তোকে আর বলতে হবে না সে কথা। কোথায় নিয়ে যাবি নাইতে? জংলা পুকুরে?'

বিজয় বলল, 'তা ছাড়া আর কোথায় যাব? গতর খাটিয়ে যদি জল তুলে রাখতিস্ কলের, তাহলে না হয় বাড়িতেই হ'ত।

মেঘুকে বলল, 'পুকুরে নাইতে পারবে তো?'

মেঘনাদ বলল, 'নদী পুকুরেই তো চিরকাল নেয়ে আসছি। কলের জল কি সইবে?'

'তাই বল!' বলে, বাটনা বাটা শেষ করে উঠল বিজয়। লীলাকে বলল, 'তুইও চল্, নেয়ে আসবি।'

তিলি বলল, 'তবে কি তোরা একলা যাবি? আমরা দুজনেই যাব।'

চারজন চান করতে চলে গেল। সুকুমারি জ্বলন্ত চোখে ফিরে তাকাল বউয়ের দিকে। একটা খালি বালতি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কলে গিয়ে ভাজা লাগাও, সংএর মত দাঁড়িয়ে থেকো না।'

কাঁখে ছেলে, হাতে বালতি নিয়ে বউ চলে গেল রাস্তার দিকে। তখনো চোখে তার জলের দাগ। কাপড় খসে গেছে অর্ধেক বুক থেকে। ফাটা ফাটা নীল শিরবহুল দুধোলো স্তন বেরিয়ে পড়েছে একটি। ছেলেটি মুখ ঘষছে সেখানে। ঘোমটা উঠে গেছে অনেকখানি। কলে এসে রোদ মাথায় করে দাঁড়াল। জলকলের চারপাশে বালতি কলসী ছড়ানো। জল পেতে অনেক দেরী।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, অদূরে গাছতলায় গিয়ে বসল সে। মাথায় কাপড় রেখে, বুক দুটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে ফেলল। তারপর ছেলেকে মাই খাওয়াতে খাওয়াতে

গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাকাল উত্তর দিকে। ওদিকেই জংলা পুকুর। যেখানে বিজয় গেছে চান করতে।

সুকুমারি এসে দাঁড়াল নকুড়ের কাছে। একবার চোখাচোখি হল পরস্পরের। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নকুড় বলল, 'ব্যবসা করার মতলবেই এসেছে। ঠিক বুঝতে পারলাম না, অবস্থা কি রকম।'

সুকুমারি এদিক ওদিক দেখে বলল, 'ঠুমিটাকে পার টার করা যাবে মনে হচ্ছে ?'

নকুড় ভ্রূ কাঁপাল খানিকক্ষণ। বলল, 'তা যেতে পারে। মেঘু দিতে পারে কিছু। কিন্তু তোমার মেয়ে—'

লীলার কথা বলছে নকুড়।

সুকুমারির ভ্রূ কুঁচকে উঠল। সে ঠিক কালো নয়। খানিকটা মাজা মাজা রং। ছেলেমেয়েরা কেউই প্রায় তার রং পায়নি বোঝা যাচ্ছে। অনেকটা পেয়েছে বোধ হয় তিলি। সীঁথি বরাবর চুল উঠে টাক পড়েছে তার। কপালটা চওড়া। সীঁথিতে কপালে সিঁদুর মাখা। নকুড়ের মতো তারও সারা মুখে কুঞ্চনরেখা ভরতি। বয়স হলেও শরীরের বাঁধুনি বেশ বলিষ্ঠ সুকুমারির। চোখ বড় করে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'মেয়ে আমার, তোমারো। জানিনে জামাইয়ের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক। নিজের মেয়ে হলেই বা কি। ভাবভঙ্গি বাজারের ছেনালের মতো। ওর চরিত্র ভাল নেই, আমার মন গাইছে। দেখে নিও তুমি। ওর কথায় যে জামাই চলে, তা আমার মনে হয় মা। মনে নেই, এ মেয়ের কথা ?'

চকিতে একবার চোখাচোখি হ'ল নকুড় সুকুমারির। দুজোড়া চোখ আবার ঘুরে গেল চারদিকে। নকুড়ের মনে পড়ল সোনাদুলি চরের সেই সব কথা। লীলার কথা। বলল, 'মনে আছে। ওর কি দোষ বল। কিন্তু জামাইয়ের সঙ্গে…কি জানি, কি রকম ওদের ব্যাপার।'

সুকুমারি হঠাৎ বলল, 'কোন পাপ করছি কি আমরা ? মাথার উপরে ভগমান আছেন।'

নকুড়ের গলার শিরগুলি কেঁপে উঠল। তুলসী মালাটাও উঠল নড়েচড়ে।

বলল, 'কোন দিন পাপ করিনি, অভাব, তাই জামাইয়ের পিত্যেশী। এতে পাপ কি করলাম বল ?

সুকুমারি যেন খপিসের মতো তাকাল নকুড়ের দিকে। বলল, 'তুমি যে বলেছিলে, মেঘুর সঙ্গে ব্যবসায় নামবে। তোমার তো টাকা নেই কোন কালেই। মাছের তেলেই মাছ ভাজবে, এই তো তোমার মতলব। সেই কথা বলছি।'

নকুড় বলল, 'ওর নামই হল পিত্যেশ করা। আমি কি আর ছিনিয়ে নেব, না, চুরি করব ? চুরি তো করব না। আর চেয়েচিন্তে যদি কিছু পাওয়া যায়। মেয়েটার একটু মায়া মমতা থাকলে, ওর হাত দিয়েও কিছু আসতে পারে।

সুকুমারি বলল, 'সে গুড়ে বুঝি বালি। কথাবার্তার ধরন ধারনই আলাদা। তবে হ্যাঁ, একটা লক্ষীমন্ত মানুষ যখন ঘরে এসেছে, কিছু হতে পারে।'

এ শুধু আজকের কথা নয়। যেদিন প্রথম মেঘনাদের চিঠি এসেছে, সেদিন থেকে একথাই ফিসফিস্ গুজ্ গুজ্ করে আসছে তারা। সিরাজদিঘার একজন গদীর মালিক আসছে। প্রতি মুহূর্তে নিজেদের যে জীবনকে তারা ক্লেদাক্ত মনে করেছিল, ঘৃণা করছিল নিজেদের, সে সময় হঠাৎ যেন একটু আশার আলো দেখা দিল। যেন সোনার ড্যালা পেয়েছে। এক চিমটি ভেঙ্গে নিতে পারলেই লাভ। ফাঁক পেলেই ধারালো যন্ত্র দিয়ে চাছতে হবে সোনার পাতটাকে।

হঠাৎ নকুড় বলল, 'বড় হতভাগ্য আমি।

তার গাঢ় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলার স্বরে চাপা ব্যথা ফুটে উঠল। এরকম কতই বলে। কত সময় বলে। সুকুমারির মনে দাগ কাটে না। আজ হঠাৎ সুকুমারির মনে লাগল কথাটা। বলল, 'কেন ?'

নকুড় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'কোন দিনই কিছু করতে পারলাম না। আমার বাপ তবু তার বয়সকালে মুন্সীগঞ্জের হাটের গদীতে দুদিন বসতে পেরেছিল। আমি চিরকাল সোনাদুলি চরের অপয়া দোকানটার তক্তপোষে বসে ছারপোকার কামড় খেয়ে মলাম।'

এসব স্থকুমারির শোনা কথা। বিয়ে হওয়ার পর এসে আর চোখে দেখেনি কোনদিন। শুনেছে, মুন্সীগঞ্জে দাদা-শ্বশুরের জমজমাট ব্যবসা ছিল গুড় আর তামাকের। তার শ্বশুর, নকুড়ের বাবাও যৌবনে মুন্সীগঞ্জ যাতায়াত করেছে। সে ব্যবসা রসাতলে গেছে অনেক দিন। নানান কারণে গেছে। তার মধ্যে এক কারণ, তার শ্বশুরের চরিত্রহীনতা।

স্থকুমারি একটু ঘন হয়ে বসল নকুড়ের কাছে। কেউ দেখলে হয় তো অবাকই হবে। কোনদিন এভাবে তাদের বসতে দেখেনি কেউ। স্থকুমারি বলল, 'দেখলাম তো চিরকাল, একপাড় ভাঙ্গে, আর একপাড় গড়ে। দেখ, হয়তো আবার গদীতে বসতে পাবে।'

'অ্যাঁ, কি বলছ?' চমকে উঠল নকুড়। আবার গদীতে বসতে পাবে সে। আবার কেন, বলতে গেলে সে-ই তো প্রথম বসা হবে তার জীবনে।

স্থকুমারি আবার বলল, 'সব সময় তো আর চেয়ে চিন্তে খেটে লক্ষ্মী হয় না। বুদ্ধিও খাটাতে হয়। ভাব, দেখ, কি হয়।'

এক মুহূর্ত নীরব। হঠাৎ আবার বলে উঠল স্থকুমারি, 'টাকা পয়সা সব কিভাবে রেখেছে মেঘু, কে জানে? খোলা রেখে যায়নি তো?'

নকুড় আবার চমকে উঠল, 'অ্যাঁ?'

মনে মনে ভাবল, ফেলে রেখে যাবে! মানে পঞ্চাশ হাজার, কিংবা এক লাখ অথবা দেড় লাখ। এ বস্তিতে!

আচমকা ঢং করে একটা শব্দ হল। দুজনেই চমকে উঠল। দেখল, দরজার কাছে বিজয়ের বউ। জলভরা বালতিটা নামিয়েছে সিঁড়ির উপর, কোলের উপর ছেলেটা এলিয়ে পড়েছে ঘুমে। ঘুমন্ত আকড়ে ধরে আছে মায়ের বুক। বউ হাঁপাচ্ছে বালতিটা এনে। কি রকম ধড়ফড় করছে বুকের মধ্যে। স্থকুমারি হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল। এ ঘরের পাশেই, কোণের ঘরটা আপাতত ভাড়া নেওয়া হয়েছে মেঘুর জন্য। দেখল, মস্তবড় তালা আঁটা রয়েছে কড়ায়। মনে পড়ল, ঝুমি ঠুমি হাতে হাতে জিনিসপত্র তুলেছে ওই ঘরে। তারপর কখন তালা বন্ধ করে রেখেছে।

সে আবার এল এ ঘরে। বউ তখনো দাঁড়িয়ে। বলল, 'ছেলেটাকে ধর তো মা, বালতিটা নিয়ে যাই।'

সুকুমারি ছেলেটাকে নিয়ে শুইয়ে দিল মেজেয়। বউ বালতি নিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

সুকুমারি সহজ গলায় বলল, 'তালা দিয়ে গেছে ঘরে।'

যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাসই পড়ল নকুড়ের। বলল, 'ওঃ বেশ, ভাল।'

সুকুমারি বারান্দার দিকে একবার দেখে বলল, 'তুমিও নাইতে যাও।'

বউকে ডেকে বলল, 'বালতিটা ভাজা রেখে এসো আবার জালায় জল ঢেলে। নইলে আবার জলের কম পড়ে যাবে।'

বউ খালি বালতি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খেতে বসতে গিয়ে মেঘনাদ বলল, 'চালিস না কি সেই ছোঁড়ার নাম। গেল কোথায়। খাবে তো?'

এতক্ষণে খোঁজ পড়ল চালিসের! তিলি এসে দেখল, পিপুলতলা খালি। বলল, 'এখানেই তো ছিল।'

চেঁচিয়ে উঠল বিজয়, 'সে শালাকে যে আমি বড় রাস্তার দিকে যেতে দেখেছি গো। ঠিক আছে, ওরটা রেখে দাও। এসে খাবে'খন লবাবজাদা।'

বিজয়ের খাওয়া হয়ে গেল আগেই। তার আবার তাড়াতাড়ি। ওয়ার্নিং বাঁশী বেজে গেছে। সে উঠে পড়ল। উঠে পড়েই চীৎকার করে গান ধরে দিল।

কালো বলে মোরে
চেয়ে দেখলে না,
ফের সোহাগ করলে
রা' কাড়ব না।

তিলি বলে উঠল, 'বেহায়া কোথাকার।'

বিজয় বলল, 'লে লে, শালা পেট ভরে খেয়ে উঠেও গাইব না, তবে গাইব কখন?' বলেই আবার হাঁক, 'কই মাহীন্দরদা, হল?'

জবাব এল আর এক ঘর থেকে, 'এই যে, পাতলুনটা পরে নিচ্ছি।'

বিজয় খেয়ে ঘরে এল। নকুড় চান করতে গেছে। মা কোণের ঘরে। ওখানে খেতে বসেছে মেঘনাদ। মিটিমিটি হাসছে সে বিজয়ের গান শুনে। ঠুমি ঝুমি বারান্দায়। বারান্দাটাই অবশ্য সারাদিনের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। বউ বসে আছে ঘরে। এবার সে চান করতে যাবে। তারপর খাবে। কতই বা বেচারীর বয়স। আঠারো থেকে উনিশে পড়েছে হয় তো। এর মধ্যেই জট পাকিয়েছে চুলে। তেল জোটে না রীতিমত। তাছাড়া, কেমন যেন দিশেহারা সব সময়। কখন যে কি করবে ভেবে পায় না। খালি বিজয়কে চেয়ে চেয়ে দেখবে। ফাঁক পেলেই দেখবে চেয়ে আর ঠোঁট ফোলাবে। এদিকে শান্ত শিষ্ট। দশ চড়ে রা' নেই মুখে। কিন্তু বিজয়কে কাছে পেলেই চোখ মুখের চেহারা বদলে যায়। যেন মমি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

বিজয় ঘরে এসে তেল চিটে হাফ প্যাণ্টটা পরতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল, তুই চান করিসনি ?'

বউ নিরুত্তর। অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। বিজয় কাছে এসে একেবারে বুকে টেনে নিল। বলল, 'রাগ হয়েছে বুঝি আমার উপর। আরে লে লে, বন্ধুই এসেছে, তাই অমন দশটা কথা বলেছি।'

বউয়ের তাতেও মুখে কথা নেই। কথা সে বলেই কম। চেয়ে থাকে বেশী। বড় বড় শান্ত ছুটি চোখ। খরতা নেই, তীব্রতা নেই। মাঝে মাঝে বিজয়ের পাল্লায় পড়ে চোখে ঝিকিমিকি করে ওঠে বিচিত্র আলো। বিজয় জাপটে ধরতে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল সে। ফিস্‌ফিস্ করে একবার বলেও ফেলল, 'কি হচ্ছে, বা রে !'

চকিতে একবার বারান্দার দিকে দেখে, জাপটে ধরে বউকে চুমু খেয়ে ফেলল বিজয়। এটি বিজয়ের যেন স্বভাব দোষের মধ্যে পড়ে। ফাঁক পেলেই হল। চুমু খেয়ে ঠেলে দিয়ে বলল, 'যা, যা, নাইতে চলে যা। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে এখন।'

হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে ভ্রূ বাঁকিয়ে তাকাল বউ। ঠোঁট ফুলে উঠল অভিমানে। তবু গতি পেল এতক্ষণে। চোখ নামিয়ে, গামছা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিজয় আবার এক হাঁক ; 'মাহীন্দরদা, হল ?'

জবাব এল রাস্তা থেকে, 'অনেকক্ষণ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি য্যা।'

কারখানার জামা কাঁধে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বিজয়।

জংলা পুকুরে যাওয়ার পথে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল বউ। তাকিয়েছিল রাস্তার দিকে। বিজয়কে দেখবে বলে। একটু পরেই বিজয়কে দেখা গেল মহেন্দ্র মিস্তিরির সঙ্গে।

অনেকখানি দূরে। সে দেখতে পাচ্ছে। ওদের নজরে আসার কথা নয়। তবু আনমনে খসা ঘোমটা টেনে দিল বউ। ভ্রূ বেঁকে উঠল। ঠোঁট ফুলল। যেন দেয়লা করছে। তবু ঠোঁটের কোণে কোণে একটু হাসির আভাস।

বিজয় চলেছে বিড়ি খেতে খেতে, বক্‌বক্ করতে করতে। হঠাৎ বাঁশী বেজে উঠল কারখানার। গাছতলায় চমকে উঠল বউ। বিজয় ততক্ষণ দৌড়ুতে আরম্ভ করেছে।

বউ তবু দাঁড়িয়ে রইল। বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক। অনেক দুঃখ, দৈন্য। উপবাসের যন্ত্রণাও ভোগ করেছে এদুবছরের মধ্যে। সে যে অষ্টপ্রহর বিজয়কে কাছে চায়, তা নয়। তবু দিবানিশি যেন প্রেমে থরোথরো। যেন গুপ্ত প্রেমলীলায় মেতে আছে সে। নিজের মনকে সে চেনে কম! যে বাড়িতে সে বউ হয়ে এসেছে, সে বাড়ির কাউকে সে মন দিতে পারেনি। মাঝে মাঝে তিলিকে ভাল লাগে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে। কোথাও তার কোন অভিযোগ নেই। রাগ অভিমান যা কিছু, সব বিজয়ের উপর। তাও যে সে কখন করে, কি ভাবে করে, সেটুকু বিজয় বোঝে শুধু। বলতে হয় না। তার চলা দেখলে বিজয় বোঝে। অনেক সময় বউ নিজেও বোঝে না।

উনিশ বছরের দেহ তার ভেঙ্গেছে অনেক। উনিশ বছরের মনটুকু বাঁধা

তারের মতো টং টং করে বাজে। ওইটুকু সে দিয়েছে বিজয়কে। দিয়ে, সব হারিয়ে বিজয়ের ধ্যানে মগ্ন। যে ভালবাসাকে বলে মরণ, এ সেই ভালবাসা। হৃদয়ে তার বিচিত্র তীব্রতা। রক্তে রক্তে তার অনেক সুরের আগুন। কিন্তু তাকে দেখে যেমন তা বোঝা যায় না, সেটুকু বোঝে না সে নিজের সম্পর্কেও।

আর বিজয়, সেও যেন এক তীব্র গতি সর্পিল নদী। অদ্ভুত তার প্রাণচাঞ্চল্য। বুদ্ধিতে খুব দড়ো নয়। হৃদয়ের দরজাটা ভেতরে বাইরে হাট্ করে খুলে রেখেছে। সেখানে এক কোলাহলমুখর হাট বসিয়ে রেখেছে। চলতে ফিরতে হাঁক ডাক। সবাইকেই, মা বাবা বন্ধু বউ, কেউ বাদ নেই। আবার, কারখানা থেকে ফিরে, হাত ধুতে যাওয়ার ফাঁকেও, সুযোগ পেলে একটু সোহাগ করে যাবে বউকে। বউ বেচারী ভয়ে ও লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে থাকে। যেন, চালাক ছাগলছানাটা এদিক ওদিক দেখে, আর বেড়া ডিঙ্গিয়ে টুকটাক্ ঘাস খায়। এমনি তার ভাবখানা। ওটা তার প্রাণচঞ্চল প্রবৃত্তি। বউ ভয় পায়, রাগ করে। তারপর কেন যেন ভাল লাগে।

চলতে ফিরতে এত। লোকের চোখে কি আর পড়ে না। এ বাড়িশুদ্ধ সবাই বিজয়ের বউ-সোহাগ নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে। রাগ করে কেউ। সুকুমারি তো জ্বলে যায়। সেইজন্যও বউয়ের উপর বড় বীতরাগ সে। ঘৃণাও করে।

কেবল তিলি বলে, 'মাগো! কী রাক্ষুসী তুই। সোহাগ খেতেও পারিস্।' তিলি বোঝে ব্যাপারটা। কিন্তু বউ হা করে তাকিয়ে থাকে। কি বলবে সে! সে কি করবে। তখন কাঁদে।

বিজয় বলে সব কথার শেষে, 'লে লে···।'

বিজয় চলে গেছে। বউ দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। মনটা যেন দৌড়ুচ্ছে বিজয়ের পায়ে পায়ে। এতক্ষণে সে কোথায় গেল। কারখানার গেটে গেছে কি?

'কে গো!'

পেছনে গলার স্বরে চমকে ঘোমটা টেনে দিল বউ। পাড়ার এক বুড়ো চান করে ফিরছে। বুড়ো বলল. 'বিজে'র বউ ? দাঁড়িয়ে কেন ?'

জবাব নেই। কথা বলবে নাকি বউমানুষ ? তা নয়। বলল বুড়ো, বলতে হয়। বলে চলে গেল। বউ তাড়াতাড়ি পুকুরের পথ ধরল। ছেলেটা আবার জেগে উঠবে।

জলে নেমে তার মনে পড়ে নতুন অতিথিদের কথা। ভাবনাটা আপনি মনে এসে পড়ল তার। কেমন যেন ভয় ভয় করছে তার সকাল থেকে। বিশেষ করে লীলাকে দেখে। কেন তা সে জানে না। আর মেঘনাদ যে কেমন, তা এখনো সে চোখেই দেখেনি। এই আসা, কথা, হাসি, ব্যস্ততা সব মিলিয়ে তার কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। তার মনে হচ্ছে, এক বিজয় ছাড়া আর সকলে যেন বদলে গেছে। বিশেষ শ্বশুর, শাশুড়ি।

ঘুম ভেঙ্গে গেল মেঘুর। সেই কোণের ঘরটায় শুয়েছিল। দিনের বেলাও ঘরটা কেমন অন্ধকার থাকে। যদিও দুটি জানালা আর একটি দরজা আছে। খোলাও রয়েছে সবই। তবু তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ঘামে।

ঘুম ভেঙ্গে হতচকিত হয়ে তাকাল সে। এ কোন্ ঘর! কার ঘর! কোথায় এসেছে সে।

সব যেন ভুলে গেছে। মনে নেই কোথায় এসেছে। চোখ রগড়ে তাকাল। নজর গেল জানালা গলিয়ে। অপরিচিত একটি উঠোন। সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত, শুধু গামছা পরা একটি মেয়ে-মানুষ। কাঠের পাটাতনের উপর কাপড় আছড়াচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এক একবার একটু দাঁড়াচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। আবার আছড়াচ্ছে। খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। বুক দুলছে তালে তালে। কাছের বারান্দাটিতে শুয়ে আছে কয়েকজন মেয়ে আর শিশু। রোদ নেই। কিন্তু তাত আছে। কোথা থেকে যেন গলে গলে পড়ছে তাত। রুদ্ধশ্বাস গুমসোনি।

পাশের ঘরের সঙ্গে টিনের পার্টিশন্ দিয়ে আলাদা এই ঘর। পাশের ঘরে রকমারি মেয়ে গলা শোনা যাচ্ছে। কথার সঙ্গে কিছু হাসি। প্রথমে লীলার গলাটাই চিনতে পারে মেঘু। তারপর মনে পড়ে বিজয়কে। মনে পড়ে কোথায় এসেছে সে।

বুকের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা হঠাৎ জেগে উঠল ফিক্ ব্যথার মতো। এই নতুন জায়গায় এসে, দেখা শোনায়, কথায় কথায় একটু যেন বাতাস লেগেছিল প্রাণে। দুঃস্বপ্নের মতো এ ঘুমের মাঝে সে বাতাসটুকু উধাও হয়েছে কখন। সেই বিয়ের বাঁশীটা বেজে উঠেছে আবার। সে গালে হাত দিয়ে বসল।

বাবা মারা যাওয়ার পর একদিন এমনি করেই গালে হাত দিয়ে বসেছিল সে। পেছনে ছিল বাতাসে দোলা ঘন বেত-বন। সামনে প্লাবিত মাঠ আর অসীম আকাশ। মনটা হাত-পা ছড়াবার জায়গা পেয়েছিল। আজ মনে হল, এখানে হাত-পা ছড়াবার জায়গাটুকুও নেই।

ভাগ্য যেন এক গোলক ধাঁধার সিঁড়ি। কোথাও অন্ধকার অতল গহ্বরে সে নেমে গেছে। কোথাও উঠেছে এঁকেবেঁকে। সেই ওঠার মুখের, দুধারের চাপা দেয়ালে ঘুলঘুলিতে আলোর রেশও দেখা যায় থেকে থেকে। মনে হয়, এবার সেই অবাধমুক্ত আলোর রাজ্যে এসে জুড়িয়ে যাবে মনপ্রাণ। না জুড়োক, কপালের ঘাম মুছে বলা যাবে, কত সুখ আছে জীবনে জানিনে। বড় স্বস্তি পেলাম।

কিন্তু তারপরে দেখা যায়, সিঁড়ি সোজা ওঠেনি। সোজা ওঠা তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কখন বাঁক নিয়ে সুদীর্ঘ চোরা উৎরাইয়ের মতো সে আবার নেমে গেছে এঁকেবেঁকে।

আজ সেই চোরা উৎরাইয়ের পথে পড়েছে সে। সেদিনের কিশোর আর আজকের মেঘনাদের মধ্যে তফাৎ নেই। আবার সুরু। আবার সুরু এই রুদ্ধশ্বাস ছোট্ট ঘরটির মধ্যে। যেখানে হাত-পা ফেরাবার জায়গা নেই। এই অন্ধকারে, এখানে বসে কোন আশা মনে আসে না। চোখে পড়ে না এক কণা আলো। শুধু পেছনের ফেলে আসা সিঁড়িগুলির জন্য প্রাণটা মাথা খোড়ে

অসহ্য যন্ত্রণায়। চোখের সামনে ভাসে শুধু ধলেশ্বরীর তীর। পাল তোলা নৌকার সারি। সিরাজদিঘার হাট, গদী, কারখানা, বাড়িঘর, নৌকা।

আজ সে সত্যি ধনপতি সদাগর। তার সব ছিল। সব ডুবেছে। কোথায় মুখ লুকিয়ে বসে আছে লক্ষ্মী। খুঁজতে যেতে হবে তাকে। তার বর পেলে, আবার ভেসে উঠবে সব। ভেসে উঠবে নতুন চেহারায়। সামনের ময়ূরপঙ্খী গলুই সোনা হয়ে উঠবে। সোনা হয়ে উঠবে পেছনের হাঙ্গরমুখো গলুই। পাশে খেলবে সোনালী জেল্লা।

কিন্তু আবার কোন্ ঘাট থেকে যাত্রা করবে সে? কোন্ পথে খুঁজবে? একদিন অবন্তির ঘাট থেকে যাত্রা করেছিল। ডেকে নিয়ে গেছল তার বাবা। অনেক খুঁজে খুঁজে সিরাজদিঘার সপ্তসিন্ধুপারে ডিঙ্গা মিলেছিল।

আজ কোন্ ঘাট থেকে যাত্রা সুরু হবে! পাশের ঘরে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল মেয়েরা, চমকে উঠল সে। অনেকদিন আগের লক্ষ্মণসা'র অন্দরমহলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ঝুমির গলাটি সবচেয়ে চড়া।

নজর পড়ল সামনের জানালায়। কাপড় কাচছে না। মেয়েমানুষটি উবু হয়ে পড়েছে পেটে হাত দিয়ে। পেটের পাশ থেকে একটা শীর্ণ পেশী কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক পর্যন্ত। শুন্যে দোলা বুক ব্যথায় কুঞ্চিত বিস্তৃত হচ্ছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। জন্ম থেকে জীবনবৃত্তান্তটুকু লেখা রয়েছে যেন সারা দেহে। অনাহার, খাটুনি, প্রসব ও অতৃপ্তি। আজ ভারবাহী বৃদ্ধা গর্দভী। রক্তহীন শিরে শিরে শুধু ব্যথা। একটু কমবে, আবার কাজ।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মেঘনাদ। কী অসম্ভব ছোট্ট ঘর! দম বন্ধ হয়ে আসছে। দাঁড়ালে মাথা ঠেকে যাবে। আকাশ জোড়া ঝরপড়া মেঘের গুমসোনি। গুমসোনি মনের মধ্যে।

আধো অন্ধকারে হাতড়ে দেখল সে পাকানো বিছানাটা। তার আড়ালে স্টিলের একটি মাঝারি ক্যাশবাক্স। মেঘনাদের সর্বস্ব আছে ওই বাক্সে। সপ্তসিন্ধু পাড়ের পারানি। আর এই দেহ তো আছে। আর একটি পেতলের বাক্স আছে। সেটি ঝুমির। ওইটিতে আছে ঝুমির

অলঙ্কার। কত টাকার অলঙ্কার আছে, তার সঠিক হিসাব নাই মেঘনাদের। গদীর বাইরে, নিজ ব্যয়ের খতিয়ানে তার হিসাব আছে। দুর্দিনে, এটুকু পাওয়া যাবে কি না, তা জানে ঝুমি। দেওয়া না দেওয়া তার ইচ্ছা। দেওয়া না দেওয়া যে একদিন মেঘনাদেরও ইচ্ছা ছিল!

স্টিলের ক্যাশবাক্সটি সরিয়ে রাখল সে। মনে পড়ল, চালিসের কথা। চালিসের সঙ্গে একটু গল্প করার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করে উঠল। গুনোহাটির বদরুদ্দিনের সংবাদ একটু শোনা যাবে ওর কাছে! গুনোহাটির বন্দরের কথা, কাজের কথা, দেশের মিস্তিরিদের কথা। তবু ভয় হয়। বদরুদ্দিনের ডুবে যাওয়ার কথা সে শুনবে কি করে। ডুবে যাওয়ার সংবাদ যে বড় ভয়ংকর। যে পাড়ি দেয়, অতল জলরাশি তাকে হাতছানি দেবে শুধু ডোবার জন্য। খালি মনে হবে, এই পথে, এমনি করে বদরুদ্দিন ডুবেছে। যাক্, সেকথা থাক। অন্য কথা শুনবে সে। গুনোহাটির মহাজনদের গল্প। তবু একবার চালিসকে দেখবার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। যেন ওকে দেখলে, একটু শান্তি পাবে সে।

উঠোনের মেয়েমানুষটি আবার উঠেছে। কোমর থেকে খসা গামছাটি জড়িয়েছে। বুকে এক চিলতে ন্যাকড়া ঢেকেছে। কাচা কাপড়গুলি সব তুলে নিয়েছে ঘাড়ে। কাকে যেন ডাকছে, 'একটু সঙ্গে চল্ জংলা পুকুরে। ধুয়ে ধুয়ে দেব, নিয়ে আসবি।

মেঘু বাইরে এসে পাশের ঘরে গেল। মেয়েদের নিরঙ্কুশ জটলা বসেছে। মৌচাকের মতো। মক্ষীরাণীর মতো বসেছে লীলা। সবাই পাড়ার বউ ঝি।

নকুড় একপাশে ঘুমোচ্ছে। অন্য পাশে বিজয়ের বউ ও সুকমারিও নিদ্রামগ্ন।

মেঘনাদকে দেখে জটলা থতিয়ে গেল একটু। তিলি বলে উঠল, 'একি, ঘুম হয়ে গেল?'

মেয়েদের সামনে মেঘনাদ একটু বিব্রত বোধ করে চিরদিন। একটু বেশী বোকা হয়ে ওঠে যেন।

হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'বড় গরম।'

তিলির ভেজা চুল এলানো। আড্ডায় বসে বেশবাস একটু অগোছাল। লীলার দিকে একবার তাকিয়ে হেসে বলল, 'ডাকলেই পারতেন। বাতাস করতাম গিয়ে।'

মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলে মেঘনাদ। ভেবে বলে না। আপনি এসে পড়ে মুখে। বলল, 'চিরদিন গাছতলার বাতাসে আরাম করেছি। পাখার বাতাসের কথা মনে থাকে না।'

সবাই হেসে উঠল। লীলা আশ্চর্য রকম লজ্জাভরে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে একটু। বোধ হয় নতুন জায়গায়, নতুন মানুষের মধ্যে রয়েছে বলে। সে গলা নামিয়ে বলল, তিলিকে উদ্দেশ্য করে, 'তা নয়। হুতোশে ঘুমোতে পারে নি। সে তোরা বাতাস চালিয়েও দূর করতে পারবি নে।'

কথাটা সত্য। হুতোশ যদি দুর্ভাবনা হয়, তবে তিলির হাতপাখার ভালবাসার বাতাস মাত্রে তা যাবে না। মেঘনাদ বলল, 'সে ছোঁড়া এসে খেয়েছে ?'

তিলি বলল, 'কে, তোমার চালিস্ ?'

'হ্যাঁ ?'

তিলি প্রায় বিজয়ের মতোই বলে উঠল, 'সে শালার পাত্তা-ই পাওয়া যায়নি।'

তিলির কথার ঢং-এ হেসে উঠল সবাই। কিন্তু মেঘনাদের মনটা খচ্ করে উঠল। আসে নি ছেলেটা। ওই ছেলেটাই তাকে প্রথম সান্ত্বনা দিয়েছিল এখানে। কোন কথা না বলে, কেন চলে গেল ছেলেটা। মন তার সংশয়ে ভরে উঠল। হয় তো কেউ কিছু বলেছে। তাড়িয়ে দিয়েছে।

পথের ছেলে, সে তো পথেই চলে যাবে একদিন। তবুও মনটা বড় চেয়েছিল তাকে। সে মনের কথা ঠুমিরা বুঝবে না, বোঝানোও যায় না। দুয়েতেই ওদের হাসি পাবে শুধু। মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠল। সিরাজদিঘার মেঘুসা'কে কোনদিন না দেখে সে মিছে কথা বলেছিল। তার একটুও রাগ হয়নি তাতে। অহঙ্কারশূন্য আনন্দবোধ হয়েছিল।

চালিসের মধ্যে শৈশবের মেঘুর কোন ছাপ নেই। চালিস্ মুক্ত বাতাস।

ওর গুনগুনানির মধ্যে অপর্যাপ্ত বিচিত্র কথার ঝুড়ি। তার মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বাদ আছে। সেই স্বাদটুকু পাওয়ার বড় সাধ ছিল মেঘনাদের। তা ছাড়া, ধলেশ্বরী, পদ্মা, বুড়িগঙ্গা আর গঙ্গার ধারে ধারে অনেক ঘুরেছে সে। তার কাছে অনেক সংবাদ ছিল।

তিলি বলে উঠল, 'আর কি মিথ্যুক মাইরি ছোঁড়াটা! বোনাইয়ের এমন চেহারা বললে আমাকে, আমি তাজ্জব।'

লীলা হেসে উঠে বললে, 'আর কী গল্পো করতে পারে! আমাকে তো সারাটা গাড়ি জ্বালিয়েছে। ছোঁড়ার রস আছে প্রাণে।'

মেঘনাদ দরজার দিকে গেল। তিলি বলল, 'যাচ্ছ কোথা?'

মেঘনাদ বলল, 'বাইরে গাছতলায় বসি একটু।'

লীলা বলল, 'ঠুমি, ঘরে তালাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।'

তিলি উঠল। হঠাৎ তারও মনটা একটু ভিজে উঠল। বলল, 'সত্যি, মুখের ভাত ফেলে চলে গেল ছেলেটা।'

লীলাও ভোলেনি। কালকে রাত্রে গাড়িতে প্রথম তার সঙ্গেই চালিসের ভাব হয়েছিল। কেন জানিনে, চালিসের সঙ্গে সে খুব মেতে উঠেছিল প্রথমে। চালিস্ যেন যুবক ভক্ত প্রেমিকের মত লেপটে এসেছিল তার দিকে। তাই সে ছেলেটার সঙ্গে গল্প করেছে খানিকক্ষণ। আবার ভুলে গেছে কখন। ভোরবেলা চালিস্ তার পায়ের কাছে শুয়েছিল। তার টার্কি পাখির মতো বহুরূপী মনে একটু স্নেহ ও করুণার রং ধরেছিল।

মেঘনাদ যে তাকে ডেকে এনেছিল, তাতে খুশি হয়েছিল সে। তারপরে আবার ভুলে গেছে কখন। এখন আবার মনে পড়ল। মনে পড়লে, কথা বলতে আর মিশতে ইচ্ছা করে ছেলেটার সঙ্গে। সে হঠাৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ওসব রাস্তার ভূত, মরবে রাস্তায়। ঘর কি ওদের ভাল লাগে।'

প্রতিবেশিনীদের একজন বলল, 'তাই না বটে।'

বিকেল হল। পাঁচটার পরে ফিরে এল বিজয়। চালিস্ এল না।

বিজয় বলল, সেও তাকে দেখতে পায়নি আর। বলল, ঘরের ভাতে ওদের মন ওঠে না।' মেঘনাদকে বলল, 'চল, এ দেশটা একটু ঘুরে দেখবে।'

সেটুকুই চাইছিল মেঘু। সে তৈরী হল। তার চেয়ে অনেক বেশী তৈরী হল বিজয়। হাতে পায়ে সাবান দিয়ে কালো চামড়া ছাইপড়া ধূসর করে ফেলল। মাথায় দিল জবজব করে একমাথা তেল। পাঞ্জাবী পরল, মালকোচা মেরে ধূতি পরল। পাঞ্জাবীর ঘাড়ের কাছে তেল ঘামে বেশ খানিকটা রং বদলাচ্ছে। তাতেও তৃপ্তি কম নেই। তার উপরে বিয়ের সময়ের সযত্ন রক্ষিত পাম্‌শু। বিবর্ণ হয়েছে রং। তালি তাপ্পিও পড়েছে দু-চারটে। কিন্তু কারখানা থেকে এসে এসব না করলে তার মন ভরে না। জাম ছাড়ে না। চটকলের মিস্তিরি জীবনটুকু মাপে মাপে আয়ত্তে এসে গেছে তার।

ওদিকে লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে নকুড়ও বেরুল। সে মেঘনাদকে নিয়ে বেরুবার ইচ্ছা করেছিল। বিজয়ের উপর কথা বলা যাবে না জেনে প্রাত্যহিক পথে যাত্রা করল সে। সে যাবে এখন অনন্তের কাছে। অনন্ত থাকে ঠাকুরগলির বাঁকে। যেখানে, বাঁকের পরে বস্তিতে কারখানার মানুষের ভিড়। ঠাকুরগলি বেশ্যা-পল্লী। অনন্তের কাছে যাবে টাকা পয়সার জন্য। রোজই পায় না। কোন কোনদিন পায়। আর যাবে, ঠাকুরগলির মোড় থেকে খানিক দূরে, সিনেমার সামনে একটা দশকর্ম ভাণ্ডারে। সেখানে নকুড়ের জমজমাট। ঘণ্টা চারেক বসে, বারকয়েক গাঁজা টানবে। একটু চা খাবে। তারপর ফিরে আসবে।

আজ নকুড় অনন্তের কাছে চলল নতুন সংবাদ নিয়ে।

বিজয় বেরুল মেঘনাদকে নিয়ে। ওদিকে লীলা তিলিরও যেন সাজো সাজো ভাব। কেবল সুকুমারি লীলার পাশে পাশে ঘুরতে লাগল। বউ তাকিয়ে রইল বিজয়ের পথের দিকে। প্রায় বিজয়ের ডবল একটা মানুষ মেঘনাদও যে পাশে পাশে যাচ্ছে, সেটুকু যেন তার নজরে পড়েও পড়ে না। তার কোল থেকে ছেলেটা হাত বাড়িয়ে কপচাতে লাগল, বা-ব্বা! ওম্ বা—ব্বা!'

খেয়াল থাকলে বিজয়, 'শালার ব্যাটা' বলে আদর করে যেত। কিন্তু এখন

তার খেয়ালই নেই। আশ্চর্য ! ফিরে তাকাল মেঘনাদ। বিচিত্র হেসে ছেলেটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'হুঁঃ, হুঁঃ !'

বউ চমকে ঘোমটা টেনে দিল।

মেঘ সরে যাচ্ছে একটু একটু। বাতাস বইছে রাস্তায়। বড় রাস্তায় অনবরত গাড়ি চলাচল। ছুপাশের দোকানে দোকানে এখন কারখানার মানুষের ভিড়। বিশেষ চা আর হোটেলখানাগুলিতে। পরিচিত মানুষ বিজয়। সকলের সঙ্গেই তার জানাশোনা একটু বেশী। সবাই ডেকে ডেকে কথা বলে।

'চল সেলুনে।'

সৌভাগ্যবশত নামটা জানে মেঘু। মুখটাও কাঁটাবন হয়ে আছে। বলল, চল।

মেঘুকে গদীতে এসে কামিয়ে দিয়ে যেত নরসুন্দর প্রাণনাথ। কখনো কখনো কারখানায়ও আসত। কাজের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কামিয়ে নিত। এখন সেলুনে কামাতে হচ্ছে।

সেলুনের বাইরে এসে বিজয় বলল, 'তোমার তো আবার চা চলবে না।'

মেঘনাদ বলল, 'তুমি খাও। আমার বড় ভয় করে। গরম কি না! তা'ছাড়া কেমন যেন গা পাক দেয়।'

বিজয় হো হো করে হেসে উঠল। হঠাৎ বলল, 'মাল-টাল চলে ?'

মেঘনাদও হাসছিল। বলল, 'মাল, মানে মদ বলছ তো! তা' একটু আধটু খাই।'

বিজয় একেবারে চীৎকার করে উঠল, 'গুড্! শালা ভেরি গুড্।'

কে একজন বলে উঠল, 'কিসের ভেরিগুড্ মিস্তিরি।'

বিজয় বলে উঠল, 'আমার বোনাই।'

অমনি রাস্তার দুপাশ থেকে অনেকগুলি চোখ এসে পড়ল মেঘনাদের উপর। বেশ একটু বিস্মিত শ্রদ্ধাপূর্ণ সেই দৃষ্টি। বোধ হয় চেহারাটা দেখে। মেঘনাদ লজ্জা পেল। লজ্জা পেলে তার গোঁফজোড়া একটু বেঁকে যায়।

চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়াল মেঘনাদ। একটা দোকানের সামনে তন্দুরে রুটি

সেঁকছে একটা লোক। ছোট তন্দুর। ঢাকায় ইসলামপুর চক বাজারে, এরকম তন্দুর বোধ হয় কয়েকশো আছে। তা'ছাড়া বাকরখানির দোকানগুলিতে এরকম তন্দুরই থাকে। তন্দুর নয় তণ্ডুল।

লালমিঞা বলত, আসলে তন্দুর। বাঙালির মুখে তণ্ডুল হয়ে গেছে। একসময়ে এরকম ছোট তন্দুরেও কাজ করেছে মেঘনাদ। টিনের পাত তন্দুরে তাতিয়ে নিয়ে, মাল বসিয়ে দিয়েছে। বড় ক্ষতির কারবার। তবে, এখানে শুধুই রুটি হচ্ছে।

বিজয় বলল, 'দাঁড়ালে যে?'

'রুটি সেঁকা দেখছি।'

'তোমার তো আবার এসব দেখলেই কাজের কথা মনে পড়ে যায়।'

মেঘু হাসল। বিজয় বলল, 'চল তবে এখানেই চা খাই।'

দুজনে ঢুকল তারা। বিজয় চা আর নিমকি বিস্কুট চাইল। চা-খানা আর হোটেল, একসঙ্গে চলে এখানে।

বিজয়কে চা আর নিমকি বিস্কুট দিতেই, মেঘনাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। একটা নিমকি বিস্কুট নিয়ে টিপে ভেঙ্গে ফেলল। বলল, 'যা ভেবেছি। খামিটা ভাল হয়নি। বেকায়দার মাল হয়ে গেছে।'

বিজয় অবাক হয়ে বলল, 'খামি আবার কি?'

একটু বিব্রত হয়ে উঠল মেঘনাদ। আশপাশ পরিবেশ ভুলে গিয়েছিল সে। বলল, 'কিছু নয়। মাখা ময়দার নামই খামি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

বিজয় বলল, 'তাই বল। ভাবলাম, কি আবার বলছ। তা' চোখে দেখলেই মাল ঠাওর করতে পার? বাঃ! তা' কি দেখলে? বাজে মাল? তা'হলে বল খাব না। এখন তো আর শালা ঠকাতে পারবে না।'

মেঘনাদ বলল, 'না তা' নয়। কারবারীর ক্ষতি হয়েছে। আনাড়ির হাতের কাজ, ময়দা বেশী লেগেছে। ঠিক হলে, ময়দা কম লাগত, মালটা আরো খাস্তা হত।'

বিজয় বলল, 'ওঃ তাই। ময়দা যখন বেশী আছে, তখন তো শালা লাভই

হল। খেলে পেটে গহে থাকবে কতক্ষণ। ঘরে গিয়ে হামলাতে হবে না। আর দু'খানা নিই। কি বল?'

মেঘনাদ বলল, 'খিদে পেলে নেও না।'

বিজয় খেতে খেতে বলল, 'খিদে পেলেই নেওয়া যায়? তা'হলে আর ভাবনা কি ছিল।' প্রথম বুঝতে পারলে না মেঘু কথাটা। পরমুহূর্তে নিজেই বলে উঠল, 'এই, আর দুখানা নিমকি দেও তো।'

বিজয় বলল, 'থাক্‌না। তুমি খাবে?'

'আমি?' বদলে গেল মেঘনাদের মুখটা। নত চোখ দুটি নিমকি বিস্কুটের দিকে থাকলেও দৃষ্টি চলে গেছে শূন্যে। গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে করুণ হাসিটুকু কেমন যেন বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠল। কারখানার খারাপ মাল, অর্থাৎ ভাঙ্গা-চোরা, পুড়ে যাওয়া কিংবা ঠাস অর্থাৎ কাঁচা কাঁচা, এমনি কত পড়ে রয়েছে হাতের কাছে। সেইসব মুখে দেয়নি। কোনদিন কখনো বা মাল বাজারে ছাড়ার আগে একবার চেখে দেখেছে। তাও ওটা বিপিনের কাজ ছিল। কিন্তু আস্তো মাল ভেঙ্গে তাও আবার কিনে, খাওয়া হয়নি এ জীবনে কোনদিন। তবে বিজয় বলছে। খেলে যদি ওর প্রাণটা খুশী হয়।

তবু গলার স্বরটা চেপে এল তার। বলল, 'নেও দুটো, খাওয়া যাক।'

নেওয়া হল। বিস্কুট মুখে দিয়ে হঠাৎ বুকের কাছে আটকে গেল মেঘুর। যদি আজ বিপিন দেখত। যদি তার কারখানার কেউ দেখত! ভূত দেখার মত হয়তো চমকে উঠত। গলা দিয়ে যেতে চায় না। বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। শক্ত চোয়ালের দু'পাশে আটকে রইল বিস্কুট।

বিজয় চা খেতে খেতে হঠাৎ বলল, 'বনুই, তোমার মনটা খারাপ আছে।'

মেঘু একটু চমকে উঠল। তারপর বলল, 'তা' বুঝতেই তো পারছ বিজয়।'

বিজয় বলল, 'তা' বুঝতে পারছি। তোমার অতবড় কারবার। সব ফেলে ছড়ে···।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আমি আদার ব্যাপারী, তোমার জাহাজের কারবার। একটা কথার কথা বলছি। আমি তোমার সব বুঝব না।'

মেঘনাদ বলে ফেলল, 'কেন?'

বিজয় বলল 'কেন ?' বলে হেসে ফেলল। বলল, 'শুনেছি তোমার নাকি অনেক টাকা। বেশী টাকার কথা শুনলে আমি শালা ভিরমি খেয়ে যাই, মাইরী। যা পাব না, ওতে আমার টান নেই। ক্যাশিয়ারবাবু মাইনে দেয়, বাবুর বাক্সের দিকে চাওয়া যায় না। এত নোট থিক্‌থিক্ করে। ষোল টাকার জায়গায় যেদিন কুড়ি টাকা হপ্তা পাব, চার টাকার এপিঠ ওপিঠ বাজিয়ে নেব। ফুর্তির ঠেলায় ওই চারটাকার মাল-ই খেয়ে ফেলব হয়তো। কিন্তু বেশী টাকার ব্যবসা, আমি কি বুঝব, বল ?'

মেঘনাদ নীরব। মুখের চামড়া টান টান শক্ত হয়ে উঠল তার। গোঁফজোড়া তীক্ষ্ণ দেখাতে লাগল কিন্তু সে একটি কথাও বলল না।

বিজয় একটু মুষড়ে গেল। বলল, 'কি হল ? কথা বলছ না যে।'

মেঘনাদ নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

দোকানে ভিড় জমে উঠেছে আরো। আকাশের অবস্থা সেই একই রকম। মেঘের কম বেশী নেই। সন্ধ্যার ঘোর লেগে গেছে সর্বত্র। দোকানে দোকানে বাতি জ্বলছে।

মেঘনাদ হঠাৎ বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশী টাকার ব্যবসা বোঝ না। কম টাকার বোঝ ?'

বিজয় বলল, 'ব্যবসাই বুঝিনে।'

তবে ? মেঘনাদের গলার স্বর তীক্ষ্ণ শোনাল। ভ্রূ দুটো নেমে এল চোখের মণির উপর। বলল, 'ব্যবসা-ই বোঝ না। তবে ? আজ বুঝতে পারছি, আমিও বুঝি না বোধহয়। খাটতে পারি। আমি ভাল মিস্তিরি ছিলাম, আজো আছি। ব্যবসা চালাতে যে বুদ্ধির দরকার, সেটুকু বোধহয় নেই। নইলে, আজ নিজেকে এত একা একা মনে হবে কেন ? আজ লালমিঞা নেই…।'

সে থেমে গেল। বিজয় ভাবল, তার উপর রেগে গেছে মেঘু। কিন্তু সে তো রাগাবার জন্য বলেনি কিছু। সে নিজে তো রাগেনি।

মেঘু আবার বলল, 'টাকার কথা বলছ ? এটুকু বুঝি, কারবারীর টাকা

হল হাল। নৌকা বাওয়ার যন্তর। হাল যে পানিতে বইবে, সেই পানির নাম বুদ্ধি। হালে পানি পেলে নৌকা চলে।…বলছ আমার অনেক টাকা। কত টাকা! ফুস্ মন্তর। কারবার যখন করব ভেবেছি, তখন টাকা নিয়ে তো আর চিতায় উঠব না।'

বিজয় বলল, 'যাঃ বাবা। তুমি যে চটে গেলে!'

মেঘুর খোলা বুকটা রাঙা দেখাচ্ছে। সেখানে হাত দিয়ে সে বলল, 'চটলাম কোথায়।'

'তবে বলছ এসব। হাল পানি, আমি তো এসবই বুঝিনে।'

বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মেঘু বোধহয় হাসবার চেষ্টা করল। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'না, তুমি বলছ আমার অনেক টাকা। অনেক না থাক, কিছু আছে। অনেক বড় আশা আমার, বুঝলে? তল পাচ্ছিনে।'

অনেক কথা হুড়মুড় করে ছুটে এল তার মুখে। কিন্তু নীরব রইল সে। অনেক কথার বন্যা তার নিজের মধ্যেই আবর্তিত হতে লাগল। আবর্তের ধাক্কাটা ফুটে উঠল তার সারা দেহে, চোখে মুখে।

বিজয়ও নীরব। টাকাওয়ালা মানুষকে সে চিরকালই সংশয়ের চোখে দেখে এসেছে। ওটাই তার জীবনের অভিজ্ঞতা। সে নিজেও এক সাহা ঘরের ছেলে। চিরকাল অলক্ষ্মী ঘুরেছে তার পিছনে পিছনে। আজকে সে জীবনের এক গাঙ্গ থেকে আর এক গাঙ্গে গিয়ে পড়েছে। সেখানেও জীবন কঠিন, নিষ্পেষিত। বাঁচিয়ে কেউ রাখে না। জোর করে বেঁচে থাকাটাই জীবন। তার এই শরীরটুকু মূলধন।

যেখানে মূলধনেরই তফাত, সেখানে একজন আর একজনকে বুঝবে কি করে। তবু, মেঘনাদকে দেখে বিজয়েরও মনটা বিমর্ষ হল। টাকা আছে কিছু। কিন্তু সুখ নেই। টাকা নিয়ে সে ভোগের রথে বসেনি চাবুক নিয়ে। ঝড় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে দিতে হবে পাড়ি। মেঘনাদ যেন চটকলেরই মিস্তিরি। টাকার বিষ ফুটে ওঠেনি তার কথার ব্যবহারে।

দুজনেই বেরিয়ে এল রাস্তায়। রাস্তা নয়, বাজার। মেঘুর চোখের

সামনে ভেসে উঠল ঢাকা শহরের রাজপথের কথা। বিশেষ করে নবাবপুর ইসলামপুরের কথা। গাড়ি ঘোড়া মানুষের মিছিল সঙ্কীর্ণ পথে পথে। মানুষ ঠেলাঠেলি করে চলেছে রাস্তায়।

বিজয় হঠাৎ বলল, 'তা হলে তো একটা কিছু করতে হয়। তোমার মিস্তিরিগিরিও শালা আবার আলাদা। আমি শুধু চটকলের মিস্তিরিগিরিই জানি।'

আসলে, মেঘনাদের জন্য বিজয়ের মনে একটু ভাবনা আছে। কি ভাবে কাজ আরম্ভ করতে চায় সেটা জানতে চায় সে।

মেঘনাদ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বলল, 'কারখানা চাই, লোক চাই, তার আগে চাই ময়দার পারমিট। এতদিন ধরে যে কাজ করেছি, তা আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে।'

বিজয় খালি বলল, 'আরে বাপ্‌রে বাপ্‌। এতো শালা একটা রাজ্যি চালাবার ব্যাপার।'

তারপরেই দেশবিভাগের আলোচনায় এসে পড়ল তারা।

বিজয় বলল, 'আমার তো শালা কিছু মাথায়ই ঢোকে না। দেশ ভাগ হলেই নাকি স্বাধীন।'

মেঘনাদেরও প্রায় সেই অবস্থা। সে বলল, 'স্বাধীন হয়ে কি হবে, আমি কিছুই বুঝতে পারিনে।'

বিজয় বলল, 'স্বাধীনতা সবাই চায়। মানে, এই যে তোমার ইংরেজ ছেড়ে চলে যাবে বলছে, সেটা সবাই চায়। কিন্তু দেশ ভাগাভাগি হলে, ওদেশের হিন্দুরা কি করবে? সব শালা লোটা বাটি নিয়ে চলে আসবে?'

মেঘু বলল, 'তা তো আসতেই হবে। সব তো আসবে আসবেই করছে। বিলেত থেকে নাকি কোন সাহেবরা এসেছে। তারাই সব ঠিকঠাক করে দেবে। কিন্তু আমি বলছি, ইংরেজরা চলে যাবে বলছে। ওদের কারখানাগুলানও ছেড়ে যাবে?'

বিজয় বলল, 'আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম রাজীবদা'কে।'

ঃ রাজীবদা কে ?

ঃ আমাদের ইউনিয়নের নেতা। মানে মজুর ইউনিয়নের। আমাদের বাড়িতে আসে প্রায়ই। রাজাবদা'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার মত। বললে, আজকে না যাক দশ বছর বাদে যাবে। তা' ছাড়া, ওরা গেলে কারখানা চালাবে কে। সব তো বেকার হয়ে পড়বে।'

ঃ কেন, দেশের লোক চালাবে ? দেশের লোক কি কারখানা চালাতে পারে না ?

ঃ বাঃ, ওদের জিনিসপত্র কারখানা, ওরা এমনি দেবে নাকি ? টাকা চাইনে ?

ঃ কেন ? ওরা কি সব বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিল ?

কথাটা বলে ফেলে নিজেকে কি রকম বোকা বোকা মনে হল মেঘনাদের। এ আবার কি বলে ফেলল সে। বিজয় নিশ্চয় হেসে উঠবে। নিয়ে না আসুক, তৈরি তো করেছে।

কিন্তু বিজয় হাসল না। চিন্তান্বিতভাবে বলল, 'হুঁ। তুমি বলছ মানে, একটা পুরো স্বাধীনতার কথা। ঠিকই। রাজীবদা বলে, আস্তে আস্তে হবে সব।'

আস্তে আস্তে হবে! দুজনেই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

মেঘনাদ খালি বলল, 'তাই তো বলছি। তবে দেশ ভাগ করে কি হবে ? আমরা সব মরে যাব। পূর্বদেশের লোকগুলি জ্যান্তে মরব সব।'

ঃ তবে দাঙ্গাটা থেমে যাবে।

ঃ কেন ?

ঃ ভাগাভাগি নিয়েই তো দাঙ্গা। সেটা হলেই, সব শান্ত।'

মেঘনাদ চুপ করে রইল। দাঙ্গা থেমে যাবে তাতে ? তা থামুক। তারপর এদেশ ওদেশের লোকগুলি করবে কি !

হঠাৎ জলের ছলছল্ শব্দে মনটা অন্য জগতে ফিরে এল। সামনেই মস্ত বড় মাঠ। উঁচু মাঠের নীচেই গঙ্গা। গঙ্গার দুপাশে দূরে আলোর মালা। যেন দেওয়ালীর দীপ সাজিয়ে দিয়েছে দুপারে। জলে তার স্বর্ণরেখা কাঁপছে

ঝিকিমিকি। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। স্রোতের টানে গলে গলে ছুটে চলেছে।

জলের আলোতেই তাদের মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠল অন্ধকারে। তাদের দুজনেরই মুখে একটা অস্পষ্ট ব্যথার ছাপ। দেশ বিভাগ কিংবা স্বাধীনতা, এর সঠিক অর্থ তারা কিছুই বোঝে না। অথচ দুই ভিন্ন পথে, তাদের দুজনের জীবনেই অনেক সংকট, সমস্যা, ব্যথা ও বেদনা। যেন, দেশের এত ব্যাপারের সঙ্গে, তারা তাদের জীবনের কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না।

বিজয় খালি বলল, 'গঙ্গা।'

তারপর দুজনেই বিড়ি ধরাল। অনেকক্ষণ পর বিজয় বলল, 'হয়ে যাবে, বুঝলে বোনাই। দু' চারদিন যাক্, তারপর আরম্ভ করতে পারবে।'

মেঘনাদ ফিরে তাকাল বিজয়ের দিকে। বিজয় দেখল, একটা পাথরের মত মুখ মেঘনাদের। তারপর আবার বলল সে, 'তবে একটা কথা। তোমার টাকা পয়সা সব সরিয়ে ফেলতে হবে।'

মেঘনাদ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় ?'

: পোস্টঅফিসে। খোলামেলা বস্তি বাড়ি। কখন কি হয় বলা তো যায় না। কিছু একটা হলে তখন মাথা কুটতে হবে।

মেঘনাদ আর একবার দেখল বিজয়ের মুখের দিকে। যেন বিপিন কথা বলছে। বলল, 'আচ্ছা।'

আকাশে দুটি একটি নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। বাতাস নেই। তবু গঙ্গার ধারটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে বিজয় আবার বলল, 'হয়ে যাবে, তুমি ভেব না।'

গঙ্গা ছলাৎ ছলাৎ করে ঘা খেতে লাগল পাড়ে। ধলেশ্বরীও বাজত এমনি করে। তার হাসি শুধু অন্ধকারে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। এখানে সে হাসির বান ডেকেছে, কিনারে আলোর প্রতিবিম্বে। নিরলস বাহিত গঙ্গার নীচের হাসিটুকুও যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোকময় ঢেউয়ের মাথায়

সেও যেন বিজয়ের কথারই প্রতিধ্বনি করতে লাগল, 'হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।'

দিন চলে গেল।

সেইদিন গঙ্গার ধার থেকে, বিজয়ের সঙ্গে ফিরে এসে মনটা আবার শান্ত হয়ে এল মেঘুর। ঘরে ঢোকবার আগেই দেখা হল তিলি আর লীলার সঙ্গে। পিপুলতলায় বসে আছে দুই বোন। ঠিক বসে নেই। অল্প অল্প ঘাসের উপর এলিয়ে আছে যেন। গলিটাতে কয়েকটা ইলেক্‌ট্রিক আলো আছে। নিষ্প্রভ ম্লান আলো। সামনের অন্ধকারটুকুকে কেবল খানিকটা গা ছম্‌ছমে কুহেলিকাপূর্ণ করে তুলেছে, কোথায় ঢোল করতালের সঙ্গে তীব্র উচ্চ গলায় পশ্চিমী নাম গান চলছে। গলিটার উপরে এখানে সেখানে খাটিয়া পেতে বসেছে ছোটখাটো জটলা। কোথায় নারীকণ্ঠের কলহের কলরব। কান পাতলে আরও অনেক কাহিনী শোনা যেতে পারে। বিচিত্র কাহিনী। ব্যথা, জ্বালা, অতি গোপন ও অশ্লীল কাহিনী।

এখানে এই পিপুলতলায় দুই বোন। গলি রাস্তা থেকে কাঁচা নর্দমার সীমান্ত পেরিয়ে এই এক ফালি জায়গা। রাস্তার আলোর একটু রেশ এসে পড়েছে এখানে। সেই আবছায়াতে, চকচক করছে দুই বোন। হঠাৎ সাপ দেখার মত চমকে দাঁড়াতে হয়। লীলার কালো রংটাই অমনি। তিলিকেও তাই দেখাচ্ছে এখন। দুজনেই তারা সেজে আছে। লীলা তার নিজের একখানি পোশাকী ভাল শাড়ি দিয়েছে তিলিকে পরতে। কানে সোনার দুল পরিয়ে দিয়েছে। গলায় দিয়েছে হার। তার অনেক সোনা থেকে এক চিমটি তুলে দিয়েছে বোনের গায়ে। তার নিজের গায়েও জড়ির কাজ করা তাঁতের শাড়ি। কাছে আসতেই, একটা অদ্ভুত সুগন্ধ নাকে এসে লাগে। চাপা চাপা গন্ধ।

মেঘু চেনে এ গন্ধ। লীলা অনেক আতর সেণ্ট কিনেছে। এ গন্ধ তারই একটি। মেঘনাদ বলল তিলিকে, 'বাস্‌রে! খুব যে সেজেছ। বেড়িয়ে এলে, না চললে?'

মেঘুর ছায়া পড়েছে তাদের গায়ে। তিলি বলল, 'চললাম।'

মেঘু বলল, 'কোথায় ?'

তিলি চাপা হেসে বলল, 'কোথায় আবার। রাত করে, সেজেগুজে যেখানে যাওয়া যায়।'

চাপা হাসির শব্দটা হঠাৎ ঠুং করে একবার বেজে উঠল।

আবার বলল, 'দিদিও যাবে।'

মেঘুও হাসল। বলল, 'গেলে আর কি করতে পারি, বল।'

লীলা বলে উঠল তিলিকে, 'কাকে বলছিস ? বউ যাবে, সে ভয় ওর আছে ? গেলই বা, যা খুশি তা করলই বা। তাতে কি। সে হত অন্য কিছু গেলে।—'

তিলি দিদির গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তা বলে তোমরা ঝগড়া লাগিও না বাপু।' প্রসঙ্গটা পাল্টে নিয়ে বলল তিলি, 'দেখ, দিদি আমাকে কি দিয়েছে। শাড়ি সোনা, সবই দিয়েছে। দেখো, বউকে আবার খুসো না যেন তার জন্যে।' খুসবে কেন ? এইটুকু তো চেয়েছিল মেঘনাদ। কেউ কিছু পেয়ে, নিয়ে, হাসবে খুশী হয়ে। লীলা ছাড়া কাউকে সে কিছু দেয়নি কোনদিন। ভাই-বোন-ছেলে-মেয়ে শূন্য তার ঘর। দিয়ে ভরে দিয়েছে লীলাকে। কিন্তু লীলা কাউকে কোনদিন কিছু দিয়েছে বলে সে শোনেনি। তার জন্য ঘরের ব্যথাটা কেউ কোনদিন বোঝেনি। যে তার বোঝে অনেকখানি, সেই বিপিনও এটুকু ঠিক জানে না। ঘরে অনেক মানুষ, সবাইকে নিয়ে, দিয়ে, ডেকে হেঁকে জীবন কাটাতে চেয়েছিল সে।

একটি শিশু যদি বা এসেছিল, সে রইল না। লীলা কোনদিন কেঁদেছে কি না, তাও সে জানে না। লীলার ওইটি প্রথম সন্তান। আশঙ্কা ছিল প্রসব হতে নাকি তার বিপদ হতে পারে। সেই বিপদ পার হয়ে, অনেক যন্ত্রনার মধ্যে যাকে পেয়েছিল, সে রইল না। রুক্ষ নোংরা বেশে, কয়েকদিন প্রেতিনী সেজে বসেছিল লীলা একলা। যেন রাগটাই তার প্রধান। চোখ জ্বলেছে ধিকি ধিকি। বৃথা কষ্ট ভোগ। অকারণ শুধু যন্ত্রণা দেওয়া। এ বিদ্বেষের মধ্যে কোন ক্ষুধার অন্তস্রোত ছিল কি না, কেউ জানে না।

সে রইল না। থাকলে তাকে হয় তো লীলা দিত অনেক কিছু। আজ লীলা দিয়েছে তার বোনকে। দেয়নি, পরতে দিয়েছে হয়তো। তবু মনটা ভরে উঠল মেঘুর। সত্যি, আজ লীলার সব লীলাই অন্যরকম। আজ সে দিদি, ননদ, মেয়ে। সে যদি আরো দিত, তাতেও দুঃখিত হত না মেঘু।

খুশী হয়ে তাকাল সে লীলার দিকে। তার সে চাউনি দেখা যায় না। একে অন্ধকার, তার উপরে ভ্রূর ছায়া। সে বলল, 'খুসবো কেন? যার জিনিস সে দিয়েছে। আমার হলে খুসতাম।'

ঃ এ বুঝি তোমার নিজের নয়?

ঃ যা দিয়ে দিয়েছি, তা কি আর নিজের থাকে?

তিলি বলল, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

উঠে পড়ল দুজনেই। হেসে ফেলল পরস্পরের দিকে চেয়ে। বলা হল না, কোথায় গেছল তারা। সুকুমারিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেছল তারা। সামনেই গঙ্গার ধারে এক রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। সেখানে গেছল তারা।

ওদিকে বিজয় নিয়ে পড়েছে তার ছেলে বউকে। নকুড় তন্দ্রাচ্ছন্ন। নেশা করে এসেছে। সুকুমারি অন্ধকারে বসে শুধু দেখছে সবাইকে। বাড়িটার উঠোনে মেয়েপুরুষের জটলা।

রাত্রে, কোণের ঘরে শুতে গেল মেঘু। কিছুক্ষণ পর এল লীলা। পান ঠাসা দুই ঠোঁট টিপে রয়েছে। যেন আগুন লেগেছে ঠোঁটে। এসে, এক টানে জামাটি খুলল আগে। বেশী ঢাকাঢাকি নেই তার কোনদিনই। পাতলা তাঁতের শাড়িটা টেনে দিল একটু। গরমও তেমনি। মেঘুর সামনেই সায়া খুলে রেখে দিল।

মেঘু সে সব দেখছিল না। সে লীলার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে এল তাকে।

লীলা ভ্রূ কুঁচকে ফিরে তাকাল। ভ্রূ কোঁচকালে তার একটি ভ্রূ নেমে আসে। আর একটি ভ্রূ উঠে যায়। যেন বিরাগ ও বিদ্রূপের লক্ষণ। একটু যেন অবাক-ই হয়েছে! বলল, 'কি হল?'

লীলার কথা, ভাবভঙ্গির কাছে মেঘুকে খানিকটা স্থূল মনে হয়। হৃদয়ে প্রেম থাকলেই তার রীতিনীতি আচার ব্যবহার রপ্ত করা যায় না। এ ব্যাপারে মেঘু চিরদিনই একরকম। বলল, 'কিছু নয়। তোমাকে বড় ভাল লাগছে।'

লীলার ভ্রূ জোড়া আরো বেঁকল। মনে পড়ল হঠাৎ সিরাজদিঘার কারবারী পীতাম্বরদা' যেদিন পয়সা লাভ করত, সেদিন কীর্তন গাইত সারা রাত। লোকে বলত, পীতাম্বর আজ দু'পয়সা পিটেছে। মেঘুর খুশীর মধ্যে লীলা শুধু ওই জাতীয় কিছু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। তাই তেমনি বিদ্রূপ-ভরেই বলল, 'হঠাৎ কেন?'

হঠাৎ কোথায়। বউকে তো মেঘুর ভালই লাগে। ভাল লাগাটুকু মাঝে মাঝে বড় বিষিয়ে দেয় লীলা। কেন, মেঘু তা জানে না। সে বলল, 'কেন আবার। ভালই তো লাগে।'

লীলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘুর চোখের দিকে তাকাল। বলল, 'সত্যি নাকি?'

তারপর হঠাৎ গলার স্বরটা পরিবর্তন করে ফেলল, 'কারবারের কিছু হল!'

ভাল লাগার কারণ অনুসন্ধান করছে লীলা। মেঘু বুঝতে পারেনি। সে হতাশায় ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, কিছুই না। বিজয় এসবের তো কিছুই বোঝে না।'

যুগপৎ বিস্ময়ে ও আশায় চকচক করে উঠল লীলার চোখ। তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা যেন মূর্তি ধরছে। মেঘুর এই হতাশা আর লীলাকে ভাল লাগা। একই সঙ্গে, এই দুটি জিনিস। লীলার মনে হল, এমনটিই বুঝি চেয়েছিল সে। অখণ্ড হৃদয়ের নিরঙ্কুশ রাজ্য বিনা তার সুখ নেই। আজ কি সেই রাজ্যের দরজা খুলছে তার সামনে। শুধু তারই মাঝখানে ছড়িয়ে দেবে মেঘু নিজেকে!

তবুও সংশয় যায় না। সন্দেহ ঘোচে না। আজ আশা। কাল আবার নিরাশা। লীলা দূরে সরে যাবে আবার তখন।

কিন্তু লীলাকে কেন্দ্র করে মেঘুর অত ভাবনার ঘোর প্যাঁচ নেই। তার মন খারাপ। লীলাকে ভাল লাগছে। সেইটুকু তার বদ্ধ হৃদয়ে বাতাসের মত। ভাল লেগেছে, তাই সোহাগ উথলে উঠেছে তরে। লীলা সন্তর্পণে,

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্রহণ করছে সেই আদর। বহু বছর আগে ফেলে আসা, সোনাদুলি চরের সেই প্রাণে যেন টান লাগল একটু।

এই ঘরের-ই টিন বেড়ার ওপাশে, টিন ঘেঁষে শুয়ে আছে তিলি। তার পাশে সুকুমারি। তাদের মাথার দিকে উল্টো করে শুয়েছে নকুড়। ঘরের মাঝখানে সামান্য দু' একটা কাঠের বাক্স, বালতি, থালা বাসন। এক টুকরো কাপড় ঝোলানো দড়িতে। সব মিলিয়ে পার্টিশন হয়ে গেছে। পার্টিশনের ওপাশে বিজয়, বউ আর ছেলে।

শেষ পর্যন্ত জেগে থাকে শুধু তিলি। ওধারে বিজয় অরে বউ থাকে খানিকক্ষণ। তারপর ওদের ঘুমন্ত নিশ্বাস যায়। সুকুমারি একবার ঘুমোয় আবার জাগে। নকুড় সারারাত্রি কাশে, কি যেন বক্‌বক্ করে গোঙানির মত। সুকুমারি ধমকালে থামে। এই হয় সারারাত। শুধু অনেকক্ষণ জেগে থাকে তিলি।

আজো জেগে আছে। নিজেও জানত না, লীলার ঘরের টিনে কেন অতখানি কান চেপে শুয়েছে সে। কিছুই শোনা যায় না। একটু আধটু খুট্ খাট্ ছাড়া। ইঁদুরেও করতে পারে সেরকম। মনে হয়, চিরকাল ইঁদুরের খুট্ খাট্ টুক্ টাক্ শব্দই শুনেছে সে। কোন কণ্ঠস্বর, কিংবা কোন পদশব্দ কোনদিনই বাজেনি বুঝি কানে। যা বাজবে কানে, তা যে হৃদয়েও বাজরে।

এইখানে সে শুয়ে থাকে। তার পাশে শুয়ে থাকে একবৃদ্ধ দম্পতি। তাদের বিড়বিড় করার অর্থ সে বোঝে না। এ বয়সের ভালবাসার ভাষাও জানা নেই। কেবল মাঝে মাঝে হয় তো সুকুমারি বলে নকুড়কে, 'দেখি, একটু হাত পা' ছড়িয়ে শোও, আমি বাতাস করি।'

সেটুকু এমন করে বলে সুকুমারি, যেন তিলির ঘুম না ভাঙ্গে। ওদিকে, বিজয়ের অস্ফুট কণ্ঠ পরিস্ফুট হয় কোন কোনদিন রাত্রে। উভয়ের গলাও শোনা যায়। ছেলেটাও ঘুম ভেঙ্গে মাঝরাত্রে কোল ধামসায় বাপ মায়ের। বিচিত্র মিষ্টি স্বরে হেসে ওঠে। বিজয় বলে, চাপা হেসে, 'চুপ কর শালার ছেলে।

ওদের ঘুম ভাঙবে।' সুকুমারি জেগে থাকলে শব্দ করে ওঠে খানিকক্ষণ বাদে। যাতে ওরা সত্যি চুপ করে। সবাই ভাবে, তিলি শুধু ঘুমোয়।

এতদিন তার শিয়রের এধারে ওধারে বয়সের উত্তর দক্ষিণ নিয়ে থাকত দুই জোড়া। পাশের ঘরে আজ আর এক জোড়া। তিনদিক থেকে তিন জোড়া ঘিরে আছে তাকে। সবাই ভাবে, তিলি বুঝি শুধু ঘুমিয়ে থাকে। জেগে থাকে শুধু ওরা।

তিলি ঘুমোতে চায়। পারে না। চব্বিশ বছরের চব্বিশটা ফণা মেলে এক অজানা স্বতাশঙ্খ হিস্‌হিস্ করে তার শিয়রে। ছোবলায়, বিষ ঢালে। সারা অঙ্গে বিষ নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। সে ঘুমিয়েছে কবে। ভাবে, ঘুম আসবে কবে। ওদের মত, এ ঘুমন্ত সংসারটার মত গাঢ় নিদ্রা কবে বসবে এসে তার চোখের পাতা জুড়ে।

আজ কানের পাতা দুটিও টন্‌টন্ করছে। কানে দুল পরেছে। ছিদ্র দুটি বন্ধ হয়নি। সঙ্কীর্ণ হয়েছে আরো। দুলের আংটাটা তার চেয়ে মোটা লাগছে। মাঝে মাঝে চমকে গলায় হাত দিচ্ছে। কি যেন ছপাৎ করে গলার এপাশে ওপাশে যাচ্ছে। গলায় হার রয়েছে।

তারপর লীলার কথা মনে হয়। কোথায় যেন খচ খচ করে লাগে তার মনে। স্বামীর কথা বললেই ঠোঁট উল্টায়। তার চব্বিশ বছরের চেয়েও দিদির আগুনের হল্‌কা যেন আরো তীব্র। বিতৃষ্ণা ও বাসনার যুগপৎ লীলায় দিদি প্রতিমুহূর্তে যেন ক্রুদ্ধ ও হিংস্র। কেন? জামাইবাবুকে ভালবাসে না নাকি? ওই রকম একটা ভাল মানুষ। সারাদিনে অনেকবার লক্ষ্য করে দেখেছে সে মেঘুর দিকে। কেমন ভাবে মানুষটা তাকাচ্ছিল দিদির দিকে। পুরুষ অমনি করে তাকালে আর বুঝতে কি বাকী থাকে!

রাত্রি যেতে থাকে। তিলি একসময়ে ওঠে। বারান্দায় গিয়ে বালতি থেকে জল নিয়ে দেয় চোখে মুখে। দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে বাইরে।

একটু পরেই, অন্যদিকের অন্ধকার কোলে জ্বলে ওঠে বিড়ির ফুলকি। মহেন্দ্রমিস্তিরির ভাই হরেন্দ্র। বাইরে শোয় রাত্রে। সারারাত জেগে থাকে

কি না কে জানে। তিলি যখনই বাইরে আসে, তখনই বিড়ির ফুলকি জ্বলে ওঠে। তারপর চাপা শিস্ কেঁপে কেঁপে ওঠে। তিলি উঠে পড়ে। সবই ইঁদুরের খুট্‌খাট্। কি হবে শুনে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু জেগে থাকে একজন। অসহ্য গরমে ঘামে, কোন কিছুতেই তার খেয়াল নেই। সে মেঘনাদ। চোখের উপর ভাসছে শুধু সিরাজদিঘার হাট। আর ভবিষ্যতের বিচিত্র সব পরিকল্পনা।

দিন চলে গেল।

মেঘনাদ রোজ বেরিয়ে যায়। বিজয় প্রতিদিন থাকে না। কারখানা ছুটির পর সে বাড়ি আসে না। মজুরদের অফিস আছে, ইউনিয়ন অফিস। সেখানে চলে যায়। মেঘনাদ একলা বেরোয়।

বেরিয়ে রোজ এসে দাঁড়ায় সেই হোটেলের কাছে, তন্দুরের সামনে। যে লোকটি গলদঘর্ম হয়ে রুটি বানায়, আলাপ হয়ে গেছে তার সঙ্গে। নাম তার ইদ্রিস। কথায় কথায় আলাপটা গাঢ় হয়ে উঠেছে। মেঘনাদের মুখে বেকারীর কথা শুনে ইদ্রিস ফেটে পড়ে উৎসাহে। মেঘনাদ কারবার করতে চায় শুনে ইদ্রিসের আনন্দ আরো বেশী। মেঘনাদ ভেবেছিল, ইদ্রিস অ-বাঙালি। কথায় কথায় পরিচয় হয়েছে। ইদ্রিস বাঙালি। বাড়ি তার পাণ্ডুয়া, বর্ধমানের শুরুতেই।

কথায় কথায় জানা গেছে, ইদ্রিস শুধু কারিগর নয়। একজন ওস্তাদ মিস্তিরি। এক হাতে রুটির লেচি টিপে টিপে চওড়া করে। অন্য হাতে শিক দিয়ে রুটি তোলে তন্দুর থেকে। আর বলে, 'বাবু আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা মুর্শিদাবাদের লবাব বাড়ির কাজ করত। বাপ বলত, সেই তন্দুর দেখলে নাকি হাফ দিমাক খতম। রোজ এক শো মণ কাঠ পুড়ত লবাব বাড়ির তন্দুর তাতাতে। আজকের বেকারী তো তার কাছে ছেলেমানুষ!'

সত্যাসত্য পরে। ওইটুকুনই যথেষ্ট। আলাপ জমে দুজনেরই। মেঘু বলে, 'আচ্ছা?'

ইদ্রিস বলে, 'তবে? আর এখনকার বেকারীতে ছ' মণ কাঠ পুড়িয়ে, চার মণ ময়দার কাজ করে লোকে বলে জিন দত্যির কাজ করে ফেলল। আর লবাববাড়িতে নাকি দশটা টিণ্ডাল ছেল সিরিফ কাঠ পোড়াবার জন্ত। আর আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা জড়িদার কামিজ হেঁকে টিম্‌পার দেখত। পঞ্চাশ রকম ময়দার খাবার হত। পঞ্চাশটা লোক খাটত। লবাব খেয়ে বলত, তোফা।'

জড়িদার কামিজ পরে তণ্ডুলের টিমপার অর্থাৎ তাত পরীক্ষা করা যায় কি না, সেটা পরের কথা। মেঘনাদ বলে, 'লবাবী খানা দু' চারটে শিখে রেখেছ?'

ইদ্রিস হাসে, লজ্জা আর হতাশার হাসি। মুখটি পরিষ্কার। কেবল চিবুকে ঘন এক গুচ্ছ দাড়ি। তার কটা রং-এর শক্ত বুকটা লাল হয়ে থাকে সব সময় তন্দুরের তাপে। বলে, 'তা' হলে কি আর এখানে বসি। চলে যেতাম লবাব বাদশা'র ঘরে।'

যেন লবাব বাদশা'র ছড়াছড়ি চারদিকে। ইদ্রিস দাড়ি নিংড়ে ঘাম ঝেড়ে বলে, 'তাই বা কি বলব বাবু। ব্যাটাদের নিয়ে কারখানা খুলেছিলাম চুঁচড়োয়। কিছু না হোক্ হপ্তায় মণ খানেক মালের কাজ করতাম। লড়াই লাগল, ময়দা হাওয়া হয়ে গেল। চার ব্যাটা সুদ্ধ নিজে বেকার। এখন এক ব্যাটা কাজ করে হাওড়ায় এক বেকারীতে। আর তিন ব্যাটা গাঁয়ে বসে। এক ব্যাটা গেল সাল থেকেই ক্ষেত মজুরিতে লেমেছে। এই সালে বাকী দুই ব্যাটাও লেমে যাবে। কি করব? চার ব্যাটার চার বউ। দশটা আমার লাতি। দুই বেটির সাদী দিয়েছিলাম, দুই মিস্তিরির সঙ্গে। কলকাতা বেকারী কারখানায় কাজ করত তারা। লড়ায়ের ধাক্কায় বেকারী গেল। বেকার হল, এক জামাই মরে গেল না খেয়ে। মেয়েটা নিকা করল কি করল, জানিনে। বে-পাত্তা হয়ে গেছে। আর একটা আছে, জামাইটাও বেঁচে আছে। গত সালের দাঙ্গার পর থেকে তাদের কোন পাত্তা মেলেনি। তারপর, দেশ ভাগাভাগি তো শুরু হয়ে গেছে। এবার কোন্‌দিন আমাকেও তল্‌পি গোটাতে হবে।

মেঘুর মন জয় করে ফেলেছে ইদ্রিস প্রথম থেকেই। একের ব্যথা আর একজনের লাগে। এখন শুধু দুজনে দেখা হলে হাসে। চোখে চোখে তাকালেই মনের কথা বুঝতে পারে তারা।

কোন কোনদিন ইদ্রিস হঠাৎ বলে, 'আমাদের গাঁয়ে ছ' ঘর এ কাজই করে আসছি। ছ' ঘরের একই হাল।'

দেশের সর্বত্র উত্তেজনা। এখানে সেখানে সভা। প্রত্যেক শনি রবিবারই রাস্তায় রাস্তায় মিছিল। কেউ বলছে, হিন্দুস্থান চাই। কেউ বলছে চাইনে। ভাল মন্দ বোঝার কোন উপায় নেই। যুক্তি উভয় পক্ষেই আছে।

মেঘু ইদ্রিসকে ছাড়িয়ে যায় আরো দূরে। শহরতলীর মানুষ ছড়ানো রাস্তা। চারদিকে বস্তির ভিড়। ধোঁয়ায় আর ধূলোয় যেন দম আটকে আসে। কখনো মনে হয়, নারায়নগঞ্জের উপর দিয়ে চলেছে। কখনো চাঁদপুরের মেঘনার ধারে কিংবা ইসলামপুর—আরমানিটোলার ভিতর দিয়ে। তার পথের কোন স্থিরতা নেই। সোজা যায়, সোজা আসে। বেঁকতে ভয় হয়। ভয় নয়, পথ হারিয়ে যাবে। সেজন্য যায় না।

বাইরে থেকে তার অস্থিরতা ধরা যায় না। কিন্তু তলে তলে প্রচণ্ড স্রোত পাড় ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে। তার যাতায়াতের পথে তিন চারটে দেশী মদের দোকান পড়ে। পানের ঝোঁকটা অনেকদিনের। যেদিন মন টেনে নিয়ে যায়, সেদিন আর রুখতে পারে না। কোন কোনদিন ঢুকে পড়ে সেখানে। গেলাসের পর গেলাস খেয়েও অবাক হয়ে বসে থাকে। কিছুই হয় না।

দোকানে যারা রোজকার খদ্দের, মেঘনাদ এলে তারা সবাই ঘিরে আসে তাকে। মেঘনাদের মদ খাওয়া দেখে তারা। মেঘনাদের মত হিম্মৎওয়ালা মহাপুরুষ তারা কোনদিন দেখেনি নাকি। বলে, এরকম মাল খাওয়া দেখলেই নেশা লাগে। খেতে হয় না। তাও মাত্র তিন চারদিন খেয়েছে। তার মধ্যেই পরিচয়টা ছড়িয়ে পড়েছে।

মেঘু বেরিয়ে আসে ভয়াবহ অতৃপ্তি নিয়ে। ভয়াবহ-ই বলতে হয় সেই অতৃপ্তিকে। একটু পা টলে না, মাথা ঘোরে না। শুধু চাউনিটা হয়ে ওঠে

আরো ভয়ংকর। চলাফেরা হয়ে ওঠে ধীর। সব মিলিয়ে তাকে আরো প্রকাণ্ড দেখায়।

বাড়ি ফিরে এলে নকুড় ভয়ে মুখ খোলে না। সুকুমারি দূরে থাকে। ষোড়শী তো পালায়। লীলা বিদ্রূপ করে। হাসে খিলখিল্ ক'রে। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘনাদের উপর। কথা বলাতে চায় মেঘনাদকে। মদ খাওয়ায় যে তার তেমন আপত্তি আছে মনে হয় না। কিন্তু মদ খেয়ে মেঘুর এই পাথুরে স্তব্ধতা আর অপলক চাউনি সে সহ্য করতে পারে না। সে চায় মত্ততা। হাসি ও সোহাগের মত্ততা। সমস্ত স্তব্ধতাকে সে ভেঙ্গে ফেলতে চায় খান খান করে। ওই জমাট পাথরের অন্ধ গুহাটার মধ্যে অজস্র আলো জ্বালিয়ে তুলতে চায়।

কিন্তু মেঘনাদের বুকের অন্ধকারে আলো জ্বলে না। পাষাণ গলে না। কোন গুঞ্জনই ওঠে না সেখানে। লীলা শুধু বিষদাঁত ভাঙ্গা ক্রুদ্ধ কালসাপিনীর মত পড়ে থাকে—বিস্রস্ত বেশবাসে। অসুরের মত মেঘনাদ। একটা তুলোর দলার মত ছিন্নভিন্ন করে ফেলে রাখে তাকে। ঢেকে রাখে তার বদ্ধ হৃদয়ের অন্ধকার দিয়ে। তার পাথুরে স্তব্ধতার থাবাড়ি দিয়ে ফেলে রাখে। আর লীলা শুধু অসহ্য আক্রোশে ফোঁস ফোঁস করে। জ্বলন্ত চোখে মেঘুর বিশাল শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকে। অভিশাপ দেয়। অপমান বোধ হয়। দুরন্ত ক্রোধে গালে খাম্‌চি কেটে কেটে মোছে চোখের জল। দেহের তৃপ্তি নয়। মনের অতৃপ্তি জ্বলে ওঠে তারপর দাউ দাউ করে। মেঘনাদকে সে তার নিজের মত করে ভেঙ্গে গড়তে চায়। মেঘনাদের আসল যন্ত্রনা সে বোঝে না। সে জানে মানুষ মদ খায় সুখে। সুখ ভোগ বেপরোয়া প্রেমের জন্য।

অস্থির হয়ে ওঠে বিজয়। বাড়িতে সে কারুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে না। কথা বলে মেঘনাদেরই সঙ্গে। তার অস্থিরতা অন্যরকম। মেঘু সেটা বোঝে। বুঝেও, দুজনে আলোচনা ঠিক জমিয়ে তুলতে পারে না। আসল ব্যাপারের শুরুটা বিজয়ও ভাল জানে না।

তারপর বিজয় রাজীবের সঙ্গে আলোচনা করাই স্থির করে।

দূর থেকে তাকিয়ে দেখে শুধু তিলি। মা-বাপের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে না সে। এসব কতখানি বোঝে, সে-ই জানে। কেবল বড় বড় দুটি চোখে তাকিয়ে থাকে। লীলার সে সবটুকু ভেবে উঠতে পারে না। দিদির ব্যবহারে কখনো তার বিতৃষ্ণা, কখনো বিদ্বেষ দেখা দেয়।

সে ব্যথা পায় মেঘনাদকে দেখেই। লীলা তাকে নিয়ে এখানে সেখানে যাচ্ছে। বাবা মা দিনরাত্রি ফুসুর ফুসুর, গুজুর গুজুর করছে। ষোড়শী ছেলে নিয়ে, সংসার ও বিজয়কে নিয়ে মেতে আছে। শুধু ওই একটি লোক। যার মুখে কোন কথাই নেই। চোখ তুলে তাকালে মায়া হয়। যেন একটা বোবা জীব। অশ্রুহীন চোখে, দিবানিশি গুম্‌রে গুম্‌রে মরছে। যার খেতে সাধ নেই, কথায় মন নেই। কাউকে আঘাত দেয় না। নিজের দুঃখের ভাগ দিতে চায় না কাউকে। সে বোঝে, এ সংসারে একজনের দুঃখের কথা কেউ জানতে চায় না। একজন যখন দুঃখে নীরব, আর একজন তখন শুধু হাসে। এই তো সংসারের নিয়ম। এ বোধটুকু তিলির মর্মে মর্মে আছে।

অথচ মেঘনাদ বিজয়ের সঙ্গে হেসে কথাও বলে। তিলিকে মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করে। শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে ভদ্র ভাবে। অথচ দিদি জামাইবাবুকে শুধু বিদ্রূপ আর ঠাট্টা করে। রাগে জ্বলে ওঠে। সিনেমার নেশায় উন্মাদিনী। সন্ধ্যে হলেই বলে, চল্ টকি দেখে আসি। টেনে নিয়ে যাবে তিলিকে। আর খালি বলবে, 'ভ্যাখ ঠুমি, লোকটা কেমন ঠায় তাকিয়ে আছে মাইরী।' বলে সে নিজেও তাকিয়ে থাকবে! প্রশ্রয়ের হাসি হাসবে রাস্তার হাসির জবাবে। আশকারা পেয়ে কেউ হয় তো পিছুই নেয়। তিলি ভয় পায়, রাগ করে।

লীলা বলে, হেসে হেসে, 'ভ্যাখ, ভগবান ভক্তর মুখ চায়। এরাও তো ভক্ত।'

তিলি বলে, 'তোর মুণ্ডু। জানিস্‌নে তো। দেখবি একদিন সর্বনাশ করবে।'

লীলা বলে, 'একটু হাসলেই সব ঠাণ্ডা। সর্বনাশ করবে ওরা?'

ইতিমধ্যেই লীলার খ্যাতি রটেছে পাড়ায়। বিজয় মিস্তিরির দিদিকে নিয়ে সব জায়গায় আলোচনা। সিনেমার প্রতিটি কর্মচারী চেনে তাকে। সব জায়গায় কিছু কিছু রং ছুঁড়ে দিয়েছে লীলা।

কোন কোনদিন তিলিকে ছাড়াই বেরিয়ে যায় লীলা। যতক্ষণ ফিরে না আসে তিলির বুকের মধ্যে ধুক ধুক করে। কেউ এসে ডাকলে চমকে ওঠে। হয়তো কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। অথচ লীলাকে বলার কেউ নেই। মা তো দিবানিশি কেবলি খোশামোদ করছে। বাবাও তাই। বিজয় সংবাদই রাখে না হয়তো। তিলিকে মানে না লীলা।

দুদিকে দুই রকম। মেঘনাদের দিকে তাকালে তিলির বুকের মধ্যে টনটন করে। কোন পাপ নিয়ে সে তাকায় না মেঘনাদের দিকে। একজন অসহায় মানুষের দিকে যেমন করে তাকায়, তেমনি করুন চোখে-ই তাকায়।

মেঘনাদ হঠাৎ ঠাট্টা করে বলে, 'কি গো, দিদি আর কিছু দিল?'

তিলিও ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার ভয়ে কিছু দেওয়ার যো আছে নাকি?'

লীলা সামনে থাকলে বলে, 'নিজে দেওনা এনে। খালি মুখে বলে কি হবে।' মেঘনাদ হেসে বলে, 'দেব দেব, দাঁড়াও কাজে হাত দিই। যদি ভাগ্যে থাকে, গা ভরে দেব একেবারে।'

লীলা বিদ্রূপ করে হাসে। তিলির মনটা যায় ভার হয়ে।

বিজয়ের কথানুযায়ী অপেক্ষা করতে লাগল মেঘনাদ। রাজীব আসবে দু'একদিনের মধ্যেই। বিজয়দের রাজীবদা, তাদের ইউনিয়নের নেতা। বিজয় আশ্বাস দিয়েছে, রাজীব প্রাথমিক ব্যবস্থা একটা করে দিতে পারবে।

চৌদ্দই আগস্ট সারারাত্রিই একটা কোলাহলের মধ্যে কাটল। রাস্তায় রাস্তায় লোকের ভিড়। গলিতে গলিতে সবাই জেগে। যাদের বাড়িতে রেডিও আছে, তাদের বাড়ির সামনেই ভিড় সবচেয়ে বেশী। রাত্রি বারোটার পর জহরলাল নেহরু বক্তৃতা দিলেন। পনরই আগস্ট শুধু মিছিল। মিছিলের পর

মিছিল। ড্রাম আর বিউগ্‌লের বাজনা। বাড়িতে বাড়িতে পতাকা উড়ছে। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেল।

আজ শেষদিন। সিরাজদিঘার হাট পাকিস্তানের আঞ্চলিক বন্দর। একটা পোস্টকার্ড আর দোয়াতকলম নিয়ে বসে রইল মেঘনাদ। বিপিনকে চিঠি লিখবে। কিন্তু লিখতে পারছে না। আঁকাবাঁকা করে খালি লিখেছে, ভাই বিপিনদাদা…।

বিজয় একবার বাড়িতে আসছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। মেঘনাদকে ডাক দিয়ে গেছে কয়েকবার। বলেছে, শত হলেও, নিজের দেশের লোকেরা দেশের ভার নিচ্ছে। আজ আমরা স্বাধীন। আজ আনন্দ করতেই হবে।

মাতামাতির কয়েকদিন পর রাজীব এল। এ বাড়িতে সে অনেকবার এসেছে, চেনে সবাইকে। এ মহল্লার সবাই চেনে তাকে। মাঝখানে আসতে পারেনি পনরোই আগস্টের ব্যস্ততায়।

নকুড় বলল, 'আসুন আসুন।' বলে পায়ে হাত দিতে গেল। ব্রাহ্মণের কৃপাভিক্ষা নকুড়ের রক্তে। সুকুমারিরও তাই। তাড়াতাড়ি তার ছেঁড়া মাদুর পেতে দিল। বলল, 'বসুন বাবা। অনেকদিন বাবাকে দেখতে পাইনি।' বলে পায়ে হাত দিতে গেল। দু'বারই পেছিয়ে গেল রাজীব। বলল, 'ছি ছি ছি, অনেকদিন বারণ করেছি। এসব আমার খুব খারাপ লাগে।' কিন্তু যে আলোতে সে ভাল মন্দ বোঝে, নকুড়ের কাছে সেই আলো অনাচারের সামিল।

বিজয় বলল, 'বোনাই কোথায়?'

বলে নিজেই ছুটে গেল কোণের ঘরে। চুপচাপ বসেছিল মেঘু গালে হাত দিয়ে। সেই ছোটবেলার অভ্যাস এমনি গালে হাত দিয়ে বসা। বিপিন ধমকে উঠত, 'গাল থেকে হাতটা নামাও দিকি।'

বিজয় বলল, 'চল, রাজীবদা এসেছে।'

মেঘনাদ এল কাপড়ের খুট গায়ে দিয়ে।

ভাবে ভঙ্গিতে সব সময় যেন বড় ব্যস্ত রাজীব। মাঝারি লম্বা, রোগা রোগা দেখতে। ফর্সা রং। ওর উপরে খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবী তাকে মানিয়েছে

ভাল। মাথার চুলগুলি বেশ বড়। একটু অগোছাল, কিন্তু অবিন্যস্ত নয়! উড়ন্ত পাখির মত দুটি অত্যুজ্জ্বল চোখ। দিকে দিকে দৃষ্টি। যেন কি ভাবে। কি যেন খোঁজে সব সময়। সব মিলিয়ে একটা তীব্রতা আছে তার মধ্যে। কোন কথা বলে পার পাওয়া যাবে না এর কাছ থেকে। দৃষ্টির বাইরে পালিয়ে যেতে পারবে না কেউ।

মাইল খানেক দূরের এক মাঝারি ব্যবসায়ীর অনেকগুলি ছেলের এক ছেলে সে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জেল খেটেছিল। লেখাপড়া ছেড়েছিল তার অনেক আগে। তখন সে ভাবত, পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করবে। কিন্তু বিয়াল্লিশ সালটা তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। জেল থেকে ফিরে এসে দেখল, একটা নতুন রাজ্যে এসে পড়েছে সে। এতদিন সে ছিল আর দশটা ছেলেরই মত। পাড়ায় এবং বাড়িতে সব জায়গাতেই। জেল থেকে ফিরে দেখল, সে অনন্য-সাধারণ হয়ে উঠেছে। সে নায়ক হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ ঘটে গেল কলকাতার সঙ্গে। কলকাতার নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হল। সেখান থেকে দু' চারটে এমন কথা শুনল সে, তার চোখে কানে স্থির বিদ্যুতের মত লেগে রইল সেগুলি। কলকাতার নেতাদের মধ্যে যাদের যাতায়াত ছিল এখানকার শ্রমিক অঞ্চলে, তাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করল সে। দেখা গেল, নেতৃত্বের ব্যাপারে তার প্রতিভা কিছু কম নেই। আশেপাশে বিরোধ ছিল অনেক। কিন্তু তার সন্ত জেল খাটা জীবনের ধারে, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার কথার ভাবে আসর জমে উঠেছে তার।

নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছে তার সত্যি। বিলোতে গিয়ে দেখল, নেবার পাত্র নেই। বিতৃষ্ণা এসে পড়ল মনে। দেখল, শ্রমিকদের মধ্যে আর যা-ই থাক্, দেশপ্রেম বলে বস্তুটি নেই। উল্টো বল, সোজা বল, সব কিছুতেই মাথা নেড়ে যায় এরা। ব্যক্তিত্বের কাছে সব বর্ষার কাদা মাটির কেঁচো। মাঝে মাঝে খেপে যায়। তখন ওরা ভগবানকেও মানে না। সেটা এদের নীচ জীবনে যে পশু লুকিয়ে আছে, তারই কারসাজি। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা ওই পশুটাকে খেপিয়ে তোলে মাঝে মাঝে। এই মানুষ-

গুলিকে নিয়ে তাকে আন্দোলন করতে হবে ভেবে, হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল সে একসময়। এরা কখন শান্ত, কখন খ্যাপা, কখন কি বোঝে সেটাই আজ অবধি ধরা গেল না। ছেড়ে দিতে চেয়েছিল একাজ।

কিন্তু কলকাতা ছাড়ল না। কলকাতা তাকে বুঝিয়ে ছিল, লোকগুলিকে সামলে রাখ। যে মহান ব্রত আমরা পালন করতে যাচ্ছি, এরা খেপে গেলে তা' অনাচারে পথভ্রষ্ট হবে। ওদের জড়ো করো আমাদের রাস্তার ধারে ধারে।

রাজীব সেই সামলে রাখার দিকটাই বজায় রেখে এসেছে এতদিন। ওটা মিশে গেছে তার হাড়ে মজ্জায়। সে জানে, সামলে রাখাটাই কাজ। তার জন্য বল বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন। দিনে দিনে সেটা আয়ত্ত করেছে রাজীব। তার সামনে জগতের বিচিত্র এক দুয়ার খুলে গেছে। তার পরিচয়ের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত। রোমাঞ্চকরও নিঃসন্দেহে।

আজ সে এখানে কোন আশা নিয়ে আসেনি। ভেবে চিন্তেও আসেনি। বিজয় ডেকেছে বলে এসেছে। বিজয় যেমন বাড়িতে, তেমনি কারখানায়। হেঁকে ডেকে সে সব জায়গায় এমন একটি অনায়াস আসর তৈরী করে রেখেছে, সেখানে আর কারুর কথা বিশেষ চলে না। রাজীবকে বিজয় মানে। কেন মানে, সেটা বড় বিচিত্র। রাজীবের জেল খাটা জীবনের প্রতি, তার কথা ও চলা ফেরা সব মিলিয়ে বিজয় খানিকটা মুগ্ধ। আর রাজীব বোঝে বিজয়কে খানিকটা। সে জানে, কারখানার ওই দুর্বোধ্য মেজাজের লোকগুলিকে বিজয় জানে। বিজয় হল তার চাবিকাঠি। ওই চাবি দিয়ে সে ওই লোকগুলির অন্ধ কুঠুরিতে মাঝে মাঝে যাতায়াত করে। বিজয়কে সামলানো মানে, একটা পশুশক্তিকে সামলানো। এইটুকু বুঝে, রাজীব বিজয়ের ইচ্ছা পূরণে কার্পণ্য করে না।

বিজয় ডেকে নিয়ে এল মেঘনাদকে। রাজীব তার মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। মানুষ ভেবে আসে একরকম, হয় আর একরকম। বিজয়ের ভগ্নিপতিকে যেরকম ভেবেছিল সে, সেরকম নয়। সে

ভেবেছিল নীরিহ চেহারার আধবুড়ো একটি গেঁয়ো মানুষ হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সামনের লোকটি একেবারে অন্যরকম। মনে হয় কথা বলতে গেলে ধমকে উঠবে বুঝি।

কিন্তু ওটাই মেঘনাদের চেহারা। মানুষ হিসেবে দুর্দান্ত নয়। নিরীহ ভাবটুকু তার চোখে মুখে এমন ভাবে আত্মগোপন করে থাকে, হঠাৎ ধরা যায় না।

রাজীব বলল,, 'বসুন।'

মেঘনাদ বসল। রাজীবের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি হতে লাগল তার। এসব লোকের সঙ্গে কোনদিন আলাপে অভ্যস্ত নয় সে। কারবারে তো অনেক দূরে। জীবনে দু' একজন স্বদেশী লোক দেখেছে সে। সিরাজদিঘার কাছে শ্রীনগরের মহাদেব বসু এক ঘোরতর স্বদেশী মানুষ। তার জীবনের বিচিত্র কাহিনী শুনে মেঘু মনে মনে নমস্কার করেছে। এঁরা দেশ স্বাধীনে ব্যস্ত, প্রাণ তুচ্ছ। ব্যবসা, কোন কিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে যন্ত্রণা, কষ্ট, প্রতি মুহূর্তে ঘা খাওয়া, ভেঙ্গে পড়া, তবু মাথা তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ; তার যে আনন্দ, যে মহত্ব, এসব মানুষের সঙ্গে কথা বললে, সেসব কেমন নিরর্থক মনে হয়। 'স্বাধীনতা' না বোঝা পাপ। কিন্তু রুটির কারখানার অবস্থা না বোঝাটা তো তাদের অন্যায় নয়! স্বদেশী করে ইংরেজ তাড়ানোর কথা বলে সবাই। মেঘনাদ ভাবে, সুযোগ পেলে ইংরেজের মত যন্ত্র দিয়ে নতুন মাল বাজারে ছাড়ত সে। একবার দেখে নিত, কেমন করে পয়সা নিতে পারে ওরা। সে না হয়ে, গুনোহাটির বদরুদ্দিনও যদি একাজটুকু করতে পারত, তার কোন বিদ্বেষ থাকত না। কেন না, যে কাজের মধ্যে সে নিত্য নতুন উদ্ভাবনের আনন্দ পেয়েছে, তার সেই কাজের প্রথা রীতি নীতিকে ওরা ওদের যন্ত্র ও অর্থের আলোয় চিরদিন বিদ্রূপ করেছে। চেয়েছে ধুয়ে মুছে দিতে। মিথ্যা দোষারূপ করে অপমান করেছে।

একই পথের শরিক হয়ে ওরা ডঙ্কা মেরে চলে। আত্মসম্মানে লাগবে না মেঘনাদের! কিন্তু এ বোধ তো দেশপ্রেম নয়। এ তো শুধুমাত্র ব্যবসায়ীর

চিন্তা। রাজীবের সঙ্গে কি কথা বলবে সে। তার সমস্যা রাজীব বুঝবে কেমন করে।

রাজীব চঞ্চল ছেলের মত একটু নড়েচড়ে বসল। আরো বার কয়েক দেখল মেঘনাদের মুখের দিকে। যেন সে কোন বক্তৃতামঞ্চে উঠেছে। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মেঘনাদ এসে যদি বলত,'এই যে এসেছেন কি ভাগ্যি! আপনারই পথ চেয়ে বসেছিলাম।' তা' হ'লে, 'আরে ছি-ছি' গোছের কোন পোশাকী কথা বলে শুরু করতে পারত সে। কিন্তু এমন পাথরের মত নিরেট আর নিশ্চুপ। যেন ধাক্কা মারলেও কথা বলবে না।

তারপরে হঠাৎ রাজীব বলে উঠল, 'তা' হ'লে জামাইবাবু আপনার কি অসুবিধে হচ্ছে আমাকে বলুন তো।'

তার এ আত্মীয়তার সুরটা যেন বেজে উঠল বেসুরের মত। নকুড় আর সুকুমারি বিগলিত হয়ে হাসতে গেল। কিন্তু হাসি হাসি ভাবটা আড়ষ্ট হ'য়ে রইল। বিস্মিত খুশীটুকু কেমন যেন মূঢ় করে দিল। রাজীব জামাইবাবু বলছে ঝুমির বরকে! মেঘুর গরবে গরব নয়। এ গৌরব রাজীবের বলার গরবে।

মেঘনাদ বিব্রত হল। তার সমস্ত অস্বস্তিটুকু এসে জমা হল গোঁফের ফাঁকে। লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, অসুবিধে আর কি!'

কিন্তু কথাটা শোনাল যেন, না না জামাইবাবু বলার কি আছে। তা ছাড়া, কেমন যেন হাস্যকর মনে হতে লাগল সমস্তা ব্যাপারটা। মেঘনাদের অসুবিধা! তাও শুনতে চায় রাজীব। কাজ যার স্বদেশী করা। মেঘনাদ অন্তত তা-ই জানে! কত অসুবিধে! দেশ ভাগটাই একটা মস্ত অসুবিধে! সমস্ত কিছু ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়ার মূলে। আর সেই দেশ বিভাগকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে রাজীবেরা।

রাজীব ভোলেনি, মেঘনাদ আর যা-ই হোক, বিজয়ের ভগ্নিপতি। রাজীবের সামনে মুখ খুলতে তার লজ্জা সঙ্কোচ তো হবেই। দেখতে যা-ই হোক, চরিত্রটা যাবে কোথায়। সে যেমন করে শ্রমিকদের বোঝায়, তেমনি করে

বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করল মেঘনাদের সামনে। বিষয়বস্তু হল স্বাধীন ব্যবসা ও স্বাধীন দেশ। সে বলল, এতদিন মেঘনাদের মত ব্যবসায়ীরা ছিল পরাধীন। তাদের পেছনে ছিল না কোন শক্তি, কোন শক্ত খুঁটি। কোন সহৃদয় রক্ষাকর্তা, কোন অভিভাবক। আজকে এসেছে সেইদিন। স্বাধীন ব্যবসার এতদিন কোন অর্থ ছিল না। আজকেই তো শুরু করতে হবে। সেই শুভদিন উপস্থিত হয়েছে আজ। যে শুভদিনকে মেঘনাদেরা এনেছে সমবেতভাবে।…

মেঘনাদ অবাক হয়ে শুনতে লাগল। মোম লাগানো সুতোর মত টান টান হয়ে উঠল তার গোঁফজোড়া। চিবুকের হাড় দুটো নেমে গিয়ে চোখ দুটি বেরিয়ে এল মোটা ভ্রূর তলা থেকে! সে অবিশ্বাস করছে না রাজীবকে। বুঝতে পারছে না। বোঝার উপর নির্ভর করে বিশ্বাস অবিশ্বাস! ব্যবসার কথা শুনেছে অন্যরকমভাবে। এরকমভাবে নয়! এরকম স্বদেশীর মুখ থেকে। তা' হলে একটু একটু মাথা নাড়তে পারত সে।

মাথা নাড়ছিল নকুড়। লোমহীন ভ্রূ দুটি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, বিস্মিত শ্রদ্ধায় মাথা নাড়ছে। যেন বলতে চাইছে, অ্যাঁ অ্যাই! এই হচ্ছে আসল কথা। সুকুমারি সবাইকেই দেখছে। মাথা নাড়ছে না, হাসছে না। এমন কি রাজীবের কথাগুলিও ঠিক শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। বোঝা না বোঝা তো দূরের কথা। চোখে তার অন্য কিছু। মুখে তার অন্যভাব। দুশ্চিন্তার রেখাগুলি ঘন হয়ে উঠছে শুধু সারা মুখে। তার ঘষা ঘষা বৃদ্ধা চোখে দুরন্ত অভিমান ফুটছে থেকে থেকে, যখন সে নকুড়ের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু নকুড় যেন রাজীবে লয়।

ভেতরের বারান্দার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লীলা আর তিলি। লীলা রাজীবকে দেখছে। চোখ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে তাকাচ্ছে তিলির দিকে। ফিস্‌ফিস করে বলছে, 'বিজার রাজীবদা বেশ দেখতে। তুই কি বলে ডাকিস্?'

তিলি বলল, 'রাজীবদা-ই বলি।'

কনুই দিয়ে একটু চাপ দিয়ে বলল, 'ভাব জমিয়েছিস্ বুঝি খুব?'

হেসে বলল তিলি, 'খু-উ-ব।'

দরজার স্বল্প পরিসরে আবার কনুই দিয়ে ঠেলে দিল লীলা তিলিকে। বলল, 'অমনি চাপছিস্। কত ছেনালী যে জানিস্।'

গালাগাল নয়। ওটুকু লীলার সোহাগের ভাষা। তিলি বলল চাপা হেসে, 'চাপলাম কোথায়। বললাম তো, একেবারে গলায় গলায় পীরিত।'

তবু লীলার চোখ দুটি বেঁকে রইল। পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি সে। আর এতক্ষণে বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগল তিলির ঠোঁট। রাজীবের কথাই ভাবছে সে। রাজীবও তাকে ভাসিয়ে নিতে চায়। কিন্তু চোরাবন্যায়। রাজীব শিস্ দেয় না, গান গায় না। হেসে হেসে রাশি রাশি কথা বলে না প্রেমের। প্রেমে বোকা হতে চায় না সে। এমন কি তার ফর্সা ধবধবে মুখে কোন ভাবের উদয় হয় না। ভ্রূ কাঁপিয়ে, চোখের নিঃশব্দ চোখা চোখা কথা ছুঁড়ে দেয় সে। যখন সে পুরোমাত্রায় সপ্রতিভ অনর্গল কথা বলে অন্য বিষয়ে, তখন চোখ দিয়ে সে বাণ ছোঁড়ে। অবলীলাক্রমে খবর পাঠায়। আর একটা জগত আছে যে রাজীবের। সেই জগতের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চায় না সে। পারেও না যে। তা'ছাড়া বিজয় মিস্তিরির বোন যে! নিজেকে প্রকাশ করবে কেমন করে। তাই শুধু নিঃশব্দ কথা। আশ্চর্য! যার উদ্দেশ্যে বলা, যেন তাকেও জানতে দিতে চায় না। যদি বা দেয় তা অস্পষ্ট। হঠাৎ আক্রান্ত হ'লে, যেন চট্ করে জবাব দিতে পারে। আত্মসম্মান ও পাল্টা আক্রমণের পথ থাকে যেন খোলা।

আর তার চোখের নিঃশব্দ কথাগুলি যত শোনে তত হাসি পায় তিলির। কী বোকা! স্থূল উল্লসিত মানুষগুলির চেয়ে, এ বোকামি আরো বড়। সব ঢেকে একটুখানি খুলে রাখার মত। বাকী মানুষগুলির সবটাই খোলা। বুঝতে কাউকেই কষ্ট হয় না। বরং বিশ্বাসের তারতম্য ঘটে। নকুড়ের সঙ্গে কথা বলতে, সুকুমারির কথা শুনতে বিজয়কে কারখানার কথা বোঝাতে বোঝাতে কথা বলে সে চোখে চোখে, বাঃ বেশ। কী সুন্দর তুমি। তোমার মুখ, তোমার বুক, চলায় চলায় তোমার কী বিচিত্র কটি-তল উল্লাস। আমাকে

কেমন লাগে? আমি রাজীব মুখুজ্জে, রাজনীতি জ্ঞানসম্পন্ন, শ্রমিক নেতা, আমার এই সুন্দর চেহারা। কেমন লাগে?

তিলি কাছে কাছে, দূরে দূরে, কাজে কাজে ফেরে, আর নিঃশব্দে বলে, 'বুঝিনে বুঝিনে কিছু।' না বুঝে সে সরল ভাবে মিঠে মিঠে হাসে। অবাক হয়ে চায়। মুখ ঘুরিয়ে হাসে, বিদ্রূপ করে। অপমানে ও ব্যথার খচ্ করে একটা ব্যথা ধরে যায়। কেউ বোঝে না, বুঝবে না। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আর অতিকায় সরীসৃপের মত জড়িয়ে জাপটে ডুবিয়ে দেবে অতলে। অথচ এ শূন্য বুকের ঝড় আর সহ্য হয় না।

লীলাকে কি বলে বোঝাবে সে। ওর কাছে পুরুষ যেন তাসের সারি। সেরা রংটি এলে, রং খেলে, খেলার নম্বর নেয় গুনে গুনে।

মেঘনাদও ঠিক বুঝতে পারছে না। রাজীবের কথাগুলি যেন অন্য কোন জগৎ থেকে ভেসে আসছে। কোনো দূর বেতারের অস্পষ্ট নিরর্থক বক্তৃতার মত। তবু মাঝে মাঝে এক একটা কথা মনটা টেনে নিচ্ছে। রাজীব যখন বলছে, 'আপনারা দেশের সম্পদ। আপনারাই তো দেশের পয়সা দেশে রাখতে পারবেন।' সম্পদ কিনা মেঘনাদ জানে না। কিন্তু দেশের পয়সা দেশে থাকার প্রয়োজনীয়তা কেভাবে শেখেনি সে। ওটা তার ব্যবসা জীবনের অভিজ্ঞতা। নিজের কারখানার মাল যদি সে নিজে দশটা জেলায় দশটা দোকান করে কাটাতে পারত, তবে পাইকেরের ঘরে পয়সা যেত না। এটা সেই রকম। দেশে সে তো একলা নয়। কারবারী আছে আরো অনেক। সকলে যেটা রাখতে পারত ঘরের ব্যবসা বাড়াতে, সেই টাকাটা অন্য দেশে গিয়ে অন্য ব্যবসা ফাঁদছে।

রাজীবের গলা আস্তে আস্তে ভারী আর আবেগে উঠল ভরে, 'এবার আপনাদের গভর্নমেণ্ট পেয়েছেন। আপনাদের সুযোগ সুবিধে সকলের আগে। আপনারা যাতে আরো উন্নতি করতে পারেন, ব্যবসাকে আরো বাড়াতে পারেন, গভর্নমেণ্ট সেদিকেই নজর দেবে। স্বাধীন যুগে আমাদের বানিজ্য জাহাজ ভিড়েছে বিশ্বের বন্দরে বন্দরে। আজ আবার আমরা বানিজ্য করতে বেরিয়ে পড়ব সমুদ্রে...

কল্‌কল্‌ করে জলোচ্ছ্বাস প্লাবিত করল হঠাৎ মেঘনাদের মন। আজ বয়স হয়েছে, বুদ্ধিও বেড়েছে। তবু, সেই সওদাগর বসে আছে বুকে মসলিনের ছিন্ন পোশাকে মুখ ঢেকে। পৃথিবীর হাটে হাটে, ঘাটে ঘাটে বাণিজ্য করে ফিরবে সে। এই তার মনে ছিল।

সেই মন আজ পেকেছে অনেকখানি। আজকের সওদাগর সপ্তডিঙ্গা ভাসায় না। তার দ্রব্য সম্ভার যায় পৃথিবীর দেশে দেশে জাহাজ ভাসিয়ে। পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় গেছে একদিন। আজ রাজীব তাকে আরো বিস্তৃত করে দিচ্ছে চোখের সামনে। আচ্ছা, যদি রাজীবের কথাই সত্য হত! যদি সত্য হয়! মদনসা'র ব্যাটা মেঘুর তা' হ'লে স্বপ্ন সার্থক হয়। সে হবে ধনপতি সওদাগর। সওদাগর মেঘনাদ দাশ। ওটাই তো তার হৃদয়ের মূলধন।

রাজীব বসেছে বারান্দার দরজার মুখোমুখি। কিন্তু নজরে পড়েনি দুই বোনকে। সে কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করছে মেঘনাদকে। মেঘনাদের প্রতিটি ভ্রূ ভঙ্গি, গোঁফের ওঠা নামা, চোখের আলোছায়া। এমন কি মেঘনাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যেমন করে সে তার পরিচিত প্রত্যেকটি মজুরকে দেখে। এমনি করেই দেখে। এমনি দ্রুত চিন্তিত অস্থির তীক্ষ্ণ চোখে। মজুরকে দেখে, তার নির্দেশের এবং আদেশের অন্তরায় হবে কিনা। মজুর যাচাই করাই তার কাজ।

আরো কিছু তার কাজ আছে জীবনে। যে জীবনটাকে আজ সে ত্রিশ বছর পার হয়ে সুচিন্তিত ও ধীরভাবে দেখতে শিখেছে। জীবনে একটা পথ বেছে নিয়েছে সে। অনেক দূরে, বহু দূরে, অনেক উঁচুতে গেছে তার নজর। একটা অস্পষ্ট সিঁড়ি তার চোখে পড়েছে। যে সিঁড়িটার সামনে অনেক ভিড়, ঠেলা-ঠেলি, মারামারি, কাড়াকাড়ি। ভিড় করা লোকগুলির সব গাল-ভারী স্বদেশী পদবী আছে। কিন্তু রাজীবের তুলনায় তারা ইডিয়েট্‌। রাজীব তা বোঝে। সে বিশ্বাস করে, তার মত স্কুল পালানো, সেই দুরন্ত ছেলেটাই আজ সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড় হতে পারে। পাখোয়াজ হিরোর মত পারে ওই ভিড় কাটিয়ে তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে। সে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আর তার হাতেখড়ি হয়েছে এই শিল্প এলাকায়। যেখানে বিজয়দের মত

লোকেরা এমনিতে শান্ত। সংশয় হলেই মুঠি বাড়ায়। শত্রুকে হাতে পেলেই প্রাণের ভয় না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মজুর জীবন থেকে, কলকাতার চেম্বারের প্রতিটি অন্ধ গলির অন্ধি-সন্ধি জানা আছে তার। ওই লোকগুলির মত সে দুর্বল নয়, ভীরু নয়, যারা শুধু চেয়ারে বসে আমলা দিয়ে কাজ চালাতে চায়। বোকার মত অবিশ্বাস্য সব বক্তৃতা দেয় জনসাধারণের সামনে।

কিন্তু অনেক দুরূহ পথ পার হতে হবে তাকে। সেই পথে, এই মেঘনাদেরাও এক একটি পরীক্ষাকেন্দ্র।

আর মেঘনাদ! রাজীবের চোখে যেন একটা খ্যাপা আর বোকা মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এবার সে মুখ খুলেছে।

বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যবসা তো করবই। সেই জন্যই এসেছি। ভয় পাইনে, তবে নতুন জায়গা, জীবনে কোনদিন আসিনি তো। তা—আপনারা দশজনে রয়েছেন।'

মেঘনাদ হাসল। গোঁফের ফাঁকে তার শক্ত দাঁতের সারি চক্‌চক্ করে উঠল। সে আবার বলল, 'জীবনে কখনো বসে খাইনি, জানেন। এখন খেতে গেলে হাত ওঠে না। মানুষ দু' পয়সা রোজগার করলে খরচ করতে পারে। রোজগার নেই। এ্যাদ্দিন এসেছি মশাই একটা তণ্ডুল চোখে দেখিনি।'

রাজীব অবাক হয়ে বলল, 'তণ্ডুল কি?'

মেঘনাদের বড় বড় চোখ দুটো ঝিকিমিকিয়ে উঠল। নাকটা আরো বোঁচা হয়ে, বোকা হয়ে উঠল হাসিটা। বলল, 'তণ্ডুল মাল সেঁকে। উনুন বলতে পারেন, তাঁতানো খোপ বলতে পারেন। কারখানার ওইটা-ই অর্ধেক। মুসলমানেরা বলে তন্দুর।'

রাজীব বলল, 'ও, বুঝেছি; আপনি বলছেন যাতে তন্দুরি রুটি তৈরী হয়।'

মেঘনাদ হাসল, রাজীবের বুঝতে পারাটা দেখে।

রাজীবের চোখ পড়েছে তখন দুই বোনের দিকে। তিলিকে চেনে সে। লীলাকেই দেখছে বেশী। বিজয়ের মত দেখতে। কিন্তু একটা অদ্ভুত তীব্রতা

চোখে মুখে এবং দেহে। তিলিকে যেন নিষ্প্রভই মনে হয়। হঠাৎ মনে হয় রাজীবের চোখ দুটি বাঁদরের মত। চকিত এবং ঘূর্ণিত। মনটা অনুপস্থিত। তাই মেঘনাদের প্রতি কান দুটো গরহাজির হতে লাগল।

মেঘনাদ বলেই চলল, 'হাতের কাজ, পরোয়া বিশেষ করিনে। তবে ভেবেই ঠিক করতে পারছিনে, কি ভাবে শুরু করব। তাল পাইনে। একলা কাজ তো নয়। ছোট করে করলেও দু' চারজন লোক লাগবে। বাজারটা ঘুরে দেখেছি। মনে হয়, খুব খারাপ হবে না। তবে বিলাতী কোম্পানী একচেটে করে রেখেছে, তাদের মার নেই।...'

রাজীব এক ফাঁকে বলে ফেলল, 'আপনার আগের কারখানা কেমন ছিল ?'

রাজীব অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু ব্যথা ও সঙ্কোচে বিচিত্র হয়ে উঠল মেঘনাদের মুখ। গজ চোখের দৃষ্টি যেমন দুদিকে চলে যায়, তেমনি তার দুটি চোখের একটি মণি রাজীবকে ছাড়িয়ে চলে গেল পিপুল তলায়। সঙ্কোচ তার, নিজের সুদিনের কথা বলতে। ব্যথা, সে সুদিন নেই। সে প্রায় চাপা গলায় বলতে লাগল, 'কি রকম কারখানা ছিল তার...

কিন্তু রাজীবের কানে গেল না সব কথা। মন নেই, ভাল লাগছে না। তবে মেঘনাদকে একেবারে হাতছাড়া করতে চায় না সে। তারপর হঠাৎ মধ্যপথেই বলে উঠল, 'আচ্ছা আপনার ময়দা চাই তো? তার জন্য একটা পারমিট দরকার। সেজন্য কোন ভাবনা নেই। আপনার কাছে আমি বিনয়বাবুকে নিয়ে আসব। মস্ত বড় লোক, শিক্ষিত মানুষ। ওঁর এরকম ব্যবসা করার ইচ্ছে ছিল। এই বেকারী কারখানার ব্যবসা। বিনয়বাবুর সঙ্গে কথা বললে, আপনি সব ঠিক করতে পারবেন, আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবেন। পারমিট বলুন, লোকজন বলুন, সব। আমি তো রইলামই।'

মেঘনাদ একটু অবাক হয়ে চুপ করে গেছে। ভ্রূ দুটি কুঁচকে হা করা মুখটা কঠিন দেখাচ্ছে। যদিও মন তার কঠিন হয়নি। কথা বলতে বলতে হকচকিয়ে গেছে মাত্র।

সুকুমারি উঠে গেছে অনেকক্ষণ। নকুড়কে আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। নাক ঠোঁট লাল, সব যেন ঝুলে পড়েছে। নাকের পাশের গভীর কোঁচ দুটিতে রাজ্যের বিতৃষ্ণা ও বিষাদ। সে অনেকক্ষণ থেকেই কোন কথা শুনেছে না আর।

রাজীব ভেতরের দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই ঠুমি, একটু চা খাওয়াবে নাকি ?'

চমকে উঠল নকুড়। ডেকে উঠল সে, 'কই লো ঠুমি।'

তিলি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এই যে দিচ্ছি।'

তিলি ভিতরে চলে। লীলা তার চুলের ঝুঁটি নেড়ে দিয়ে বলল, 'ও। তলে তলে বেশ জমিয়ে রেখেছিস্। দু চোখ মেলে তো গিলছিল দেখছিলাম।'

তিলি বলল, 'তোকে না, আমাকে ?'

লীলা বলল, 'আমাকে কেন ! অমন মিষ্টি করে 'ঠুমি' ডাকলে তোকে।'

তিলি : 'বেশ, এবার থেকে তোকে ডাকতে বলব !'

হেসে উঠল সে। বারান্দায় রান্না করছিল তার মা। বাটনা বাটছে ষোড়শী।

তিলি হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে ধরল। বলল, 'ওমা ! চা—নেই যে ! কি দেব !'

লীলা বলল, 'কিনে নিয়ে আয়।'

কিনে নিয়ে এসে চা দিতে দেরি হবে। ভাড়াটেদের কাছ থেকে চা চেয়ে নিয়ে এল সে। এদিকে আবার দুধ নেই। সারাদিনে এক পো দুধ। কয়েক চামচ চায়ে যায় আর বিজয়ের ছেলে সাবুর সঙ্গে খায়।

লীলা বলল, 'পয়সা দিচ্ছি, কিনে নিয়ে আয়।'

তিলি বলল, 'কিনতে যাব কোথায়। সে যে বড় রাস্তার ওপরে।'

তার এ অস্থিরতাটুকু লীলার কাছে প্রেমের ব্যাকুলতা মাত্র। ঠোঁট টিপে বলল, 'তবে না হয় নাই দিলি।'

তিলির মনে ভদ্রতা ও আতিথেয়তার দুশ্চিন্তা। একটু চায়ের জন্য দারিদ্র্য স্বীকার করতে বাঁধে তার। ঘরের মানুষ নয়। আপন জন নয়, ঘনিষ্ঠও নয়,

যাকে বলা যায়, দিতে পারলাম না। না দিতে পারলেই রাজীবেরা বিরক্ত হয়ে করুণা করতে চায়। বলল, 'ছি, তা' কি করে হয়।'

ষোড়শীকে জিজ্ঞেস করল, 'বউদি, সোনাদা কোথায় গেল?'

বউ বলল, 'জানিনে তো।'

অগত্যা আবার মহীন্দর মিস্তিরির বউয়ের কাছে। মহীন্দরের ঘরে লোক কম। সুকুমারির ভাষায়, দুধখেগো যম নেই। অর্থাৎ শিশু নেই ঘরে। রাজীবের নাম শুনে একটু দুধ দিল সে। দিয়ে বলল, 'তোমার বোনাইয়ের কারবারের জন্য এসেছে বুঝি?'

তিলি বলল, 'হ্যাঁ।'

'ও!' বলে মহীন্দরের বউ ভাল মানুষের মত অপাঙ্গে দেখল একবার তিলিকে।

ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'যাও, চা দেও গে।'

মুখ ঘুরিয়ে চলে এল তিলি। কী কুৎসিত ঠাণ্ডা গলা। কী ভয়াবহ ভালমানুষ বউ! কী অদ্ভুত চাপা ইঙ্গিত! ভালমন্দ, সকলের একটা-ই সংশয়। হবেই তো! চব্বিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে যে! সংসারের কোথাও পিছল নেই তো। পিছল যে তারই পায়ের তলাটুকু শুধু।

বারান্দায় এসে দেখল, লীলা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ঘরের দিকে। পরিষ্কার বোঝা যায়, নজরটা রাজীবের দিকে। তিলি ঠোঁট টিপে হাসল আপন মনে। রাজীব অবাক মুগ্ধ চোখে অনেকবার তাকিয়েছিল লীলার দিকে। রাজীবের অবাক মুগ্ধতা! জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল তিলির। কিন্তু জোরে হাসা যায় না এখন। সত্যি, দিদিকে এখন কী সুন্দর দেখাচ্ছে। অন্যমনস্কতার ভান করে কেমন তাকিয়ে আছে। কপালের পাশ দিয়ে নেমে গেছে কোঁচকানো চুলের গোছা। একটু অগোছাল উড়ু উড়ু কুন্তলচূর্ণ। আঁচল তার সব সময় খসেই থাকে। জামার বোতাম বন্ধ থাকে না পুরো কখনোই। সোনার হারটি এমন বিচিত্রভাবে এলিয়ে থাকে ওর বুকে! পান খাওয়া রক্ত-ঠোঁটে চোরা হাসি। চোখ দুটি যেন ছুরির ফলার মত চক্‌চক্ করে।

মহীন্দর মিস্তিরির ভাই যেমন গায়, 'ও সে হোক্ না কালো আমার বড় ভালো লেগেছে, পটল চেরা চক্ষু দিয়ে চাক্কু মেরেছে!'...তারপর বলে ওঠে, 'মাইরী!'

তিলির তেমনি বলে উঠতে ইচ্ছে করে, মাইরী! তার কালো রূপে আর ভালো কী আছে। কালোরূপ তার দিদির! চাক্কু কেন, অনেক কিছু মারতে পারে। বুঝি প্রাণেও মারতে পারে।

চায়ের জল বসিয়ে টুক্ করে ঢুকে গেল সে লীলার কোণের ঘরে। ছোট্ট একটি ফোঁকড় দিয়ে উঁকি মেরে দেখল পাশের ঘরে। যা ভেবেছে! রাজীবের লাল মুখ ঘামছে দর্‌দর্ করে। চোখ দুটি বেঁকে গেছে। যাকে বলে খোঁচা খেয়ে বেঁকে যাওয়া। দিদির এক খোঁচায়, ভেঙ্গে দুমরে যাচ্ছে রাজীব আস্তে আস্তে।

আর মেঘনাদ! বোনাই আবার মুখ খুলেছে। কী বিশাল শরীর! পাশে রাজীবকে যেন লিলিপুটিয়ানের মত দেখাচ্ছে। সঙ্কোচের বাঁধ খুলে গেছে মেঘনাদের গলার। টিনের শেড্ ঘরটার মধ্যে গম্‌গম্ করছে গলার স্বর। কী বড় বড় চোখ। এখন খুশি উত্তেজিত দৃষ্টি পূর্ণ উন্মীলিত। মুখের কোথাও অসরলতা নেই। অন্যমনস্কতা নেই একটুও নিজের কথায়। ব'লছে, 'দু মন, চার মণ, যা-ই হোক ময়দার ব্যবস্থা না হলে কিছুই করতে পারছি না। লোকজন পেতে কিছুই কষ্ট হবে না। ইদ্রিসের ছেলেদের নিয়ে আমি কাজ আরম্ভ করতে পারি। এই পারমিট, কী যে অভিশাপ! কি বলব আপনাকে! তবে হ্যাঁ, বিলাতী কারখানার মত মেসিন বসাবার আমার বড় সাধ! উপায় থাকলে, কি বলব আপনাকে—'

বলতে বলতে স্বপ্ন নেমে এল মেঘনাদের চোখে। কিন্তু কে শুন্‌ছে!

সমস্ত দৃশ্যটি উড়িয়ে নিল তিলির ঠোঁটের হাসি। ভার হয়ে উঠল বুকটা। বাইরে থেকে ডাক দিল সুকুমারি, 'ঠুমি, চায়ের জল গরম হয়ে গেছে।'

নিঃশব্দে বাইরে এসে পড়ল তিলি! জল নামিয়ে চা তৈরি করতে লাগল। ভাঙ্গা কাপ। রাজীব একটুখানি খেয়েই দেবে রেখে। তবু চায়। চা খানিকটা

কমিয়ে আর একটা গেলাসে ঢালে সে। নইলে, নকুড় আধ-কানার মত তাকাবে আর সাপের মত জিভ দিয়ে চাটবে ঠোঁট। মুখে বলতে পারবে না কিছুই। অভিশাপ দেবে মনে মনে।

তিলি মনে মনে ভাবে।

ভালোবাসা! ভালোবাসা! হায়রে ভালোবাসা! মেঘনাদ যে কী অপরাধ করেছে এই মানুষগুলির কাছে, তা ওরাই জানে। দিদি শুধু সর্বনাশের নেশায় মাতাল। আগুন নিয়েই ওর খেলা দিবানিশি। আর বিজয় কেন এনেছে রাজীবকে, কে জানে। সে শুধু অন্যমনে যেন কিসের ছল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুকুমারি জ্বলন্ত চোখে দেখে তিলিকে। চোখে তার মহীন্দর মিস্তিরির বউয়ের মতই সন্দেহের বিষ। হঠাৎ চাপা তীব্র গলায় বলে উঠল, 'এখন দিয়ে আয় চা, ভাবিস্ পরে।

উঠে পড়ল তিলি! নতুন তো নয়। মায়ের মুখের দিকেও তাকাবার কোন দরকার নেই।

এ তো জানাই কথা। ভেবেও সে যে কিছু করতে পারে না, সেটাই তো মায়ের দুঃখ।

দরজায় এসে বলল, 'সর্ দিদি।'

লীলা ফিরল। চোখ বাঁকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'হোল চা এতক্ষণে? বেচারী মরছে।'

তিলি শুধু বলল, 'বাঁচা যেত মরলে। তুই মরিস্‌নে কেন।'

লীলা হেসে উঠে বলল, 'আমার তো মরণ নেই। মরবার পালা তো কেবল তোরই।'

বলে আঁচলের চাবির গোছা দিয়ে মারল তিলির পিঠে।

রাজীব বলে উঠল, 'কই ঠুমি, তুমি তো আর নারী সমিতিতে যাও না।'

তিলি হাসল। একবার চোখাচোখি করল লীলার সঙ্গে। চা দিয়ে বলল, 'সময় পাই না একেবারে।'

রাজীব রীতিমত উৎফুল্ল। লীলা তিলি, দুজনের মাঝখানে হৃদয় তার প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে রসে। বলল, 'তা বললে কী হয়। একটু সময় করে তোমার যাওয়া উচিত। মজুর পরিবারের মেয়েরা, লেখাপড়া শিখে, হাতে কলমে কাজ শিখে বড় হয়ে উঠুক, এইটি আমরা চাই। আবার নতুন করে নারী সমিতি বসছে। আমিও গেছি কয়েকদিন। তুমি এসো না ?'

চোখ তার দুদিকেই ঘুরছে। আর দুদিকেই সে একই কথা ছুড়ে মারতে চাইছে।

তিলি না হেসে পারছে না।

নকুড় এবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ গেলেই তো হয়। আমি বলেছি।'

নীরব শুধু মেঘনাদ। নারী সমিতি, মজুর পরিবার, এইসব কথাগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে চাইছে যেন।

রাজীবকে বলল তিলি, 'আচ্ছা দেখি। আমার দিদিকে পাঠাব।'

রাজীব চকিতে একবার লীলার দিকে তাকাল, বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! তোমার দিদি মানে, মেঘনাদ বাবুর স্ত্রী তো। খুব ভালো হবে।'

লীলা আচমকা হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে। বলল, 'আমি ?'

বলে আবার হেসে উঠল। কেঁপে কেঁপে উঠল তার শিথিলবাস অঙ্গ। আর সকলের হাসিটুকু অবাক বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিশেষ রাজীবের।

তিলি বলল মেঘনাদকে, 'তোমার হয়েছে বোনাই ?'

মেঘনাদ বলল, 'হ্যাঁ, হ'ল, কথাটা শেষ করে নিই।

তিলি হঠাৎ বলে উঠল, 'আর কতক্ষণ কথা বলবে।'

মেঘনাদ তিলির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। পাকা গিন্নির মত রীতিমত গম্ভীর মুখ তিলির। মেঘনাদের ভালো লাগল। বলল, 'বলতে হয় গো।'

কিন্তু কথা বলা তার আর হল না। রাজীল উঠল। হঠাৎ আরো ঘনিষ্ট হয়ে বলল, 'আমি কাল আসব জামাইবাবু। পারি তো বিনয়বাবুকে নিয়েই আসব।'

তিলি চোখ কপালে তুলে বলল, 'এখেনে নিয়ে আসবেন ?'

রাজীব বলল, 'নয় কেন ? তোমরা যা ভাবছো, তা নয়। বিনয়বাবু বড় লোক বটে, কিন্তু নিরহঙ্কারী। জান তো, বস্তিতে বসেও উনি আড্ডা দেন। তখন বোঝা যায় না যে, লোকটা এম. এ. পাশ করেছেন।' জামাইবাবুর সঙ্গে আগে ভিড়িয়ে দিই, তারপরে দেখো, কি রকম কাজ হয়। ব্যবসা বোঝেন কি না। বিজয় কোথায় গেল।

তিলি বলল, 'কি জানি,। বোধহয় বেরিয়ে গেছে।'

'বিকেলে দেখা করতে ব'লো। চলি জামাইবাবু।' ব'লে রাজীব তাকাল লীলার দিকে। লীলার পান খাওয়া ঠোঁট বেঁকে ছিল। ভ্রূ দুটি কেঁপে উঠল কয়েকবার।

রাজীবের মুখ আবার লাল। তিলির মুখের দিকে একবার দেখে বেরিয়ে গেল সে।

মেঘনাদ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল বোকার মত। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বলল তিলিকে, 'তা' হলে কাজ আরম্ভ করা যাবে শিগ্‌গিরিই মনে হচ্ছে।'

তিলি আড়ষ্ট হেসে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। লীলা চোখ কুঁচকে একবার মেঘনাদকে দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

বুড়ো বুড়ি বসে আছে মুখোমুখি। দুপুরে ঘুমোচ্ছে সবাই। মখোমুখি বসে আছে নকুড় আর স্বকুমারি।

স্বকুমারি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ভেংচে উঠল, 'তুমি কিছুই পারবে না।'

নকুড় খেঁকিয়ে উঠল, 'কি ক'রে পারব। তোমার ছেলেই তো সোহাগ ক'রে রাজীবদাকে ডেকে নিয়ে এল। সেখানে আমি কি কথা বলব ? কিছু বললে ভাববে যে, বুড়ো আবার মুখ খুলছে কেন ?'

স্বকুমারি ঘরের ঘুমন্ত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে, প্রায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলতে লাগল, 'মেঘুর আসল কারবারে নাক না গলাতে পার, অন্য কিছু কর। মেজাজ বুঝে এক সময় বল না, একটা মুদী দোকান যদি করে দেয়।'

: হ্যাঁ, টাকার থলি খুলে রেখেছে। বললেই ঝেড়ে দেবে।

কিন্তু সুকুমারির চোখ সরে না ঝুমি ঠুমি ষোড়শীর উপর থেকে। যেন ওদের তাকিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করছে, 'রাজীবকেই বা এত বিশ্বাসের কি আছে। কার মনে কি আছে, কিছু বলা যায়?'

নকুড়ের ঘষা ঘষা চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল। বলল, 'সে জানে বিজা শুয়োরের বাচ্চা।'

: বিজা শুয়োরের বাচ্চা কেন?'

: সে বানচোৎ-ই তো আমাকে কিছু বলতে দিচ্ছে না।

দুজনেই চুপচাপ। বাইরে বাতাস বইছে। কাঁচা নর্দমার ধারে জঙ্গলগুলি মাথা দোলাচ্ছে। পিপুলের ডালে ডালে সাঁই সাঁই শব্দ। তার ছায়াতলে এক রাশ চড়াই দুর্বোধ্য আলাপে ব্যস্ত। যেন একদল কৌশল আঁটছে, আর একদল নাকচ করে দিচ্ছে। নইলে এত ব্যস্ত ডাকাডাকির সভা কিসের।

আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। শরতের ঘননীল আকাশে, মেঘ দৌড়ের চলেছে প্রতিযোগিতা। কোথায়, কোন্ দূরে, কোন্ দেশে তার মুখ, কেউ জানে না।

উঃ শব্দে একটি নিশ্বাস ফেলল নকুড়। বলল, 'আমার কিছু হবে না।' আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি যদি একবার মেয়েটাকে—'

সুকুমারির চোখে ভয় দেখা দিল। বলল, 'যা মেয়ে!'

ঘণ্টাখানেক পরেই সবাই উঠল। সুকুমারি তাড়াতাড়ি চিরুণি হাতে এগিয়ে এল লীলার কাছে। বলল, 'বোস্ ঝুমি, আমি চুল বেঁধে দিই তোর।'

লীলা ভ্রূ কুঁচকে একবার মা'কে দেখল। ধ্বক্ করে উঠল সুকুমারির বুকে। কিন্তু লীলা বসে পড়ল প্রতিবাদ না করে।

নকুড় বেরিয়ে পড়ল ঠুক ঠুক করে। তিলি গেল উঠোনে। ষোড়শী ছেলে নিয়ে বসে রইল অদূরে। আজ ছুটির দিন। কিন্তু বিজয় বাড়ি নেই। খেয়েছে, খেয়েই আবার বেরিয়ে গেছে। কোথায় নাকি মিটিং আছে।

স্কুমারি পাশ দিয়ে লীলার মুখ দেখতে চেষ্টা করল। চোখ বুজে আছে লীলা। কী চুল! হিমসিম্ খাচ্ছে স্কুমারি। এতবড় চুলে আজ এক যুগ হাত দেয়নি সে। বিরক্ত লাগে, রাগ হয়। মনে হয়, ধরে ক্যাচ্ করে কেটে দেয়।

কিন্তু বলল, 'এমন চুল, বড় অযত্ন করিস তুই ঝুমি।'

সত্যি! মনে মনে বলে উঠল যোড়শী। কী স্থন্দর চুল! তার নিজেরও যে বড় বড় চুল অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সে কথাটি একবারও মনে থাকে না। ননদের চুল দেখে তার আফসোস্ হয়।

লীলা বলল, 'কে অত করে, বল?'

স্কুমারির মুখে এল, কেন, এত সাবান কাপড় গহনার বাড়াবাড়ি। চুলগুলি রোজ বাঁধা যায় না। কিন্তু বলল, 'বেশ তো, আমি ঠুমি বউ রয়েছে, বসলেই তো পারিস্। একটা ভাল তেল আনিয়ে নিস্।'

লীলা নির্বাক। স্কুমারি আবার বলল, 'কত বেঁধে দিয়েছি তোর চুল। যা মেয়ে ছিলি! থির হয়ে দু' দণ্ড বসতিস্ না। ধরে ধরে এনে বিনুনি বাঁধতুম, সেজন্যেই আজ এত চুল।'

তারপরেই হঠাৎ গলাটা ধরে আসতে থাকে তার। ঠোঁট কাঁপে। কান্নায় ঠিক নয়, ভয়ে ও উৎকণ্ঠায়। থেমে থেমে বলতে থাকে, 'তবু মা তোকে ভাল ঘরে দিতে পেরেছিলাম।' পাশ দিয়ে তাকাল স্কুমারি। চোখ খুলেছে লীলা! ঠোঁট দুটি যেন বেঁকে উঠছে। আর পান খেলে মেয়েটার ঠোঁট যে কী লাল হয়। ভয় ধরে যায়!

হঠাৎ স্কুমারি ফুঁপিয়ে ওঠে। ফুঁপিয়ে উঠে, লীলার পিঠের জামাটা খুলে ফেলে। পিঠের সেই ক্ষত। একদিন নকুড় কাটারি মেরেছিল। সেই ক্ষতে হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠল, 'আহা, এমন সোনার অঙ্গে—'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরল লীলা। আবাঁধা চুল ছড়িয়ে পড়ল বুকে। ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠল চোখ। চকিতে ঠাস্ করে স্কুমারির গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে হিসিয়ে উঠল, 'সোহাগ দেখাচ্ছ আজকে?'

বলেই ফণা তোলার মত উঠে হুর্‌হুর করে বাইরে চলে গেল।

সুকুমারি গালে হাত দিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে উঠল, 'মারলি, মারলি আমাকে ?'

দুই বিন্দু রক্ত দেখা দিল তার চোপসানো ঠোঁটের কষে। কাঁপতে লাগল থর্‌থর্ ক'রে। যোড়শীর গলা দিয়ে শুধু একটি চাপা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরুল। ভয়ে আতঙ্কে শক্ত হয়ে বসে রইল। কি করা উচিৎ ভেবে পাচ্ছে না। কেবল, তার কোলের ছেলেটা কি ভাবল কে জানে। সুকুমারির দিকে তাকিয়ে, হেড়ে গলায় হেসে উঠল খল্‌খল্ ক'রে।

বেলা গেছে। পিপুলের তলা দিয়ে, রাস্তার ওপাশের খোলার চালার উপর দিয়ে এক চিমটি আকাশ দেখা যায়। রক্তাকাশের গায়ে একটা পুচ্ছ বাঁকানো হাঙরের মত কালো মেঘ। পিপুলের বাসায় ফিরে আসা বাসিন্দ বিহঙ্গদের জটলা।

ভয়ে উঠতে পারছিল না যোড়শী। কিন্তু জল কলে ভাজা লাগাতে যেতে হবে। সে ভয়ে ভয়ে উঠল। পুরুষের মত মোটা গলায় বলল সুকুমারি, 'একথা কাউকে বললে গলায় পা দেব বউ।'

লীলা সেজেছে এমন বিচিত্র সাজ! পান খেয়ে, চুল বেঁধে, গহনা পরে, পায়ে স্যাণ্ডেল দিয়ে কেমন একটা কুৎসিত সাজ তার সর্বাঙ্গে প্রকট হয়ে উঠেছে। সহুরে সাজ সাজতে জানে না সে। সাধারণ সাজে সে কালো রূপসী হয়ে ওঠে।

মেঘনাদের বেরুবার মুখে বলল সে, 'আমাকে নিয়ে টকিতে চল।'

অবাক হল মেঘু। যেতে বাধা দেয় না। নিজে যায় না। তিলিকে নিয়ে, নয় তো লীলা একলাই যায়। দেখল, লীলার চোখে মুখে উত্তেজনা। সাজা গোজা দিয়ে সেটুকু ঢাকা যায় নি। নাকের নাকছাবিটি পর্যন্ত কাঁপছে। হয়তো কোনো দুঃখে, কোনো রাগে, কিন্তু সেটুকু জিজ্ঞেস করতেও বাঁধে মেঘনাদের। তবু, বুকে বড় বাজে। রাজীবের সঙ্গে কথা বলে, মন তার উল্লসিত হয়ে ওঠেনি। বিজয় নেই। মন খুলতে চলেছিল সে ইদ্রিসের কাছে।

কিন্তু সে এক কথাতেই রাজী হল। বলল, 'বেশ, চল। তবে, তিলি আর শালাজকেও নিয়ে চল।'

শালাজ যোড়শী। লীলা তীব্র চাপা গলায়, ভ্রূ বাঁকিয়ে বলল, 'কেন, আমাকে একলা নিয়ে যাওয়া যায় না?'

এক কথাতেই বিরূপ হয়ে উঠছিল মেঘনাদের মন। তবু বলল, 'টকি দেখার ব্যাপার, তাই বলছি। ভাল, একলা যেতে চাও, চল।'

বাড়িটা থম্‌থম্ করতে লাগল। যোড়শী বাঁচল জলের কলের ভাজায় গিয়ে। কেবল তিলি অবাক হয়ে রইল সমস্ত ব্যাপারটি দেখে।

রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল তিলির। ফোঁস ফোঁস ক'রে কে কাঁদছে। পাশে হাতিয়ে দেখল, মা' নেই। শিয়রের দিকে দেখল, একটি ছায়ার বুকে আর একটি। নকুড়ের বৃদ্ধ বুকে পড়ে সুকুমারি কাঁদছে। শুধু বলছে, 'তোমারি জন্যে, শুধু তোমারি জন্যে!'...

নকুড়ের চোখে জল ছিল কি না কে জানে। সে ভাঙ্গা গলা টিকটিকির মত বলছে, 'সত্যি, সত্যি, সত্যি!'...

তারপর নকুড় বলল, 'আমার মরণ-ই ভাল।'

সুকুমারি বলল, 'ছি! ওকথা বল না। আমি কি নিয়ে থাকব গো!'

বুঝি যৌবনে সুকুমারি যে কান্না কাঁদেনি, নকুড় করেনি সোহাগ, আজ এই বয়সে সেই রাত এসেছে তাদের।

তিলি বুকে হাত দিয়ে পড়ে রইল। কিছুই জানে না। কিন্তু বুকটার মধ্যে কেমন করছে।

আর একজন জেগে ছিল। যোড়শী। সে কিছুই বলতে পারেনি বিজয়কে। শাশুড়ির গলায় পায়ের ভয়ে নয়। বিজয়ের মনে কি হবে সেই ভয়ে। সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে ছিল। তারও বুকে কান্না থমকে রয়েছে কেন যেন।

জেগেছিল আর একজন। মেঘনাদ। পাশে শুয়ে তার লীলা। অন্ধকারেও

চোখে ভাসে তার ঘুমন্ত লীলাকে। বিস্রস্ত, অর্দ্ধ উন্মুক্ত শিথিল তনু। ঘুমন্ত চোখের পাতা পুরো বোজে না। কেমন অসহায় আর শান্ত। জাগলে কী তুর্নিবার! তার যা দরকার সবটুকু দিয়েও সে যাকে পায়নি। কেন তা সে জানে না। স্ত্রী অতৃপ্ত, স্বামীর এই লজ্জা নিয়ে নিয়ে সে ঘুরছে সর্বত্র।

আজ কেন লীলা তাকে ডেকে নিয়ে গেছে, সে জানে না। কেন বা এসে পাশ ফিরে শুয়েই একেবারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাও জানে না। আজ এ বাড়িতে শুধু তারই ঘুমোবার পালা। এই এক ক্ষত তার বুকে।

আজ তার সামনে অনেক আশা ও সংশয়। নয়াপাড়ির আশা। কোথায় মেঘ দেখা দেবে, কে জানে। ঝড় উঠলে এ ঢেউ সামলানো দায়। ডুবলে ভরা ডুবি। বিপিনের চিঠির কোন জবাব আসেনি। সামনে সপ্তসিন্ধু। সেই সপ্তসিন্ধুতে ডাইস্ মেশিন, বিরাট হিটারের পাতে থরে থরে সাজানো নানান আকারের পিষ্ট ময়দা। আকাশে উড়ছে বিশাল চিমনীর ধোঁয়া। বিরাট ফ্যাক্টরী। ওইটুকু সওদাগরের স্বপ্ন।

বিনয় এল পরদিন। নিয়ে এল রাজীব। এ অঞ্চলে বিনয় চৌধুরী নামে তাকে সবাই চেনে। বয়স খুব বেশী নয়। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। দোহারা গঠন, গোঁফ কামানো মুখ। দেখলে মনে হয় অতি সাদাসিধে মানুষ। অল্প দামের পাঞ্জাবী আর সাধারণ ধুতি কোচা দিয়ে পরা। পায়ে মোটা শোলের স্যাণ্ডেল। আঙ্গুলে নীলা আর পলার তুটি আংটি।

কথা বলে ক্লান্ত গলায়। শুধু চোখ তুটি অপলক। কোন কোন সময় হঠাৎ বিমর্ষ মনে হয়। করুণ হয়ে উঠে চোখ তুটি। মনে হয় যেন জীবনে অনেক তুঃখ আছে। মাঝে মাঝে তা চেপে তো আসরেই। যতটা পারো, তারই মধ্যে হেসে নাও। স্বভাবতই তাকে খানিকটা প্রাণখোলা নিরহঙ্কারী বলে মনে হয়।

তার সম্পর্কে এখানকার লোক, জানা অজানার মাঝামাঝি। মফস্বলের এই শহরের এমন এক বাড়ির ছেলে সে, যে বাড়ির পুরুষদের কেউ কখনো

চাকরি কিংবা ব্যবসা করতে দেখেনি। এই শহরেই কিছু জমিজমা আর পূবের গাঁয়ে অল্প বিস্তর ধান জমি নেড়েচেড়েই চালিয়ে দিয়েছে নাকি। আর বিবাদ করেছে পরস্পরের মধ্যে। বড় রাস্তার উপরে নিজের মস্ত বড় বাড়ি। যৌবনের প্রারম্ভে সে এ অঞ্চলের রত্নতুল্য ছিল। রাস্তা দিয়ে গেলে আঙ্গুল দিয়ে দেখাত তাকে লোকে। বাংলায় আর ইতিহাসে সে দুবার এম. এ. পাশ করেছে। ভাল ভাবেই পাশ করেছে। পাশ করে সে বাইরে চলে গিয়েছিল প্রফেসারি নিয়ে। ফিরে এসেছিল হঠাৎ যুদ্ধের সময়। বাইরে থেকেই বিয়ে করে ফিরেছিল।

প্রথমে কি কাজ সে করত, কেউ জানত না। হঠাৎ তার নিজের নতুন বাড়ি উঠতে আরম্ভ করেছিল। এমন কি, বাইরে থেকে ফিরে এসেও সে তার ভাইদের বাড়িতে ওঠেনি। ভাড়া বাড়িতে উঠেছিল প্রথম। তারপর হঠাৎ তার বাড়ি উঠতে দেখে, সবাই অবাক হয়েছিল।

বনের মধ্যে নতুন জানোয়ার এলে যেমন অন্যান্য জানোয়ারদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়, এখানেও হল তাই। এ কোন্ বনের কোন্ জীবটি এসেছে, আসার উদ্দেশ্য কি, একদলের এই অনুসন্ধান চলল কলকাতা ও মফস্বলের কেন্দ্রীয় বনবিভাগে। সাধারণ মানুষের শুধু বিস্ময় আর সংশয় সম্বল।

রটনা হয়ে গেল, একটা বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক সে। এখন যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি সরকারি কাজে লাগছে। প্রচুর টাকার কারবার।

বিনয় নিজে বাইরের লোকের সঙ্গে মিশত। কেবল তার কাজের কথা ছাড়া। যুদ্ধের পরে সে কয়েকটা চটকলের সঙ্গে চুক্তি ক'রে, বেপরোয়া চটের ফেঁসো কিনতে আরম্ভ করেছিল! দেখা গেছে স্থানীয় বহু লোকের খালি জমিতে ওই ফেঁসোর পাহাড়। এমন কি রাস্তার ধারেও। ফলে অনেক লোক আর মিউনিসিপালিটির সঙ্গে তার মামলা হয়েছিল। অনেকগুলি জায়গা সে আটক করেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অধিকাংশ জমি তার দখলেই এসেছে। কেবল মিউনিসিপালিটির জমিগুলি ছাড়া। অবশ্য জমিগুলির কিছু মূল্য সে দিয়েছিল। তা ছাড়া অনেকগুলি, পুরনো মর্টগেজ দেওয়া জমি সে কিনেছিল সস্তা দামে।

এই ফেঁসো ঝাড়াই করে যে কুঁচো চট পাওয়া যায়, সেটাই চালান যায় তার বিদেশে। এই কুঁচো চটের দাম অনেক। এদেশে যাকে বলে বিলাতী পশমের কম্বল, তারই মিকচার হিসাবে এগুলি চলে। এ ছাড়া, এ অঞ্চলে তার আর কোন স্থায়ী ব্যবসা আছে বলে কেউ জানে না। কিন্তু লোকের ধারণা, বাইরে তার আরও ব্যবসা আছে।

পুরনো যন্ত্রপাতি কেনাটা তার অন্যতম কারবার। ফেঁসো ঝাড়াইয়ের কারখানায় একটা চালাঘরে শুধু পুরনো যন্ত্রপাতি ঠাসা। সেজন্য, ছোটখাটো কারখানার লোকের যাতায়াত আছে তার কাছে।

একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটর গাড়ি আছে তার। গাড়িটা তার ঝরঝরে হয়ে গেছে বটে, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। সে নাকি এর চেয়ে ভাল এবং দামি গাড়ি কিনতে পারে। কেনে না, কারণ সে নাকি ভয়ংকর কৃপণ, এরকম দুর্নাম আছে তার। গাড়িটা স্টার্ট দিলে, বাচ্চা কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার মত একটা শব্দ হয়! সাধারণ লোকে বলে, চৌধুরীর গাড়ি আসছে। যারা তার উপর বিরূপ, বিশেষ যুবকেরা, তারা বলে, বিন্‌চৌ'এর গ্রে-হাউণ্ড আসছে। বিন্‌চৌ, বিনয় চৌধুরী। তার এই সংক্ষিপ্ত বিচিত্র নামটা বিনয় নিজেও জানে। শুধু যে ঠাট্টা তা-ই নয়। অনেকে, বিশেষ অবাঙ্গালিরা জানে, বিন্‌চৌ-টাই আসল নাম! বলে বিন্‌চৌবাবু। কিন্তু জেনেও ঝগড়া করার কোন বাসনা নেই। যে সব ছেলেরা তার এনাম বলে, তারা অনেকেই আশেপাশের কলকারখানায় কাজ করে। ইচ্ছে করলে বিনয় তাদের ক্ষতি করতে পারে। কলকারখানার কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে তার রীতিমত ওঠাবসা আছে, কিন্তু ক্ষতি করেনি। ধৈর্যটা বিনয়ের মস্তবড় গুণ। তাকে কেউ কোনদিন ক্ষিপ্ত হতে দেখেনি। দেখেনি ব্যস্ত হয়ে চলতে। চেঁচিয়ে কথা বলতে কিংবা গলা চড়িয়ে কাউকে ডাকতে শোনেনি কেউ। তার শিক্ষার জন্য তাকে ধারালো মনে হয় না। ভারী মনে হয়। ভারী আর অমায়িক! আর আশ্চর্য শান্ত ব্যথিত চোখ দুটি বিনয়ের। করুণ আর অসহায়। এটা তার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব কিনা, বোঝা মুশকিল। আপাতদৃষ্টিতে তার জীবনেও কাজে কর্মের সঙ্গে ওই চোখের কোন মিল নেই।

সে ঠিক খোলাখুলি রাজনীতি করে না। কিন্তু এখানকার রাজনীতিতে নাকি তার হাত আছে পুরোপুরি। এখানকার অনেকগুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সে উপদেষ্টা। কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতার রীতিমত যাতায়াত আছে তার বাড়িতে। সেই সব নেতাদের উপর এখানকার গরীব জনসাধারণ খড়্গাহস্ত। হয়তো সেইজন্যই বিনয়ের উপরে অনেকে বিরূপ। বিরূপতার চেয়ে বলা ভাল, একটা অপরিচয়ের সংশয়। সে নিজে এখানকার লোকের সঙ্গে মেশে, মিশতে দেয় না।

তার বাড়ির সংবাদ কেউ জানে না। বিনয়ের স্ত্রীকে দেখা যায় কম। বাইরের লোকে জানে, স্ত্রী তার অসুস্থ। বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোয় না। যারা দেখেছে তারাও খুব কম দেখেছে। কোন সন্ধ্যায় হয়তো, কুকুর বাচ্চার ঘেউ ঘেউ করা গাড়িটাতে করে বেরুতে দেখেছে তাকে কেউ। বলেছে, কে, 'বিন্‌চৌ-এর বিবি না ?' আচ্ছা, দেখতে ঠিক কেমন ? ফর্সা, বেশ ফর্সা। মাথায় খুব চুল। আর বেশ বড়সড় মানুষ। কিন্তু যেন পুতুলের মত। চোখের পাতা পড়ে না, ভ্রূ কাঁপায় না, নির্বিকার বিষণ্ণ। অনেক সেজেগুজেও বিধবার মত দুঃখী যেন।

দুটি ছেলে আছে বিনয়ের। তারা এখানে থাকে না। শান্তিনিকেতনে আছে। ছুটিতে তারা আসে। তখন বিনয়ের স্ত্রীকে একটু বেশী দেখা যায়। মা বলে মনে হয় তখন তাকে। মনে হয় না, বিনয় চৌধুরীর সেই অপরিচিতা অন্তরালবর্তিনী বিষাদমূর্তি বউটি। শুধু মা; স্নেহময়ী পাগলিনী। তখন সে বৈধব্য বেশে বিষণ্ণ সধবা নয়। হাসি খুশী মা।

বিনয়ের সঙ্গে যারা মেশে; দুদিন বাদে দেখা যায়, তারাও কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিজয়দের মিলের হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে কিছুদিন বিনয়ের মেলামেশা হয়েছিল। কম্পাউণ্ডারের চারটি মেয়ে, আর স্ত্রী, প্রায়ই যাওয়া আসা করত। হঠাৎ যাওয়া আসা, আবার হঠাৎ বন্ধ। একেবারে বন্ধ। কেন কেউ জানে না কেম্পাউণ্ডারও কোনদিন কিছু বলে না।

এখানকার ডাক্তার সীতানাথ প্রায়ই আসেন। তার স্ত্রী শ্রীমতী সুধা হঠাৎ কিছুদিন খুব যাওয়া আসা করেছিলেন। এমন কি, বিনয়ের সঙ্গে একলাও

তাকে বেরুতে দেখা গেছে। কিছুদিন পরে আর দেখা যায়নি। মনে হয় না, এ বাড়িতে সুধা কোনদিন এসেছিলেন।

আগুরিপাড়ার বুড়ি অবলা মেয়ে মুক্তকে নিয়ে হঠাৎ কিছুদিন যাওয়া আসা করেছিল। তারপরে হঠাৎ বন্ধ। একমাত্র এরাই বিনয়ের নামে কিছু খারাপ কথা রটিয়েছিল। কিন্তু সত্য মিথ্যা প্রমাণ সাপেক্ষ। প্রমাণ একটি মাত্র আছে। বুড়ির মেয়ে মুক্ত যে ভিটে জমিটুকু বাঁধা রেখেছিল, সেটুকু ছ'মাসের মধ্যেই বিনয়ের দখলে এসে পড়েছে।

গঙ্গার ওপার থেকে জনাকয়েক অধ্যাপক প্রায়ই তার বাড়িতে আসেন। অধ্যাপকেরা বিনয়ের সহপাঠি। তা' ছাড়া ছোট কারখানার ব্যবসায়ীদের আনা-গোনা আছে।

এখানে সব চেয়ে বেশী আলোড়ন তুলেছিল সে, জমি কেনা ও দখলের ব্যাপারে। মনে হয়েছিল সে এখানে এসেছে শুধু নানান উপায়ে কতগুলি জমি দখল করতে।

সব মিলিয়ে এমন একটি অস্পষ্টতা, যে বিস্মিত সংশয় সকলের। সংশয়ের শেষ নেই ব'লে, অবিশ্বাস বিদ্বেষ পৌঁছেছে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে শ্রমিক সকলেরই এক ভাব। সকলেরই যেন একটুকু সন্ত্রস্ত ভাব।

গতকাল শুনেই বিজয় বলেছিল রাজীবকে, 'বিন্‌চৌকে জোটাচ্ছেন রাজীবদা ?'

রাজীব জানত, বিজয় একথা বলবে। এ বিষয়ে রাজীবের রাগ ছিল। কোনদিন প্রকাশ করেনি। সে জবাব দিয়েছিল হেসে, 'এ তো আর তোমার মজুর ইউনিয়ন নয়, ব্যবসা। যাকে দিয়ে যেদিকে উপকার হবে, সেটাতে আপত্তি করব কেন ?'

বিজয় আপত্তি করেনি। অবিশ্বাস আছে তার। কিন্তু সে নীরব হয়েছিল। রাজীব যদি ভালো বোঝে, জোটাক। বোনায়ের যদি উন্নতি হয়, ক্ষতি কি ? তবে বিন্‌চৌএর বুদ্ধি সেটুকু দুর্বুদ্ধি, না হলেই

বাঁচোয়া। বিনয় চৌধুরী আজ পর্যন্ত কারুর উপকার করেছে, একথা শোনা যায় না।

বিনয় এল। আসবার পথে, প্রথম গুজব উঠল অমৃতর দোকানে। অমর্তের মুদিখানায়। দু' চারজন আড্ডাবাজ ছিল, খদ্দের নয়। অমর্ত নিজে বসেছিল পরনের কাপড়টি আলগা করে। আঙ্গুল বুলিয়ে আরাম করছিল। রাজীবের সঙ্গে বিনয়কে দেখেই, আবডালে লুকোনো দুর্বল নেড়ি কুত্তার মত সচকিত হয়ে উঠল সে! বলল, 'চৌধুরী না?'

বিষ্টু ছিল, বেকার মিস্তিরি। বলল 'হ্যাঁ, বিন্‌চৌ।'

: বিজা'র বাড়ি যাচ্ছে?

: হ্যাঁ, বিজয়ের বোনাইয়ের কাছে।

: কার কাছে, সে আর আমি জানি নে? বিজয়ের বাড়িতে এখন সব ঐশিয্যিই আছে।

ঝাঁজালো তিক্ত গলায় বলল অমর্ত। কপাল কুঁচকে, ঢেউ খেলে গেল রসকলি। তার মনের ঘা দগদগিয়ে উঠল যেন কোমরে।

বিষ্টু বাঁকা চোখে উদাস গলায় বলল, 'তোমার রসের কেড়েটি শালা ফাটবে মাঝখান থেকে।' সমস্ত কোমরটা এবার একেবারে খুলে গেল। রাধা কেষ্টর নাম নেই, সকাল বেলা মারাত্মক কটূক্তি করে বলে উঠল, 'আমার রসের কেড়ে কোন শালী নয়। খতেনের হিসেব আমার ওসব রস বোঝে না। সত্তর টাকার উপর পাওয়ানা হয়েছে। বিজা মিস্তিরির বোনকে পাই পয়সাটি শুধতে হবে।'

বিষ্টু বলল, 'বোন কেন? মিস্তিরির বোনকে দেখে কি দিয়েছ?'

: তবে কি, এতগুলান টাকার মাল বিজা মিস্তিরির মুখ চেয়ে দিয়েছি? অত কাঁচা ছেলে অমর্ত কুণ্ডু নয়।

বিষ্টু বলল, 'তা তো বটেই। কিন্তু মেয়েমানুষ অতগুলো টাকা দেবে কোত্থেকে!'

অমৃত ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল রাস্তার বিজয়ের বাড়ির দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মেয়েমানুষ হয়ে নিতে পারল. আর. দিতে পারবে না ? কিছু দিতে হবে বৈ কি ! মেয়েমানুষের মতই দিতে হবে।'

বিষ্টু বলল, 'তাও তো বটে।'

বলে মুখ টিপে হাসল। অমৃত বার বার দেখতে লাগল রাস্তার দিকে, আর বিড়বিড় করতে লাগল। দেশে আছে বউ, গুটি ছয়েক ছেলেমেয়ে। তাদের সে কোনদিন এখানে আনেনি। তিলিকে দেখে অবধি মনে আশা জেগেছে। আর একটি সংসার যদি এখানে পাতা যায়। যদি নয়, পাতা যাবে না কেন ! নকুড়সার অনুমতি পেতে কতক্ষণ ! একবার বললে হয়, বুড়ো মা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ভাবে ভঙ্গিতে মনের কথাটি তিলির কাছে সে ব্যক্ত করেছে অনেকবার। করলে কি হবে। বয়স হয়েছে, ছুঁড়ি তো এখন পাড়ার মাথা কিনে বসেছে। ধমকে যায় অমৃতকে। একবার সাত পাক হয়ে যাক, হাতে হাত পড়ুক। পাড়া-জমানো ছেনালী দুদিনে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সম্প্রতি দেশ ভাগাভাগি ব্যাপারে সে একটু অস্থির হয়ে উঠেছে। যশোর থেকে বউ ছেলেমেয়ে যদি চলে আসে, তা'হলেই গণ্ডগোল। শোনা এক কথা, চোখের সামনে অতগুলি ছেলেমেয়ে দেখলে কি আর নকুড়সাই তখন ভিড়বে। সেইজন্য সে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মনে মনে।

তার উপর বিনয় চৌধুরী। একে তো রাজীবকে যেতে দেখলেই কোমরের চেয়ে বুকের ঘা দগদগিয়ে ওঠে বেশী। সরষের তেল মাপতে মাপতে সে মানস-চক্ষে দেখতে পায় রাজীবের বক্ষলগ্ন হয়ে তিলি হেসে লুটোপুটি হচ্ছে। তখন মনের জ্বালায় খদ্দেরের মালের ওজনটা শুধু কম পড়ে যায়। আবার বিনয় চৌধুরী। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। ছুঁড়ির কি এখন আর অমর্ত মুদীর কথা মনে থাকবে ! না, মনে থাকবে দোকানের দেনার কথা ! তার থেকে রাজীব আর বিনয়ের ভার অনেক বেশী। কিন্তু যত ভারই হোক্ পাল্লার ভার কমাতে অমৃতর হাতও অপটু নয়।

সারা বাড়িটিময় সাড়া পড়ে গেল যেন। বিন্‌চৌ এসেছে! এই বস্তিতে তিন ঘরের বাস বটে। তবু বস্তি-ই। এ বাড়ির মেয়েরা বিনয়কে বিন্‌চৌ বলে। পুরুষদের কাছ থেকে যে রকম শোনে, সেরকমই বলে। ছোট ছেলেটি বলে, 'জানিস্। বিনচৌয়ের বাড়ির সামনে দুটো কুকুর লড়ছিল খুব।' বক্তব্য কুকুরের লড়াই। স্থানের উল্লেখ এই ভাবেই করে। 'বিন্‌চৌয়ের ফেঁসোর কারখানা রাস্তায়', 'বিন্‌চৌয়ের বালিপুকুরে', বিনয়ের নামটি এমনি ভাবেই বলে তারা।

কালকের থম্‌থমে ভাবটি আজো কাটেনি। নকুড় নীরব। কাল সারা রাত তার বুকে পড়ে সুকুমারি কেঁদেছে। তার এই ভাঙ্গা নড়বড়ে বুকে। যে আশাটুকু মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল বুকে, একটি আঘাতে সে মাথা ডুবে গেছে, ভেঙ্গে পরছে সমস্ত আশা।

সুকুমারির রেখাঙ্কিত চোখের কোণ দুটি ফুলে উঠেছে। এ সংসার তার সংসার। তবু সে শোকে ও অপমানে বেড়াচ্ছে মুখ ঢেকে। আজ সে রান্নার খোঁজ করেনি। উনুনের কাছে যায়নি। এমন কি, ষোড়শীকে পর্যন্ত দেয়নি মুখ ঝামটা। ষোড়শীকে সে শাসিয়ে রেখেছে বটে। কিন্তু শাশুড়ির দাবড়ানি দেওয়ার তীব্র মুখটি তার লীলা ভেঙ্গে দিয়েছে ষোড়শীর সামনেই। সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! জলকলে ভাজা লাগাতে যাচ্ছে। পিপুলতলায় গিয়ে বসছে নয় তো অন্য বাড়িতে, আর কারুর ঘরে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। পাশাপাশি ঘর। কান পাতলে কথা শোনা যায়। ভাড়াটে মেয়ে বউয়েরাও লক্ষ্য করেছে সুকুমারির ভাবান্তর। তারা বিস্মিত কৌতূহলিত। জিজ্ঞেস করেছে তিলিকে, তোমার মায়ের কি হয়েছে। ষোড়শীকে বলেছে, শাউড়ির কি হল গো?

কেউ কিছু বলতে পারে না। একজন জানে না। আর একজনের কণ্ঠরুদ্ধ ভয়ে। ছটফট করছে তিলি। কি হয়েছে? লীলা ঘড় ছেড়ে বেরুচ্ছে না। বেরুলেও, কথা নেই মুখে। হাসি তো দূরের কথা। তিলির দিকেও তাকাচ্ছে না চোখ তুলে। খালি কাল রাতের কথা মনে পড়ে যায়। মায়ের সেই কান্না, বাবার গোঙানি। জিজ্ঞেস করে, 'তুই জানিস্ বউদি? জানিস্‌নে? কি যে হল!' সে নিজেই রান্নার দিকে এসে পড়েছে।

ষোড়শীর ভয়চকিত চোখ। এদিক ওদিক দেখে, ঘর ঝাঁট দেয়। এদিক ওদিক দেখে, বাটনা বাটে। গলার কাছে পাক দিয়ে উঠেছে কিসের আবর্ত। ঠেলে ফুলে উঠে আনতে চাইছে। তিলির সামনে যেতে চায় না। যদি বলে ফেলে। বেরিয়ে যায় যদি। সারাটি রাত কেটেছে এমনি করে। যদি বলে ফেলে বিজয়কে। দিনের বেলাও তাই। তার শুধু ভয়। কী যে ভয়! সবচেয়ে বেশী ভয় যেন লীলাকে। কালসাপিনীর মত ননদের সেই দপ্‌দপে চোখ, সেই চাপা গর্জন। সে যেন নিজেরই গাল বাঁচিয়ে বেড়াচ্ছে, কখন বুঝি তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে লীলা। কাজ করে, ছেলে সামলায় আর কান পাতে। কলের বাঁশী বাজবে কখন। কখন আসবে সেই লোকটি, তার সর্বভয়-হর। কখন শোনা যাবে মুক্ত কণ্ঠের সেই হাঁক-ডাক। যখন চারপাশের এই ভিড় করা অদৃশ্য ভয়গুলি মুখ ঢেকে পালাবে। হাওয়া খেলবে ঘরে। সেই মানুষটি আসবে কখন, তার ভয়ভঞ্জন। বিপদভঞ্জন। বিজয় নয়, শ্রীমধুসূদন!

লীলা ফুঁসছে নিঃশব্দে। পিঠের সেই ক্ষতচিহ্ন দগদগে হয়ে উঠেছে হঠাৎ। জ্বালা করছে। অনেকদিন কোন জ্বালা ছিল না। টের পাওয়া যেত না। আদরের ছলে, সেটুকু খুঁচিয়ে দিয়েছে সুকুমারি। সে তো বেশ ছিল, ভাল ছিল। এত কথা থাকতে ওইখানটিতেই সোহাগ উথ্‌লে উঠল তার গায়ের। যেখানে তার জীবনের আগুন ছাইচাপা হয়ে পড়েছিল। তার নিষ্পাপ জীবনের কলঙ্ক, অপমান, ব্যথা যেখান থেকে তাকে আজো বার বার ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে পাপের মধ্যে। তাকে উস্‌কে দিল মা। উস্‌কে দিল সেই স্মৃতিকে, যে স্মৃতি ক্ষয় করছিল শুধু তলে তলে। ধন, মন, জন নিয়ে সোহাগ ভাল লাগে। জীবনের সবার বড় ঘৃণা নিয়ে সোহাগ সহ্য হয় কার।

চুল তার এলানো। জামা নেই গায়ে, কাপড় জড়ানো। দপদপে চোখে আড়ে আড়ে দেখছে মেঘনাদকে। মেঘনাদ চিন্তিত। খাতা কলম নিয়ে হিসাবে ব্যস্ত। নতুন কাজের শুরুতে হিসাব করতে বসেছে সে। লোকজন, কি কি মাল তৈরী হবে, প্রথম কত ময়দা দিয়ে শুরু করা যাবে, এই সব। কেন না, রাজীব যাকে নিয়ে আসবে, তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে তো!

তার ফাঁকে অনেকবার দেখেছে লীলাকে। কাল রাত থেকেই দেখেছে। আজ সকালে কয়েকবার ডেকেছে। কিন্তু সাড়া পায়নি।

তার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। বড় আশা ছিল প্রাণে, এখানে মা ভাই বোনের কাছে এসে লীলা নতুন হয়ে দেখা দেবে।

কিন্তু কি হয়েছে কে জানে। সে এখানে এসেও মানিয়ে নিতে পারল না।

সে তিলিকে জিজ্ঞেস করেছে, 'তিলি, তোমার দিদি কি ঝগড়া করেছে কারুর সঙ্গে ?'

তিলি বলেছে, 'কি জানি, আমি তো কিছুই জানিনে। তোমার সঙ্গে হয়নি তো ?'

অসহায় বিস্ময়ে বলেছে মেঘনাদ, 'না, আমি তো কিছু বলিনি।'

দুঃখেও হাসি পেয়েছে তিলির। কী বিপদ। বউ কেন রাগ করেছে, তাও জানে না লোকটি। বলেছে, 'তা'হলে বোধ হয় মার সঙ্গে কিছু হয়েছে। একটু তোয়াজ টোয়াজ করে দেখ না।'

তোয়াজ! অদ্ভুত তিক্ত ব্যথিত হাসি ফুটেছে মেঘনাদের ঠোঁটে। বলেছে, 'ঠুমি, রাগ হলে সামলান যায়। তোমার দিদির যে সব কিছুতে বড় ঘেন্না।'

সাদাসিধে লোকটি এরকমভাবে কথা বললে অদ্ভুত মনে হয়। সে বলে উঠেছে, 'না না—'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।' বলে মেঘনাদ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠেছে, 'আমি জানি, শুধু বুঝিনে। খালি জানি, আমার কাজকে তার বড় ঘেন্না। কিন্তু এই কাজের জন্ত, কী যে করেছি, তা তোমার দিদি জানে না। আরো যে কি আছে কপালে, তা জানিনে। কিন্তু তোমার দিদিকে তো আমি কিছু না দিয়ে রাখিনি।'

কিছু বলবে না ভেবেছিল তিলি। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তবু না বলে পারেনি, 'হয় তো কিছু একটা দেওনি।'

বলে ফেলেও লজ্জায় কুঁকড়ে উঠেছে তিলি। ভীত হয়েছে। এরকমভাবে মেঘনাদের সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় না তার।

মেঘনাদ বলেছে, 'তোমার দিদি মিছে বলে না। এই একটা কাজেই হাত

পাকালাম চিরদিন। তাও আবার ঠেকে গেছি। ঝুমির সেই একটা কিছু যে কি, তা কোনদিন আর জানতে পারলাম না।'

বলে সে ঘরে চলে গেছে, নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে তিলি। সংশয় ছিল তার বোনাইয়ের সম্পর্কে একটু অবুঝ ভালমানুষ বলে। কিন্তু, এ তো সবটুকু অবুঝের কথা নয়।

এমন সময় এল রাজীব। একেবারে তিলির কাছে এসে বলল, 'ঠুমি, একটা চেয়ার টেয়ার কিছু আছে?'

তিলি চমকে ফিরে তাকাল। দেখল, পিপুলতলায় বিনচৌ। বলল, 'একি, বিনচৌকে নিয়ে এসেছেন?'

রাজীব বলল, 'হ্যাঁ। ভয়ের কিছু নেই।'

বাড়ির সবাই কানাকানি করতে লাগল, বিনচৌ এসেছে বিজয় মিস্তিরির ঘরে।

তিলি গেল মহেন্দ্রর বউয়ের কাছে। ওদের একটা চেয়ার আছে। কতকালের চেয়ার, কেউ জানে না। কেউ বসেও না। বারমাস এইটার উপর মালপত্র থাকে। তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে, ঘরে এনে পেতে দিল তিলি।

নকুড় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে উঠেছে। বিনয়কে আপ্যায়ন করতে গিয়েও কথা ফুটল না তার মুখে। তার বুড়ো বুকে টনটন করছে। এই সমস্ত লোক আসছে আজকে ওর বাড়িতে। তবু, তার কোন আশা নেই।

জামধরা বুকটাকে ঠেলে তবু খ্যাকারি দিয়ে উঠল নকুড়। সবই দেখছে সে। কিন্তু একদিনও তো মেঘুর সঙ্গে কথা বলেনি। সবার চেয়ে বড় আশা যে, সে তো দূরে সরিয়ে দেয়নি তাকে এখনো! শোনা যাক্ কি কথা হয়। যদি কাজ আরম্ভ হয়, তার মাঝে কি নকুড়ের একটু ঠাঁই হবে না। বিনয়কে বলে উঠল সে, 'কী ভাগ্য আমার। বসেন বসেন।'

বিনয় হেসে উঠল। বলল, 'থাক্ না, বুড়ো মানুষ, আবার উঠে দাঁড়াবার কি আছে? বসলেই তো হয়।'

রাজীব বলল, 'বিজয়ের বাবা।'

নকুড় আপ্যায়িত হয়ে স্বীকার করল, 'আঁজ্ঞে।'

বিনয় বলল, 'ও!'

মেঘনাদ এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে রইল বিনয়। একটু যেন অবাক হয়েছে। বোধহয়, মেঘনাদের চেহারাটা অকল্পিত মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে তার চোখে।

সত্যি, মেঘনাদের চেহারাটা সম্প্রতি একটু নতুন হয়েছে। তার মস্তবড় স্থূল মুখটি এখানে এসে সামান্য রোগা হয়েছে। সেইজন্য মুখটি তীব্র হয়েছে আগের তুলনায়। তার পোড়া গৌরবর্ণ তামাটে ছিল। তামাটে রংয়ের মধ্যে এখন একটু কাঁচা সোনার চাপা আভাস। চুল তার ঈষৎ পিঙ্গল। তখন ছোট ছিল। এখন বড় হয়ে তার মস্ত মুখটির সঙ্গে মানানসই দেখাচ্ছে।

মেঘনাদের চেহারা দেখে, একমুহূর্ত থমকে গেল বিনয়।

তারপর হাত তুলে নমস্কার করল। বলল, 'আসুন।'

মেঘনাদ অনেকখানি নত হয়ে কপালে হাত ঠেকাল। ঠিক সিরাজদিঘার পাকা ব্যাপারীর মত। বিনয়ের অবতার। শুধু কপালে নেই হরিনামের ছাপ, গলায় নেই তুলসীমালা। কিন্তু মেঘনাদের নেই বৈষ্ণবোচিত বিনয়। মাথা নুয়েছে। তার বিনয়ের বিদ্যার কাছে। সে শুনেছে, বিনয় ডবল এম. এ. পাশ। সেটা যে কতবড় পাশ, সবটুকু সে জানে না। বাজারদরটা জানে। ডবল এম. এ-র নগদমূল্য, রাস্তায় বেরুলেই অনেক ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান আর বিস্ময় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গে। এখানে অর্থ-মূল্য অগৌণ। বিধিমতে বিদ্যাকে ভক্তি করাই মেঘনাদের ধর্ম। অজানাকে ভয় ভক্তি, সে যে মানুষের চিরকালের ধর্ম। ওইটুকু দিয়ে সে ধন্য। তা ছাড়া, অনেক সংশয় পার হয়ে এসেছে মেঘনাদ। বিনয়ের মত শিক্ষিত মানুষ এগিয়ে এসেছে, তাকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করতে। ধানমণ্ডাইয়ের সাহেবের কথাই মনে পড়ছে তার। ভিন্নবেশে, সেই সাহেবের মতই যেন আজ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিনয়। ধানমণ্ডাইয়ের সাহেবের প্রতিও তার কিছু সংশয় ছিল মনে। আবার কেটে গিয়েছিল। আজো সংশয় কিছু আছে বৈ কি! কেটে যাবে তাও। সে তো সংশয়বাদী নয়!

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। জীবনের অভিজ্ঞতাটুকু যাবে কোথায়। মেঘ কেটে যাবে সেটুকুনি তো ভরসা।

বিনয়কে বলল, 'বসেন।'

অনাড়ম্বর বেশ, বয়সের পাল্লা ও শিক্ষা সব মিলিয়ে রাজীবের তুলনায় বিনয় তাকে আশ্বস্ত করেছে বেশী, বিনয় বড় অমায়িক, দারুণ ভদ্রলোক। বলল, 'আপনি গৃহকর্তা, বসা উচিত তা-ই আমারই। কিন্তু, আলোচনার আসল কর্তা তো আপনি। আপনিই বসুন।'

মেঘনাদ আন্দাজে বুঝে নিল, বিনয় পরিহাস-রসিক। নইলে, তাকে কখনো বসতে বলে। তা ছাড়া, চেয়ারে ক'বার বসেছে সে এ জীবনে। লক্ষ্মনসা'র গদীতে একটা চেয়ার ছিল। কেউ না থাকলে, মাঝে মাঝে সেটায় বসে পা দোলাতো। সেটা ছিল চেয়ারে বসে খেলা। টকি দেখতে গিয়ে, কিংবা এখানে সেখানে এক আধবার জড়োসড়ো হয়ে বসেছে, শেষের দিকে বসেছে গদীতে। তাও চৌকির উপর বিছানো মাদুর। চেয়ার নয়। সে হেসে উঠল; হাসলে তার চোখ দুটি ছোট হয়ে যায়। বলল, 'এখন আপনি কর্তা। আপনি বলবেন, আমি শুনব। আপনি এতবড় মানুষ, আপনার সামনে কখনো আমি বসতে পারি।'

বিনয় হেসে উঠল। ক্লান্ত মানুষের হাসি। চোখের চাউনি তেমনি করুণ বিষাদমাখা। যেন এই হাসি, এই মানুষটি সব নয়। আড়ালে আছে অরেকজন। সেই বিষাদভরা চোখ দিয়ে মেঘনাদকে দেখছে বিনয়। কোনো অনুসন্ধিৎসা নেই, তীব্রতাও নেই। তারপর তার সারা মুখটিও ভরে উঠল যেন বিষাদে। কিন্তু বিষাদ নয়, বিনয়ের গম্ভীর মুখখানিই এরকম দেখায়। চেয়ারে বসল না সে। একখানি পা তুলে দিয়ে, মুখটি আরও ভার করে বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি ভাবে আরম্ভ করবেন মনে করছেন?'

মেঘনাদ তার লেখা কাগজটি আনেনি। লজ্জা করছিল আনতে। লেখবার মত ব্যাপার কিছু নয়। মনের মধ্যেই আছে সবকিছু। তবু লিখেছিল, বিষয়টি অনুভব করার জন্য, একলা একলা ভাববার জন্য। সে ছোট করে আরম্ভ করতে

চায়। ছোট থেকে শুরু করে, ছড়িয়ে পড়তে চায় ধীরে ধীরে। যেমন করে সে একদিন আরম্ভ করেছিল সিরাজদিঘায়। কেন্নোর মত ক্ষুদ্র ও ধীরগতিতে, সন্তর্পনে, আশপাশ দেখে, প্রায় পা টিপে টিপে চলতে হবে। চোরাবালিতে না আটকায়। এদিক ওদিক হলে ভরাডুবি হতে কতক্ষণ। যদি হয়, তবে অল্পের উপর দিয়ে যাবে। ঘা লাগবে, প্রাণে মরবে না। অবশ্য সিরাজদিঘায় সে তার সর্বস্ব দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে ছিল লালামিঞা।

সে বলল, 'ভাবছি, ছোটখাটো করেই আরম্ভ করব। নতুন জায়গা, জানিনে শুনিনে কিছু।'

বলতে বলতে সঙ্কোচটা কেটে গেল মেঘনাদের। বলল, 'বাজার আমি অবশ্য দেখেছি। মাল কাটবে কিছু এখানে।'

বিনয় অপলক চোখে তাকিয়েছিল মেঘনাদের দিকে। কথাগুলি শুনেছে কিছু ভাবান্তর হয়নি তার কিছুই। বলল, 'কারখানার কি করবেন ঠিক করেছেন?'

মেঘনাদ বলল, 'একটা ঘর ভাড়া নিয়ে—'

মনে হল বিনয় একটু হাসল, 'ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে কিন্তু কারখানা করতে দেবে কেন আপনাকে?'

ঃ কারখানা আর কি, একটা তো তন্দুল হবে।

ঃ যাই হোক, আগুন তো জ্বালাতে হবে। ঘর নষ্ট হবে। মালিক তার ঘর আপনাকে নষ্ট করতে দেবে কেন? তাছাড়া ছাদ ফুটো করে চিমনী করতে হবে।

মেঘনাদ হঠাৎ জবাব দিতে পারল না। বিনয় হাসল, বুদ্ধি দীপ্ত অলস হাসি। চেয়ার থেকে পা'টা নামিয়ে সে চিন্তান্বিত মুখটা ফেরাল ভেতরের দরজার দিকে। তিলি দাঁড়িয়েছিল। সরে গেল চকিতে।

মেঘনাদ মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয় বলল, 'আপনি ছোট ছোট করছেন কেন? বড় করতে আপনার আপত্তি কি?'

মেঘনাদ কিন্তু আগের কথার জের টানল। বলল, 'আমি ছাতওয়ালা ঘরের

কথা বলছি না। কারখানা তো টিনের চালা ঘরেই হবে। টিন সরিয়েও চিমনী করা যাবে।'

একমুহূর্ত চুপ হয়ে গেল বিনয়। ঠিক! কারখানার সঙ্গে পাকা ঘরের তো কোন প্রশ্ন নেই। তার চোখের তারা দুটি চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক করল কয়েকবার। যেন ভেবে নিল বিষয়টি। তারপরে হঠাৎ বলল হেসে উঠে, 'বেশ তো, টিনের চালাঘরেই করবেন, কিন্তু কাজটা তো আগুনের। ঘরের মালিক মানবে কেন। আপনার দেশে যেটা ছিল, সেটা কিরকম ছিল? ভাড়া নিয়েছিলেন না নিজেরই ছিল?'

মেঘনাদ হাসতে গেল, পারল না। হঠাৎ কোন কথাও যোগাল না তার মুখে। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সেই ঘর। করোগেটেড্ টিনের বেড়া, টিনের চাল। সে কি ভাড়া না, তার নিজের? সে ভাড়াও নয়, নিজেরও নয়। সে দান। লালামিঞা দান করেছিল তাকে। বলল, 'ওটা কিছু নয়। আমাকে একজন দান করেছিল ওটা।'

বিজয় বলল, 'সে যা-ই হোক, ছিল আপনার নিজেরই। ব্যবসায়ী মানুষ আপনি, নিজেই বুঝতে পারেন, যা হয় তা নিজের হওয়াই ভাল। পরের ঘরের লক্ষ্মী পাতা, আমি ওসব ভাল বুঝিনে মশাই। কি বলেন?'

ঢুলঢুল করুণ চোখ দুটি তুলে ধরল বিনয়।

কি বলবে মেঘনাদ। খাঁটী কথা, সত্য কথা। পরের ঠাঁইয়ে লক্ষ্মী পাততে চায় কে। প্রাণের কথা বলেছে বিজয়। কিন্তু মনটা ততখানি চনমন করে ওঠে না। সাধ্য থাকা চাই। মেঘনাদ পূর্ববাংলার মানুষ। এখানে এসে, জমির দাম সে শুনেছে। শুনে ভয় হয়েছে তার। সিরাজদিঘায় যে জমি হাজার টাকায় পাওয়া যায়, এখানে তার দাম দশহাজার। সাহা ঘরের সন্তান হলেও, টিপে চলার মত খাটো প্রাণ নয় তার। কিন্তু যেটুকু আছে, যাআছে, আবেগের স্রোতে তাকে নয় ছয় করে দিতে পারবে না। কথায় বলে, উনো ভাতে দুনো বল। সে উনে দেবে, দুনো নেবে। দিতে গিয়ে, দুনো দিলে যে সব ফক্কিকাড়। বলল, 'আজ্ঞে, বলেছেন ঠিকই। আর, এই নতুন দেশের জমি জায়গার

বড় দাম। ভাবছি প্রথমে শুরু করি যা হোক করে। সময় এলে আমাকে রুখবে কে।'

বিজয় হাসল অভিজ্ঞ উজ্জ্বল শান্ত হাসি। রাজীবের দিকে একবার তাকাল। রাজীব তাকিয়েছিল ভিতরের দরজার দিকে। বিজয়ও একবার দেখল সেদিকে। কেউ দাঁড়িয়ে নেই সেখানে। বোঝা যায় চলাফেরা করছে অনেকে। পর মুহূর্তেই বিনয়ের হাসি হয়ে উঠল গম্ভীর বিষন্ন। বলল, 'দেখুন মশাই, সময় কখনো আসে না। আপনি করতে পারেন সেরকম করে। তবে সময় কোনদিন বসে থাকে না। যে আজ আছে সে কাল নেই। আপনাকে আমি ব্যবসার নামে, টাকা নিয়ে জুয়া খেলতে বলছি না। তবে সাহস করে, প্রাণ ধরে এগুতে হবে। আপনাকে আর আমি কি শেখাবো। লোকে জুয়া খেলে কোন্ ভগবানের নাম নিয়ে, তা জানিনে। কিন্তু সিদ্ধিদাতা গণেশের ইজ্জতকে খাটো করব কেন? যাকে প্রাণমনে চেয়েছি, তাকে সব দিতে ভয় কিসের। যিনি আজ হাত বাড়িয়ে আছেন, কাল তিনি হাত গুটিয়ে নিলে যে আমারো সব গুটিয়ে গেল।'

মেঘনাদ তাকিয়েছিল দরজার বাইরে দুর্বাছাওয়া আঙ্গিনায়। পিপুলের ছায়ায় শালিকেরা খেলা করছে। কিন্তু চোখে তার এক ফেলে আসা দিনের স্বপ্নের ঝিকিমিকি। যৌবনের প্রথম পাড়ির সেই দিনটি। কে হাত বাড়িয়ে নেবে মেঘনাদের নৈবেদ্য, কে নেবে না, হাত গুটিয়ে অসময়ে সেকথা ভাবছে না সে। তবু, এ ব্যবসা তো তার কাছে শুধু মাত্র ছাপানো নোট ও মালের লেনদেন নয়। কোথায় যেন আছে এর একটি জীবন্ত সত্তা; তাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সে দেবতা নয়, বন্ধু। মেঘনাদের মনে হয়, মেঘু যেন মনে মনে কতদিন কথা বলেছে তার সঙ্গে। সে যেন কে, কে একজন আছে। সে গণেশ নয়। পিতৃ-পুরুষের আরাধ্য দেবতা শ্রীহরি নয়। এ সে-ই, যে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে আশৈশব। তার দুর্দিনে, সুদিনে। রাত্রের অন্ধকারে, খালে বিলে বিজনে বনে। গদীর আসনে, কর্মময় তৃপ্তিদায়ক সান্নিধ্যে। এমন কি, তার ঘরোয়া জীবনের যন্ত্রনায়, হৃদয়ের বেদনায়।

মেঘনাদের হৃদয় যেখানে সায় দেয়, বুদ্ধি সেখানে বড় রকমে ঠাঁই পায় না। বিনয়ের কথার মধ্যে এক গূঢ় সত্যের সন্ধান পেল সে। তার কিশোর কাঁচা রক্তের বিনিময়ে যা সঞ্চয় করেছিল, একদিন সব সে ধরে দিয়েছিল লালামিঞার হাতে। কোন্ প্রাণে সে দিয়েছিল! দিয়েছিল কোন্ সাহসে। আজ কেন ভয়। সঙ্কোচ কিসের। যাকে দিতে হবে, তাকে রয়ে সয়ে দিয়ে লাভ কি। এ তো জুয়া নয়।

তবু এত দিনের ব্যবসায়ী মন তার সহজে চির খেতে চায় না। বিনয়ের প্রস্তাব তাকে ভেবে দেখতে হবে আর একটু।

কিন্তু চুপ করে নেই বিনয়। তার বিষন্ন চোখের ভিতরে খেলছে একটা চাপা ঝিলিক! বলল, 'দেখুন মেঘনাদবাবু। সামান্য যা করেছি, অনেক দিয়ে পেয়েছি। যা হোক আপনাকে অর্ধেক দামে আমি নিজে জমি দেব। যত ভাল, আর যত দামেরই হোক। যে দামে আপনাকে সবাই দেবে, আমি দেব তার অর্ধেক। আর দেখুন, সব কিছু কেবলি পুতু-পুতু করে ধরে রাখার কোন মানে হয় না। বিলাতী কোম্পানীগুলো কোথায় উঠেছে আজ। আর আপনারা চিরকাল কাঠ জ্বালিয়ে ময়দার ড্যালা সেঁকে দেবেন, এ চলতে পারে না। কম্পিটিশনে আপনাকে নামতেই হবে। বেকারী-ই করুন আর আলু পটল-ই বেচুন। যুগটা-ই তাই। চিরকাল মশাই আপনিই কি এরকম থাকবেন, না, থাকা চলে? ব্যবসা করতে হলে, আপনাকেও আস্তে আস্তে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতেই হবে। সেই ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আপনি কাজ আরম্ভ করুন। এই হচ্ছে আমার কথা।'

মেঘনাদ বলে উঠল, 'ঠিক কথা বলেছেন।'

নকুড় কম্পিত ঘাড় তুলে, অবাক ব্যাকুল চোখে তাকাল মেঘনাদের দিকে। মেঘনাদের মস্তবড় মুখটি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। খুশী মাখানো হাসিতে হঠাৎ অনেকখানি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল বিনয়ের। চোখে তার দূর দিগন্তের স্বপ্নের ছায়া। বলল, 'আমিও তাই চাই, জানেন। এ আমার অনেক দিনের আশা। আমি

নিজের চোখে দেখেছি সে সব যন্ত্রপাতি। সত্যি, কী না হয় যন্ত্রে। মানুষগুলো আগুনে খেটে খেটে পুড়ে মরে। মাল তৈরী হতে দেরি লাগে। আর মেশিনে কত সুন্দর, কত তাড়াতাড়ি ভাল মাল করা যায়। আপনি অনেক কথা বললেন, তাই বলছি, একটু যদি কোনক্রমে গুছিয়ে নিতে পারি. তবে একবার চেষ্টা করব-ই।'

নকুড় নিজেরই অজান্তে বার বার মনে আওড়াচ্ছিল, মেশিন! মেশিন কিনতে চায় মেঘু। তবে? তবে, যা ভেবেছিল নকুড় তাই! জামাই তার অনেক ভারী হয়েই এসেছে তা'হলে। কিন্তু সে যে একবারও মুখ খুলতে পারছে না। একবারও যোগ দিতে পারছে না তাদের কথায়। যেন নিজেকে কোনরকমে গুঁজে দিতে চাইছে সে তাদের মধ্যে তাদের বিচ্ছিন্ন ব্যূহের মধ্যে! তার বৃদ্ধ বুকটা ছেলে মানুষের মত কেঁদে উঠতে চাইছে।

রাজীব এবার একটু পাশ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় তিলিকে। যেখানে তিলি আঁচল লুটিয়ে, চুল এলিয়ে খুন্তি নাড়ছে, বাটনা বাটছে। ভাঙ্গা পাখাটি নিয়ে খচ্‌খচ্‌ করে হাওয়া দিচ্ছে উনুনে। যেখানে যোড়শী উদাস অঙ্গে স্তন পান করাচ্ছে ছেলেটিকে।

বিস্মিত চোখে আলোছায়ার খেলা। ঠোঁটের পাশে, কপালে কয়েকটি ছোট খাটো চিন্তার রেখা। ছোট অথচ গম্ভীর। কিন্তু উপর থেকে তা বোঝা যায় না। বলল, 'চেষ্টা কেন? ওই ভেবেই আপনি করুন। আপনার পারমিটের ব্যবস্থা আমি করে দেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সত্যি যদি কেউ কিছু করে আমি তার পক্ষে আছি। আপনি প্রথম থেকেই ছোট ছোট করছেন। স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। না এগুলে কি আগের কিছু দেখা যায়? এ আর আপনাকে আমি কি বলব।'

মেঘনাদ বিনীত হয়ে উঠল, বিনীত হলে তাকে বোকা মনে হয়। বলল, 'বলবেন বৈকি, নিশ্চয়ই বলবেন।' তারপর হঠাৎ তার গলাটা মোটা আর গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'জানেন, জীবনকে ভয় কখনো করিনি। খাটব খাব, সেটুকু তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ছোটকাল থেকে আছি এর পেছনে, জীবনে

অনেক করেছি, এই ভেবে দুঃখ ক'রে আমার কি হবে। আরো কত কি করতে হবে সেইটুকুই ভাবনা।'

বিনয় যেন মিশে গেছে মেঘনাদের সঙ্গে। সে যে বিনয় চৌধুরী বুঝি সেটাও মুছে ফেলতে চাইছে সে। বলল, 'বাঙ্গালি ব্যবসায়ীদের আমি ওইজন্য দুচক্ষে দেখতে পারিনি। দু'পয়সা পেলে তো, সে আর ঘরের দরজা ছেড়ে নড়চে না। সেই জন্যই মুদীখানা করা ছাড়া তার কপালে আর কিছু ঘটে উঠে না। আর বাঙ্গালি সওদাগরেরা আগে বাণিজ্য করত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। এখন মুদীখানা নয় তো শুধু সওদাগরী দপ্তরের কেরানীগিরি।'

সওদাগর! মদনসা'র ব্যাটা শিশু মেঘু জেগে উঠল মেঘনাদের মধ্যে। দূর—দূর সমুদ্দর! শতেক মাল্লার বৈঠা পড়ে। বাতাসে পাল পড়ে ছিঁড়ে। নৌকা ডুবুডুবু। দেবীর কোপ হয়েছে। এদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বউ ঘরে, প্রথম সতীনের ছেলেমেয়েগুলিকে দূর দূর করে। নিজের বেটা বেটী নিয়ে পিঠা পায়েসে চাকুম-চুকুম, সোনা গহনার ঝকর-মকর, চুবচুবে তেলে নাকন-চিকন··· নাটাই চণ্ডীর ব্রত কথা মনে পড়ছে তার।

হাসির কথা। তবু ব্যথা লাগে। বিচিত্র ব্যথা ও হাসিতে মেঘনাদের তামাটে মুখটায় আগুন লেগে গেল। সিংহ কেশরের মত চুলগুলি তার সেই আগুনের শিখা যেন। গোঁফ জোড়া খাড়া হয়ে উঠল পশুরাজের মতই।

স্বপ্ন দেখল সে চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে, মস্তবড় কারখানা ঘরে তার মেশিন চলছে ঝম্ ঝম্ ক'রে। লোক খাটছে শত শত। মিঠে বিস্কুটের গন্ধে ভরে গেছে আকাশ বাতাস।

বিজয়কে অবাক করে দিয়ে, চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে, 'আজকাল তো আর তেমন সওদাগরী চাল না। কিন্তু ব্যবসায় আমি ভয় করব না। চুপ করে পড়ে থাকব না। ঝাঁপ দেবই, জানেন। দেশে থাকতেই ভারি সাধ ছিল, বড় কারখানা করব। সময় পেলাম না।' তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পরিষ্কার গলায় বলল, 'বেশ আপনার কাছ থেকেই

জমি নেব আমি, ঘর তুলব নিজেই। আমি আমার বুক দিয়ে আগলাব। তবু মন গুমরে আর পড়ে থাকব না।'

গায়ের থেকে তার ধুতির জড়ানো অংশ খুলে গেছে। তার শক্ত চওড়া পেশল বুকটা দেখাচ্ছে লাল টকটকে। সত্য বুঝি এই বুক দিয়ে বিশ্ব আগলানো যায়। পিছনে পড়ে সব ভয় সংশয়। শত আঘাতেও ভাঙ্গবার নয় তামার পাতের মত বুকটা।

একমুহূর্ত বিজয় সেই বিশাল মূর্তির দিকে চাপা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। রাজীবও। তাদের মনে হল, বুকটা জগদ্দল পাথরের মত তাদের মুখ থেত্‌লে দিতে আসছে। লোকটিকে চিনতে দেরি হয় না। এত সাধারণ, আর এত সহজ মানুষ মেঘনাদ। অথচ লোকটার মুখের দিকে তাকালে মনটা শিউরে শিউরে উঠে।

তবু, এক স্পর্শহীন বাতাসে, কুটোস কাটির মত বিজয়ের মুখের রেখাগুলি কোথায় উড়ে গেল। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তার মুখে। আর তার পাশে, রাজীবকে মনে হচ্ছিল সপ্রতিভ শিশু। একটি মতলববাজ দুষ্টু ছেলে। এতক্ষণে সে হেসে বলল, 'তা'হলে শুভস্য শীঘ্রম্‌। লেগে পড়ুন।'

কিন্তু অসহ্য হল নকুড়ের। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে। সময় চলে যায়। সুযোগ চলে যায়, সে তো কিছুই বলতে পাচ্ছে না। পরামর্শ, আলোচনা। তার শরিকানা তো রইল না একেবারেই। সে কি তবে হেরে গেল। জিতে গেল ওই লোক দুটো। সে যে শ্বশুর। সবাইকে অবাক করে দিয়ে গলা থেকে একটা তীব্র শব্দ বেরিয়ে এল তার। যেন কেঁদে ককিয়ে উঠল ভাঙ্গা জেদী গলায়।

সবাই চমকে ফিরল তার দিকে। ছুটে এল তিলি। মুখে তার ঘাম, চুল তার খোলা। হাতে মাখামাখি হলুদ। হুতোশে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে বাবা, ওরকম করছ কেন?'

হাঁপাতে লাগল নকুড়। হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ পিটপিট করে বিস্মিত শান্ত গলায় টেনে টেনে বলল, 'অ্যাঁ? কই, কি রকম করছি? কিছু করিনি তো। গলায় কেমন একটা কাশির দলা আটকে গেছে, তা-ই—

মেঘনাদ এসে দাঁড়িয়েছে শ্বশুরের সামনে। তিলি বলল, 'তোমার তো এরকম কখনো হয় না।'

'না তো! হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল!'

বিনয় ব'লে উঠল, 'বয়স হয়েছে তো।'

তিলি নকুড়ের বুকে হাত দিয়ে বলল, 'একটু হাত বুলিয়ে দেব বুকে?'

নকুড় বলে উঠল, 'না না। সামলে উঠেছি। তুই যা, রাঁধগে। বিজ্ঞাটার আসবার সময় হল।'

কথাটা মিথ্যে নয়। কাচের চুড়ির শব্দ করে চলে গেল তিলি। তার পেছনে পেছনে গেল রাজীব। এ বাড়িতে তার অবাধগতি।

তারপর, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল নকুড় 'তা'হলে, কি ঠিক হল বাবা?'

মেঘনাদ বলল. 'আরম্ভ করে দেওয়াই ঠিক করলাম। কারবার যখন করবই তখন বসে থেকে লাভ কি। ওনারা আছেন, আপনি আছেন, নেমে পড়ি ভরসা করে।' ঘরঘরে গলায় নকুড় বলল, 'আমি আছি? আমি আর কি করব। বুড়ো মানুষ…'

নকুড় যেন ছেলেমানুষ। মেঘনাদ সস্নেহ গলায় বলল, 'বুড়ো মানুষ বলেই তো দরকার। আপনি কাছে থাকলেই যে অনেকখানি।'

নকুড়ের এবার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। তবু সে যে বুড়োমানুষ। কান্নাটাকে রূপান্তরিত করল শারীরিক কষ্টের মধ্যে। আরো দুবার কেশে, শান্ত গলায় বলল, 'নাঃ, শরীরটার কী যে হল। যাক্। তারপর, তোমাদের আর কি কথা হল?'

যেন সে এতক্ষণ শোনেনি কিছুই। মেঘনাদ বোঝাতে লাগল তাকে। এতক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল লীলা। সে দেখতে আসছিল, কে এসেছে আজ তার স্বামীর সঙ্গে ব্যবসার কথা বলতে। এতক্ষণ, তাও বেরুতে ইচ্ছে করেনি তার। সবাই যে ছুটে এল নকুড়ের জন্য, তখনো কোন চাঞ্চল্যবোধ করেনি সে। ঘরের বাইরে এসে দেখল, রাজীব কথা বলছে তিলির সঙ্গে।

তিলি কাজ করছে আপনমনে। ঠোঁটের কোনে টেপা টেপা হাসি। মুখ ফেরানো অন্যদিকে।

ষোড়শী বসে আছে ঘোমটা টেনে। আর রাজীব বোঝাচ্ছে সমিতির কথা। কথাটা নারী সমিতির বর্তমান কার্যাবলীর বিষয়।

আগোছালো বেশ লীলার। জামা কাপড় চটকানো। শুয়েছিল সে। চোখগুলি ফোলা ফোলা। চোখে তার চাপা হিংস্রতা, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপ। নাকের পাটা ঈষৎ ফোলানো। এই একই মূর্তি তার গতকাল থেকে।

ঘরে এসে ঢুকল সে। লজ্জা দূরের কথা, বরং বিদ্বেষে উদ্ধত ভঙ্গিতে সে ঢুকল। মেঘনাদ কথা বলছে নকুড়ের সঙ্গে। বিনয় ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হল তাদের। চমকে উঠল বিনয়। মনে হল, তাকে যেন কেউ চোরাগুপ্তি নিয়ে নিঃশব্দে এসেছে তাড়া ক'রে। তবু সে চোখ নামাতে পারল না। ফিরে তাকাল আবার। তাকাবার মত চোখ ছিল তার। তার বিন্‌চৌ-এর নির্ভয় হৃদয় আর মেঘমেদুর বিষণ্ণ অসহায় চোখ। ওই চোখে কখনো কোন প্রতিবাদ নেই, রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই। শুধু 'তুমি এবার মোরে লহ হে নাথ' গানের সুরে যেন ভরা। এক বিচিত্র ব্যথিত আকুতি ও ভিক্ষা সব পাওয়া রিক্ত সন্ন্যাসীর মত। ঠোঁটের হাসি যেন ব্যথিত বুদ্ধের।

বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষে জ্বালাভরা চোখ লীলার। নির্লজ্জ অপলক চোখে দেখে নিতে চাইল বিনয়ের মর্মস্থল পর্যন্ত। মেঘনাদের সহকর্মী, বিপিনের দিকে তাকায় সে এমনি করেই। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চেয়ে থেকে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিল সে। তাকাল নকুড়ের দিকে। যেন নকুড়ের কাছেই এসেছে। তবু ফিরে তাকাল আবার।

বিনয় তাকিয়েছিল তখনো, বিষণ্ণ করুণ চোখে মিশেছে মুগ্ধ বিস্ময়, কিছু ব্যাকুলতা। যেটুকু ঢেকে দিয়েছে তার পুরুষ চোখের নির্লজ্জতা।

কল নেড়ে হ্যারিকেনের শিস্ কমিয়ে দেওয়ার মত নিভে এল লীলার চোখের আগুন। হঠাৎ থিতিয়ে এল জ্বালা। ভাবল, লোকটার নাম যেন কি? বিন্‌চৌ, হ্যাঁ বিন্‌চৌ, বলেছিল তিলি। কিন্তু এ তো বিপিনের চোখ নয়।

ব্যবসার এত পরামর্শ, এত আলোচনার মধ্যেও ওই চোখ তাকে যেন বলছে, সবার উপরে তুমি। শুধু তুমি! এত কথার মধ্যেও, যেন ওই চোখ অপেক্ষা করেছিল, তাকে দেখবে বলে।

লীলার অতৃপ্ত হৃদয় পূজা-প্রত্যাশিনী। দর্পিতা চ্যাংমুড়ি কানীর বিষপ্রাণে হঠাৎ ভেসে উঠল অমৃত। কী চায় লোকটা। কেন তাকায় অমন ক'রে। রাধা নামের সাধা বাঁশীটি এক হাতে, অন্য হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরা দীন বোষ্টম লোকটা। চাওয়ার রকমফেরে ভরা দুটি চোখ। যার নেই কোনটিরই।

ভয় নেই, চমকায় না একটুও লীলার প্রাণ। ভাবল, কিছু চায় লোকটা। যে বস্তু অশ্রদ্ধা ও অরুচির ভাতের মত সে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে চায় লুব্ধ কাকের মুখে। কিন্তু দেয় না। খেলাটুকু জমে। যে বস্তু নিয়ে সে প্রশ্রয়ের হাসি হাসে, খেলা করে, লোভ দেখায় ঘরে বাইরে, ঘাটে বাটে। কিন্তু সেখানে সর্বত্রই তার ঘৃণা ও অবিশ্বাস। সব তো হ্যাংলা কাক। যে বস্তু বাসর-শয্যা থেকে আজ পর্যন্ত, তার অনিচ্ছায় কেড়েছে দলেছে মেঘনাদ। তা-ই তার বিশ্বাস। তাই তার ঘৃণা, অপমান ও বিদ্বেষ। তাই সে বস্তু হয়েছে বিষ। সে বস্তু তার বিষের প্রাণের ভালোবাসা ও দেহ। আজ সবই বিষ শুধু বিষ।

বিনয়ের চোখে কিছু ছিল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে লীলার ঘৃণা ও অবিশ্বাস হল না। পথে ঘাটের লোকগুলির সঙ্গে এক করে ফেলতে পারল না বিন্‌চোকে। তার মুখের দুদিনের রোষ, থমকানি কাটিয়ে নিঃশব্দ হাসিতে বেঁকে উঠল ঠোঁট। প্রশ্রয়ের হাসি। একটু বা বিদ্রূপের আভাস তাতে, কর্দমাক্ত কালো মাটিতে চলকে পড়া রোদের মত চকচকিয়ে উঠল মুখ। নাকছাবির পাথরে ঝিকিমিকি। পিঠে এলানো রুক্ষ চুলের গোছা টেনে আনল ঘাড় পেরিয়ে বুকে। ঘোমটার ফাঁকে, খরো চোখের তারা দুটি, ছিটিয়ে দিল আগুন। তারপর তরতর ক'রে এগিয়ে গেল নকুড়ের কাছে। মেঘনাদের ব্যবসার পরামর্শদাতাকে আর চোখের ঘৃণায় পুড়িয়ে মারা হল না। জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তোমার কি হয়েছে?'

নকুড় মেঘনাদ, কেউ টের পায়নি তার ঘরে আসা। নকুড় চমকায়নি। চমকালো মেঘনাদ। অবাক হয়ে তাকাল লীলার মুখের দিকে। কাল বিকেল থেকে কথা ছিল না লীলার মুখে। হাসি ছিল না এক ফোঁটা। অবাক হয়ে ভাবল, কি হল আবার। কেমন করে কাটল অমন সর্বনেশে মেঘ।

লীলা এসে বসে পড়ল বাপের কাছে। পান না খেয়েও আগুন লেগেছে ঠোঁটে। চোখ দুটি হাসছে আপন মনে।

দেখে শুনে খুশি হয়ে উঠল মেঘনাদ। বাপের কাছে এসে লীলার বলা, জিজ্ঞেস করা, এইটুকুতেই তার মনের সব সংশয় যেন বেরিয়ে গেল বুকের আর একটি দরজা দিয়ে। বড় দুঃসময়ে লীলা এসেছে এই বিচিত্র রূপ ধ'রে। হেসে তাকাল সে লীলার দিকে। সে হাসির মধ্যে স্নেহের আভাস। আরো আভাস, একটু প্রেমের।

লীলা কয়েকবার চকিত দীপ্ত চোখে ফিরে তাকাল তার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল আবার নকুড়কে, 'কি হয়েছে তোমার বল তো?'

সিটিয়ে গেল নকুড়ের হৃৎপিণ্ড। ঘৃণায় ভয়ে ও ব্যথায় এক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না সে। গত রাত্রের কথা সে ভোলে নি। এখনো সুকুমারির কান্না বাজছে তার বুকে। তবু বললে ঘড়ঘড়ে গলায়, 'অ্যাঁ? না, কিছু তো নয়। একটা কাশির বেগ—'

মেঘনাদ ফিরে তাকাল বিনয়ের দিকে। বিনয় তাকিয়েছিল এদিকেই। মেঘনাদ ফিরতেই বলল, 'তা' হলে আমি আজ চলি। কথা আবার পরে হবে।'

মেঘনাদ উঠে এল তাড়াতাড়ি। বলল, 'আপনি বসলেন না একদণ্ড। আসা ইস্তক দাঁড়িয়ে রইলেন।'

লীলার দিকে না চেয়েও, বিনয়ের চোখ পড়ে আছে ওই দিকেই। বলল, 'তাতে কি? আবার আসব, অনেকবার বসব, সেজন্য ভাববেন না। এখন আপনার কাজটা ভালোয় ভালোয় আরম্ভ করে দিতে পারলেই হয়।'

মেঘনাদের মনের কোথায় লেগেছে নতুন জোয়ার। বলল, 'আরম্ভ করতে দেরী করব না আর। আপনি জমি দেখাবেন কবে?'

একটু অন্যমনস্ক ভাব বিনয়ের। বিষণ্ণ উদাস চোখে বিচিত্র ঝিকিমিকি। বলল, 'চলুন না যেদিন খুশি। কালকেই চলুন। তবে একটা কথা আপনাকে কিন্তু বলা হয়নি।'

বোঝা গেল, চোখে অন্যমনস্ক বিনয়। মনে নয়। মেঘনাদ বলল, 'বলেন।'

বিনয়, বিনয় ক'রে হেসে বলল, 'যখন আরম্ভ করি, তখন আমি একেবারেই ছোট ক'রে ভাবতে পারিনে। ময়দার পারমিটটা যা'তে সেণ্ট্রালের হয় সেইটেই আমি চাই।'

চট্ করে সেণ্ট্রাল শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না মেঘনাদ। জিজ্ঞেস করল, 'কোথাকার?'

চোখের দৃষ্টি বিনয়ের বড় বড় ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল দূরে। দূরে; যেখানে উন্মুখ পাড় হাসছে সূর্যালোকে। বলল, 'সেণ্ট্রালের মানে দিল্লীর, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের। বাংলা দেশের গভর্নমেণ্ট যে পারমিট দেবে, তাতে খুব বেশী ময়দা তো পাওয়া যাবে না। যদি আপনার ব্যবসা ভালো হয়, পরে আবার ছুটতে হবে দিল্লীতে। তার চেয়ে গোড়া বেঁধেই আরম্ভ করা যাক্ না।'

এক সময়ে মেঘনাদ পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল লালমিঞার উপর। আজো কোন্ ফাঁক দিয়ে কখন একটু নির্ভরতা এসে পড়েছে তার বিনয়ের প্রতি। বলল, 'বেশ তো। তা' কি করতে হবে বলেন।'

উদাস চোখে আশ্বাসের হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এমন কিছু নয় সেটা। গভর্নমেণ্টের ব্যাপার তো বোঝেন। দিল্লী পারমিট দেওয়ার আগে দেখে নেয়, মালিকের যন্ত্রপাতি আছে কি না। দেশী বেকারি হ'লে দিল্লী পারমিট দেয় না। হাতের কাজ তো। দেশী কায়দায় কত আর মাল হবে। সেজন্যে, বড় বড় মেসিনওয়ালা কারখানাগুলিকেই দিল্লী পারমিট দেয়। পারমিটের ওজনটা অনেক বেশী কিনা। প্রথম চোটেই ষাট মণের পারমিট পাওয়া যাবে প্রতি সপ্তাহে।'

ষাট মণ একেবারে? চমকে উঠল মেঘনাদ। এত ময়দা নিয়ে সে কি করবে? আর প্রথমেই যন্ত্রপাতি দিয়ে কারখানা তো সে চালাতে পারবে না।

সে বলল, 'কিন্তু অত যন্ত্রপাতি—'

বিনয় বলল, 'অত কিসের ? আপনাকে তা' ব'লে আমি মেসিন দিয়ে কারখানা করতে বলছিনে। আপনি একটা থিন্ বিস্কুটের ডাইস্-মেসিনই কিনুন না। সেইটে দেখিয়েই আমি এখন কাজ আদায় ক'রে নেব।'

ডাইস্-মেসিনের নামটা অনেকবার শুনেছে মেঘনাদ। তবু, প্রথমেই মেসিন! মনটা তার একটু খচ্‌খচ্ করতে লাগল।

বিনয় বলল, 'ভাবছেন অনেক টাকা লাগবে। আমি আপনাকে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ডাইস্-মেসিন দেব। নতুনের দাম ধরুন তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা। পুরনো হলেও, সেটা একেবারে নতুনের মত আছে। দু' হাজার টাকায় পাবেন আপনি সেটা। সেটা দিয়ে যে আপনাকে কাজ আরম্ভ করতেই হবে, তার কোন মানে নেই। ফেলে রাখবেন ঘরে। লোহার যন্ত্র, পোকায় কাটবে না, উইয়েও ধরবে না। মাঝে মাঝে একটু তেল টেল দেওয়া। কিন্তু একটা জিনিস তো হয়ে থাকল। ওদিকেও কাজটা মিটে যায়। আর না হয় বেচেই দেবেন আবার।'

ভয় সংশয় সবই ছিল মেঘনাদের। কিন্তু মেসিনের জন্য মন তার প্রস্তুত হয়েই ছিল তলে তলে। আজ আর না বলবে না সে। শুরু তার আজ থেকেই সব। আজ তার সূত্রপাত হোক এমনি করেই। বলল, 'কিনব।'

থেমে আবার বলল, 'আপনি যখন বলছেন।'

নকুড় সবই শুনছিল। শুনতে শুনতেও, পিটপিট ক'রে দেখছিল লীলাকে। তারই পাশে বসে লীলা কার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে, দাঁতে ঠোঁট কেটে। মেঘনাদের দিকে ?

ওদিকে তিলি, অন্যমনস্ক হেসে কথা শুনছে রাজীবের। চোখ রয়েছে দিদির দিকে। অবাক বিস্ময়ে দেখছে দিদির কাণ্ড-কারখানা। এত রাগ, কিন্তু কোথায় কি হল। দিব্যি চোখে মুখে টিপে টিপে হেসে মরছে বিন্‌চৌএর দিকে চেয়ে। বিনচৌএর ভাবখানা দেখেও বড় হাসি পাচ্ছিল। রাগও হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ মনটা ব্যথায় ও ভয়ে ভরে উঠল তার। একি খেলা তার দিদির।

ঘরে জামাইবাবু রয়েছে। এত সামনে, এত কাছে স্বামী, তবুও কি একটু ভয় নেই প্রাণে। মায়া দয়া নেই কি একটুও মনে। একি খেলা আগুন নিয়ে। যেন দিদি আগুন লাগাতে চায় সবখানে। কিংবা, এ শুধুই খেলা হয় তো। সে জানে কতটুকু লীলার। মেঘনাদ তাকে নিশ্চয়ই চেনে অনেক বেশী।

চিন্তুক। তবু মনটা মানে না তিলির। সংসার, স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে, ভাজা ভাজা হ'য়ে, পাকা গিন্নী সে হয়নি। তবু, এ সংসারের অনূঢ়া জীবনে যে অভিজ্ঞতাটুকু জমেছে তার, সেটুকু কম নয়। সে নকুড়ের মত ভাবেনি, সুকুমারির মত ভাবেনি। মেঘনাদ ও লীলার আসা, সব মিলিয়ে সংসারে একটু হাসি, শান্তি একটু আশা করেছিল। কিন্তু এর মধ্যে কোথায় যেন সর্বনাশ পা টিপে টিপে ঘুরছে ছায়ার মত। বুকের ভয় ব্যথা তার গেল না।

রাজীব তখন বলছে, 'নারী সমিতির আমরা আলাদা আলাদা ডিপার্টমেণ্ট খুলব ভাবছি। সেক্রেটারীরও তা-ই ইচ্ছা। আর নারী সমিতির তৈরী জিনিস-পত্র কিনবে স্বয়ং গভর্নমেণ্ট।'

বড় অসহ্য লাগল রাজীবের বকবকানি। যেন নেই-আঁকুড়ে ছেলেটা ঘ্যান্-ঘ্যান্ করছে খাবারের সামনে বসে। দু'হাত বাড়িয়ে কি খেতে দেবে ওকে তিলি। বিরক্ত হয়, হাসিও পায়। পুরো বিরক্ত হওয়া যায় না। এ বয়সের ওইটিই রীতি। শত হলেও রাজীব একটা ছেলে কিনা।

তবু বড় বিরক্ত লাগে তিলির। ঠোঁট টিপে সোজা তাকাল রাজীবের চোখের দিকে। বলল, 'বুঝেছি।'

রাজীব বলল, 'অ্যাঁ ?'

তিলি বলল, 'চা খাবেন ?'

পরমুহূর্তেই সজাগ হল রাজীব। বলল, 'এতক্ষণে মনে পড়ল বুঝি সে কথা।' ঘড়ি দেখে, ফিরে তাকাল ঘরের দিকে। জিজ্ঞেস করল এখান থেকেই, 'কি হল বিনয়দা !'

বিনয় বলল, 'তোমার জন্যেই বসে আছি।'

রাজীব এদিকে ফিরে বলল, 'সময় নেই, আর একদিন এসে খাব।'

ব'লে চলে গেল। ঘরে আসতেই বিনয় বলল, 'কাল সকালে এসে তুমি মেয়নাদবাবুকে নিয়ে যেও আমার ওখানে। আজ তা' হলে চলি?'

ব'লে সে ফিরে তাকাল মেঘনাদের দিকে। কিন্তু মেঘনাদকে টপকে সে দৃষ্টি বাতাসের মত গিয়ে লাগল লীলার গায়ে।

লীলাও উঠে দাঁড়াল।

মেঘনাদ বলল তার গ্রাম্য বিনয়ে, 'কি আর বলব। আপনি বসলেন না। একটু কিছু খাওয়ানো হল না আপনাকে। বলবই বা কি। আপনি এতবড় মানুষ, বিদ্বান মানুষ...'

রাজীব দেখল অবাক হয়ে, বিনয় চৌধুরী এদের সঙ্গেও মিশতে কি রকম পটু। হেসে বলল বিনয়, 'ছি ছি, ওসব বলবেন না মশাই। বিদ্বানের মত বিদ্যা আমার নেই। আর খাওয়া? খাওয়াতে তো আপনাকে হবেই। দাঁড়ান, খাওয়াটা বেশী করে পাওনা হোক্, তখন খাবো।'

মেঘনাদ জোড় হাতে মাথা নত করল। এ মূর্তি সেই, সিরাজদিবার গদীর মালিক মেঘুসা'র। বলল, আমার ভাগ্য।'

লীলা তখন চোখের বিদ্যুতে, বুঝি বিদায় জানাচ্ছে তাকে। কী পেল সে বিন্‌চৌএর চোখে, সে-ই জানে। রাজীবের সঙ্গেও চোখ ঠোঁট দিয়ে খেলা খেলেছে সে। আজ একটু অন্য রকম।

বারান্দা থেকে ডেকে উঠল তিলি, 'দিদি শোন্।'

লীলা ফিরল। চলে গেল বিনয় আর রাজীব।

বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটে বউদের তখন চোখে চোখে, ঠোঁটে ঠোঁটে অনেক কথা হয়ে গেছে। কে বলে উঠল, 'কত রঙ্গ দেখালি, দাঁতের মধ্যে আঁটালি। দেখে দেখে শালা চোখ পচে গেল।'

তিলি বোঝে, এসব বলছে তাকে। এতক্ষণ যে রাজীব তার সঙ্গে কথা বলছিল। ওদের স্বামীরা সকলেই রাজীবের মজুর ইউনিয়নের মেম্বার। তবু, তিলিকে তারা ছেড়ে কথা বলবে কেন। কিন্তু ওসবে কান দেয় না তিলি।

লীলা এসে দাঁড়াতেই, বিদ্রূপ ক'রে বলল সে, 'ওমা! এত যে হাসছিস্? কোথায় গেল তোর অত রাগ?'

এক মুহূর্ত তিলির চোখে চোখ রেখে লীলা হেসে উঠল। বলল, 'রাগ কোথায় দেখলি?'

তিলি বলল, ভ্রূ কুঁচকে, 'কেন? তোর রাগ দেখে তো সারা বাড়ি ভয়ে মুখ লুকিয়ে আছে সকাল থেকে।'

পেছন থেকে মেঘনাদ ব'লে উঠল, 'রাগ কোথায় দেখলে গো ঠুমি ঠাকরুণ। এই তো দিব্যি হাসছে তোমার দিদি।'

দুজনেই অবাক হয়ে মেঘনাদকে দেখল। তারপর হাসল চোখাচোখি ক'রে। মেঘনাদ কেবলি ফিরে ফিরে দেখছে লীলাকে।

তিলি বলল, 'তাই তো বলছি। এতক্ষণ তো পেত্নীর মত মুখ করেছিল।'

মেঘনাদ আড়চোখে লীলার দিকে দেখে বলল, 'সে তো ভাই আমার কপাল গুণে।'

লীলাও আড়চোখে দেখে নিঃশব্দে শুধু ঠোঁট ওল্টালো। তিলি দেখছে দুজনকেই। মনের তলে চাপা অস্বস্তিটুকু গেল না তবু। হেসে বলল মেঘনাদকে, 'উঃ, ভারী যে বউয়ের সোহাগ হচ্ছে।'

মেঘনাদ মনটা আজ খুলে দিয়েছে। মুখটাও খুলে দিল এবার। বলল, 'যদি হিংসে হয়, সোহাগ না হয় তোমাকেও করব গো!'

তিলি বলল, 'ইস্!'

মেঘনাদের ঠাট্টায় এবার লীলাও ঠোঁট ফুলিয়ে হেসে বলল, 'মরণ!'

এমন কি ষোড়শীর ঘোমটা ঢাকা ময়লা শাড়িতেও হাসির আভাস দেখা গেল।

মেঘনাদ বলল, 'দেখি, একবার ডাকঘরে যেতে হয়। পোস্টকার্ড এনে বিপিনদা'কে একটা চিঠি লিখে দিই। এবার তাকে আসতেই হবে।' সে জামা গায়ে দিতে গেল। বিপিনের নাম শুনে লীলার ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল

একবার। তেরছা চোখে মেঘনাদকে দেখে তিলিকে বলল, 'হ্যাঁ রে, মুখপুড়ি, একটু হেসেছি ব'লে এত তোর গায়ে লেগেছে কেন ?'

হাসতে হাসতে তীক্ষ্ণ চোখে একবার লীলার চোখের দিকে তাকালো তিলি। বলল, 'তা' হাস না তোর যত খুশি। তবে দেখিস্ দিদি, হেসে হেসে যেন মরিস নে।'

লীলাও তৎক্ষণাৎ জবাব দিল স্পষ্ট গলায়, 'ম'রে যদি জ্বালা জুড়োয়, না হয় মরব।'

দুই বোনের তীক্ষ্ণ দু'জোড়া চোখের চাউনি যেন শাণিত দুটি ইস্পাতের ফলা পরস্পর ঠোকাঠুকি করল। তবু কেউ হাসিটুকু ছাড়ে না।

তিলি বলল, 'দ্যাখ দিদি, মলে যদি জ্বালা জুড়োত, সবাই তবে মরত।'

লীলা ঃ তবে মরেই দ্যাখ।

তিলি ঃ সত্যি প্রাণ চায় বড়।

বলে দুজনেই হেসে উঠল হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে। লীলা বলল, 'বড় পেকেছিস্।'

তিলি আর হাসতে পারছে না। মনে হল, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে বুঝি এখুনি। তবে হাসি বজায় রেখেই বলল, 'সত্যি কাঁচা থাকতে আর দিলে না।'

এমন সময় বাঁশী বেজে উঠল কারখানার। ষোড়শী উঠল ধড়ফড়িয়ে। সে দুই ননদের কথা শুনছিল একমনে।

তাকে লাফ দিয়ে উঠতে দেখে লীলা বলে উঠল, 'দ্যাখ মাগীর কাণ্ড। চোখে মুখে আর পথ দেখতে পাচ্ছে না।'

তিলি বলল, 'তা-ই না বটে। কলের জল এনে রেখেছিস্ বউদি ?'

ষোড়শী বলল সভয়ে, 'না তো।'

ঃ শীগ্‌গির যা রাককুসি। নইলে দাদা এসে হাত পা ছুঁড়বে'খনি তেল কালির হাত ধোবার জল না পেলে।

মনে মনে বলল ষোড়শী, 'ছুঁড়ুক।' বলার সাহস তার আছে। তবু ঘুমন্ত ছেলেকে শুইয়ে, বাল্‌তি হাতে ছুটে গেল কলে।

মহেন্দ্র মিস্তিরির বেকার ভাইটা এতক্ষণ বসে বসে সব দেখেছে। এবার হঠাৎ গেয়ে উঠল,

'তোমার সবার কাছে আনাগোনা।
শুধু আমায় চেয়ে দেখ' না॥'

ব'লে চোখের কোণ দিয়ে, বারান্দার দিকে দেখে বেরিয়ে গেল। এ সময়ে তাকে বেরুতেই হবে। মহেন্দ্র এ সময়ে তাকে এসে বাড়িতে দেখলেই ক্ষেপে যাবে। কাজের খোঁজ না ক'রে বসে থাকা সহ্য হয় না।

লীলা তিলি চোখাচোখি করল।

তারপর বিজয় এল। সঙ্গে সঙ্গে বউও ঢুকল জল নিয়ে। জমে উঠল বাড়ি আর পাড়া।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে সাড়া পড়ল। ছিনে জোঁকের মত ঘিরে এল সবাই জলকলে।

নকুড় চোখ পিট্‌পিট্‌ ক'রে দেখল এদিক ওদিক। সুকুমারিকে খুঁজছে। বুড়ো মনটা বড় আন্‌চান্‌ করছে। বুড়ি গেল কোথায়।...এল না দেখে, টুকটুক ক'রে গেল জংলাপুকুরে চান করতে।

বিজয় এল, খেল, চেঁচাল, ছেলে জাগাল, কাঁদাল। মা কোথায়, জিজ্ঞেস করল কয়েকবার। মেঘনাদ আসতে বিন্‌চৌএর বিষয় কথা হল। বিজয়ের মনটা একটু খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। তবু হঠাৎ কিছু বলা ঠিক নয় ভেবে বলল না কিছু। চলে গেল কাজে। যাওয়ার আগে, এক ফাঁকে গাল দুটি টিপে দিয়ে গেল ষোড়শীর। ষোড়শীও বোধকরি সেইজন্যই এতক্ষণ চান করতে যেতে পারছিল না।

অনেক বেলা অবধি মেঘনাদ একখানি চিঠি লিখল বিপিনকে, 'বিপিনদাদা, তামাকের আড়তদার রমজান মিঞার কাছে সব দেখাশোনার ভার দিয়া চলিয়া আইস। তুমি না আসিলে আমার আর চলে না।'

তারপর সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেল।

সকলের সব পাট চুকে গেল। সুকুমারি বাড়ি আসেনি তখনো। নকুড় ঘুমোতে পারছে না। ছট্‌ফট্‌ করছে।

রোদ মাথা থেকে গেছে কখন। বেঁকে পড়েছে। পিপুলের ছায়াটা হেলে পড়ে দরজার সিঁড়িতে এসে পড়েছে। আশ্বিনের শেষ। রোদ এখনো বেশ চন্‌চনে। আর বড় চন্‌মনে হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই তর্‌তর্‌ ক'রে আসে, যায়ও তেমনি। বর্ষা গেছে নাবিতে। পেছনে পড়া মেঘের ছুটকো দল চলেছে সারাদিন। রং আর তার জলভারে কালো নয়, তুলোধোনা হয়ে গেছে।

গাছগাছালি ডাঁটো-সাঁটো ঘোর সবুজ। পিপুল ঝাড়ালো হয়েছে। ঘাস বড় হয়ে উঠেছে উঠোনের। চারপাশে বেড়েছে বন। বুক চিতিয়ে উঠেছে মান। আগুন ছিটানো বিছুটিও কেমন সবুজের ঝাড় বেঁধেছে। অল্প অল্প হাওয়া আছে।

হাওয়ার শব্দে, শালিকের ডাকে চমকে চমকে নকুড় বাইরে তাকায়। সুকুমারি আসে না। চোখ দুটো টনটনিয়ে উঠছে। রাগে দুঃখে বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছে। কারুর খেয়াল নেই। বারান্দায় বসে আছে সবাই। তিলি, লীলা, যোড়শী, আরো কয়েকজন। বাড়ির বুড়িটার কথা কারুর মনেও নেই।

আছে, মনে আছে। তিলির মনটা আর মানছে না। রাগ করলে অবশ্য সুকুমারি এরকম দেরী করে মাঝে মাঝে। বসে থাকে গিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর ঘরে। কিন্তু আজ যেন বড় বেশী হচ্ছে। বড় ছটফট করছে মনটা। ঘরে বাইরে, কাজে আড্ডায় ঘোরে সে সারাদিন। জানে, মা আছে কাছে কাছে। এখন তিলির মনটা বড় খারাপ হয়ে উঠল। উঠে পড়ল সে।

লীলা বলল, 'চললি কোথায় ঠুমি।'

তিলি বলল, 'একটু দেখি আসি, মা কোথায় গেল।

কি ভেবে লীলা বলল, 'চল্‌ তবে আমিও যাই।'

যোড়শীর মনটা ছটফট করছিল। সে পথ চেয়ে রইল বসে।

বেরুল দু'জনে। রাস্তায় এসে, এদিক ওদিক দেখে এগুল পশ্চিমে। খানিকটা গিয়ে নগার বাড়ি। নগার বাড়ির উত্তরে ফটিক কেওরার বাড়ি। নগার বেউ টেঁপী গোবর কুড়োয় এখানে সেখানে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল তিলি, 'টেপীদি, মা এসেছে তোমাদের এখেনে?'

টেঁপী ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, 'না তো।'

: কোথাও যেতে দেখেছ?

টেঁপী এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার মা'কে রেল নাইনের দিকে, পূবে যেতে দেখেছি।'

রেল লাইনের দিকে? হঠাৎ আতঙ্কে চোখ দুটি বড় হয়ে উঠল তার। বলল, 'কখন গো?'

: তা হবে, বেলা পেরায় এগারোটা লাগাত্।

: অ্যাঁ?

কান্নায় কথা আটকে গেল তিলির গলায়। লীলা বলল, 'ওরকম করছিস কেন তুমি?'

তিলি বলল, 'মা যে রাগ করে গেছে। রাগ ক'রে এপাড়া থেকে মেয়েরা রেল লাইনে গেলে আর ফিরে আসে না কেউ।'

কাঁটা দিয়ে উঠল লীলার সারা গায়ে। কালো চকচকে মুখ ফ্যাকাসে ছাই ছাই হয়ে উঠল। এ যেন সেই লীলাই নয়। সে যেন কি পাপ করেছে।

তিলি বলল, 'চল্ দিদি যাই।'

দুজনে ছুটল হন্‌হন্ ক'রে।

ঘরে গিয়ে কেশো গলায় হিহি ক'রে হেসে উঠল টেঁপী। শুক্‌নো মুখে, সুকুমারিও হাসছে কয়েকটা দাঁতে। টেঁপীকে সে ওই কথা শিখিয়ে রেখেছিল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছে সবই। নিজের মনেই বলে উঠল, 'কেন, এখন কেন? মা' মলে তো সবাই বাঁচিস। তবে আবার অমন ছোটা কেন? ছোট্, ছোট্ হারামজাদীরা।'

টেঁপী তো হেসেই বাঁচেনা। হাসে আর বলে, 'ও মা গো! খুব শোধ

নিয়েছ খুড়ি।' তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'ভর দুপুরে মেয়ে দুটো গেল। তা' তোমায় না পেয়ে যদি ডবকা ছুঁড়ি দুটোই রেলে মাথা গলিয়ে দেয়?'

'কি বললি?' শিউরে উঠে সুকুমারি চেঁচিয়ে বলল, 'ডাক্ ডাক্ ওদের, চেঁচিয়ে ডাক্।'

'ত্যাকো কাণ্ডো!' ব'লে রাস্তায় এসে টেঁপী চড়া গলায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'ঠুমি। এ—ই ঠু—মি।......'

দু বোন তখন গলি পেরিয়ে প্রায় বড় রাস্তায় পড়ো পড়ো। থমকে দাঁড়াল। টেঁপী হাতছানি দিল। বলল, 'ফিরে আয়, ফটিকদের বাড়িতে নাকি বসেছিল।'

নিজের ঘাড়ে দোষটা নিল না সে।

কিন্তু টেঁপীর গলায় 'ঠুমি' চীৎকার শুনে চমকে উঠল নকুড়। ঝিমুনো মাথাটা তুলে ধরল হঠাৎ সন্ত্রস্ত গোসাপের মত। মনটা কু গাইছিল। হঠাৎ 'ঠুমি' চীৎকারে, ভয়ে অবশ হয়ে গেল। খালি ভাঙ্গা গলায় বলতে লাগল, 'কি হল? কি খবর? চেঁচায় কেন?'

দরজার কাছে এসে জবাব দিল সুকুমারি, 'কিছু নয়, এমনি। ঘুমোওনি?'

নকুড় উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, 'কে, বিজার মা? এলে?'

পরমুহূর্তেই দারুণ অভিমানে গলাটা বুজে এল তার। খালি বলল, 'বিজার মা, আমার আর বাঁচতে সাধ নাই। একটুও না।'

ভেউক্, ভেউক্—পোঁ-পোঁ—

বিজয় বলল, 'সরে এস বোনাই। বিন্‌চৌএর গাড়ি আসছে।'

সন্ধ্যাবেলা বেরিয়েছে শালা ভগ্নিপতি। মেঘনাদ সরে গেল ধারে। গাড়িটা চাপা স্বরে খেউ খেউ করতে করতে, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। বিজয় দেখল বিনয়ের বউ আর দুটি ছেলে রয়েছে গাড়ির মধ্যে।

নিজের মনেই বলে উঠল সে, 'ও, পূজোর ছুটিতে ছেলেরা এসে পড়েছে।'

মেঘনাদ বলল, 'কার ছেলে?'

বিজয় বলল, 'বিন্‌চৌএর। ওই যে, গাড়িতে গেল বউ ছেলেরা।'

এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'শালা আশ্চর্য মাইরী, জানো বোনাই বিন্‌চৌএর বউকে কোনদিন সোয়ামীর সঙ্গে কেউ বেরুতে দেখেনি! ছেলেগুলোও ছুটি ছাটাতে বাড়ি এলে, বাপের সঙ্গে বেরোয় না।'

মেঘনাদ বলল, 'কেন?'

: কি জানি! ওদের মাগ-ভাতারকে কেউ কোনদিন কথাই বলতে দেখেনি। বউটাকে দেখতে কিন্তু মাইরী খুব ভাল মানুষ মনে হয়। শুনেছি দিল্লীর মেয়ে। খুব লেখাপড়াও জানে।

সন্ধ্যা হয়েছে। বাতি জ্বলে উঠছে দোকানে। ভিড় হচ্ছে চা-খানায়, খাবারের দোকান আর হোটেলে। অল্প বাতাস, মন্থরগতি। শহরের ধোঁয়া ধুলো সহজে নড়ছে না।

মেঘনাদ দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ বিজয়, তোমার বিন্‌চৌ-ই বল আর ভগবানই বল, বউ-সোয়ামীর মনের সুখে জমজমাট সংসার বড় ভাগ্যির কথা। এ সংসারে মন পাওয়া বড় দায়। মনের মিল কি চাড্ডিখানি কথা।'

কথাটা কেমন করে যেন বেরিয়ে গেল মেঘনাদের মুখ দিয়ে। আর কথাটি শুধু কথা নয়। কথাটির মধ্যে কোথায় যেন বোনাইয়ের মনোকষ্টের ব্যাপার ছিল। লীলাকে দেখে সেটা একটু একটু আঁচ করতে পারে বিজয়। কিন্তু বুঝতে পারে না।

কথাটি বলেও মেঘনাদের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে না। বুকের ফানুসটা আরো ফুলে ফেঁপে, তার চেহারাটিকেই শুধু মস্ত ক'রে তোলে।

বিজয় বলল, 'ঠিকই বলেছ বোনাই। মনের মানুষ কজ'না পায়।'

তারপর বলল, 'বিন্‌চৌ আর তার বউয়ের মধ্যে কী যেন একটা আছে, জান! ভেতরে না-ই গেলে। সোয়ামী ইস্তিরি একটা বাড়িতে থাকে, সেটা বাইরে থেকে আঁচ করা যায় না?'

বলে হঠাৎ দাঁড়াল। এখানটায় দোকানপাট একটু কম। সামনেই, পূবদিকে একটা মস্ত বড় বাড়ি। যেন ভুতুড়ে বাড়ি। এতবড় বাড়ি, কোন সাড়া শব্দ নেই। দরজা জানালা বন্ধ—অন্ধকার। ইলেকট্রিক কানেক্‌শন্ নেই।

একটি ঘরের জানালায় সামান্ত হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভেতর থেকে অনেক মানুষের চাপা গুলতানি শোনা যাচ্ছে। বাড়িটা দেখিয়ে বিজয় বলল, 'বোনাই, এইটে বিন্‌চৌদের আসল ভিটে। ভেতরে অনেক বড়। বিন্‌চৌএর আর আর ভায়েরা থাকে এখেনে। কিন্তু শালা, বিন্‌চৌ দুরের কথা, এ্যাদ্দিন এসেছি, এই বাড়িটার ভাব কিছু বুঝলাম না মাইরী!'

আবার এগুল দুজনে। বিজয় বলল, 'আমরা যখন এখানে এসেছি, তখনো বিন্‌চৌ কলকাতায় পড়তে যায়। এই বাড়িটাতে থেকে বিন্‌চৌএর জ্যাঠা বিন্‌চৌএর বাপকে জগ্ দিয়ে দিলে, জান।'

মেঘনাদ বলল, 'কি ক'রে?'

ঃ কি জানি কি ক'রে। পূবে, রেললাইনের ওপারে ওদের অনেক জমি ছিল। কী যে করলে শালা ওর জ্যাঠা, ওর বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসল। এক আধবার না, অনেকবার। বছরে একটা ক'রে কাণ্ড ঘটত ওদের বাড়িতে। বিন্‌চৌএর ভায়েরা তো জ্যাঠাকে ঠ্যাঙ্গা নিয়ে খুন করতে চেয়েছিল।

ঃ বিন্‌চৌ চায়নি?

ঃ না, এইটেই শালা অবাক ব্যাপার মাইরী। বিন্‌চৌ সেরেফ্ লেখাপড়া নিয়ে থাক্‌ত, আর পাড়ার লোকে ওকে বড় ছেদ্দা করত। তখন কিন্তু কেউ ওকে বিন্‌চৌ বলত না। সবাই বলত, এই ছেলেই বাপের সব দুঃখু ঘোচাবে।

ঃ ঘোচায়নি?

ঃ কোথায়? কলকাতায় দুটো ডবল পাস ক'রে চলে গেল বাড়ি ছেড়ে। জ্যাঠা বাড়ি ছেড়েছিল অনেক আগে। বাপ ম'ল কিছুদিনের মধ্যে। তারপর বাকী তিনটে ভাই শালা রোজই দাঙ্গা করত। তারপর অনেকদিন বাদে বিন্‌চৌ এল ফিরে। সঙ্গে বউ আর দুই ছেলে। এখন শুনি, এ বড় বাড়িটাও কিনে নিয়েছে বিন্‌চৌ। কোনো ভায়ের আর শরিকানা নেই। থাকবে কি ক'রে? ট্যাক্সো খাজনা দেবে না। কেউ তো কিছু করত না। একে তাকে জগ্ দিয়ে চালিয়ে দিল চিরটাকাল। বিন্‌চৌ এসে ট্যাক্সো খাজনা মেটালে, সব ভায়েদের কিছু কিছু টাকা দিলে। টাকার গুঁতোয় লিখে দিলে সকলে।

ঃ ভালোই তো হয়েছে। নইলে ওরা আর কাউকে বাড়িটা বিক্রী ক'রে দিত।

ঃ হ্যাঁ, এখন বিন্‌চৌএর ফেঁসো কারখানার দরোয়ান আসে বাড়িভাড়া আদায় করতে।

হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে, এমনিভাবে ডাকল মেঘনাদ, 'বিজয়।'

ঃ বল।

ঃ বিন্‌চৌকে তোমার ভাল লাগে না, অনেকবার বলেছ। সে যে আমার কারবারে একটু দেখাশোনা করতে চায়, সে কি তোমার ভাল মনে নিচ্ছে না?

বিজয় বলল, 'কথাটা যদি তুললেই বোনাই, তবে বলি, বড় ভয় করে, জান! ওর বড় দুর্নাম। নিজের চোখেই দেখেছি, কত লোকের জমি মেরে দিলে। ওর ফেঁসো কারখানায় তিরিশটা মেয়ে কাজ করে। শালা, কেউ ওকে ভাল বলে না। জান, ও আমাদের চটকলের কেউ নয়, তবু আমাদের বিষয় নিয়ে মালিকের সঙ্গে কথা বলে। জানি রাজীবদা-ই ওকে গুরু মেনেছে। কিন্তু ও আমাদের কোনদিন ভাল করেনি। এই নিয়ে রাজীবদা'র সঙ্গে কতবার আমাদের ঝগড়া হয়েছে। আমরা ইউনিয়ন তুলে দিতে চেয়েছি। বিন্‌চৌ ইউনিয়নের কেউ নয়, কিন্তু শালা আমাদের লীডাররা ওর কথা ছাড়া চলে না, আমরা জানি। সবতাতেই এমনি, বিন্‌চৌ সবখানে আছে। এখানে পান থেকে চুন খসলে আমরা মনে করি, আড়ালে বিন্‌চৌএর হাত আছে।'

একমুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'তবে বোনাই, তুমি পুরনো কারবারী। টাকার স্বাদ পেয়েছ তুমি, মর্যাদা তুমিই জান। আমার শালা হপ্তার টাকা ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অথচ দেখেছি আমার মত মিস্তিরি আবার মুদী কারবার করে। একটার বদলে দুটো বউ পোষে। কোত্থেকে করে শালারা, ভগবান জানে। তাই বলছি, এসব কারবারে আমার চেয়ে বিন্‌চৌকে তুমি বুঝবে ভাল।'

তাদের খেয়াল নেই, কোথায় এসেছে তারা। দুজনেই মগ্ন নিজেদের কথায়। মেঘনাদের ভারী মুখে চিন্তার ছায়া।

চিন্তা নয়, অস্বস্তি। মনের কথাটি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছে না বিজয়কে। থেমে থেমে খাপছাড়া ভাবে বলল, 'আজ আর আমি শুধু ব্যবসাই করতে যাচ্ছিনে বিজয়। টাকার স্বাদ কে না পেতে চায়। টাকা চায় সবাই। তুমি চাও, আমিও চাই। বাটপাড়ি করে তো চাইনে।'

তারপর কি বলতে গিয়ে তার সারা মুখ বিচিত্র আলোয় ভরে উঠল। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'বিজয়, লোকে ভক্তি ক'রে মন্দির গড়ে। সেখেনে ঠাকুর পিতিষ্ঠে করে। করে না?'

বিজয় অবাক চোখে বলল, 'তা' করে।'

মেঘনাদ চাপা আবেগভরা গলায় বলল, 'আমিও মন্দির গড়তে চাই।'

আরো অবাক হল বিজয়। মেঘনাদকে বোকা আর পাগল মনে হতে লাগল। বলল, 'কিসের মন্দির বোনাই।'

মেঘনাদ বিজয়ের ঘাড়ে তার ভারী হাত রেখে বলল, 'কারখানা হে কারখানা, বড় কারখানা, তাতে আমি মেশিন পিতিষ্ঠে করব। আমার মাল অল্প, কিন্তু একটু একটু ক'রে খাড়া করব। সেই মন্দিরে আমার টাকার পুঙ্গি কবে হবে জানি না। কিন্তু এ না হলে আজ আর সিদ্ধিলাভ হবে না। এখন নতুন ক'রে কাজ শিখতে হবে। নতুন কাজের মিস্তিরি হব আমি। পেছিয়ে কেন থাকি? আজকে সময় পড়েছে অন্যরকম, সেইরকম করতে হবে। হাতে কলমে ছেঁকে পুড়ে যা শুরু করেছি, যন্তরে-ই যদি তার শেষ হয়, তা' হলে সেই শেষ দেখব না? বড় সাধ। সেই দেখে যেন আমি মরি। আমি সোনার পালঙ্ক আর হাওয়ার গাড়ি চাইনে। আমি যেন নতুন কিছু করে যেতে পারি এই কারবারে।

সে যেন দিব্যচোখে দেখতে পেল তার সেই যন্ত্র-মন্দির। ঘর্‌ঘর্‌ ক'রে মেশিন চলছে। ময়দা ডলছে, তাতছে, ছাচ কাটছে, ঝাঁজরী মুখে দুধ পড়ছে ফিন্‌কি দিয়ে। মেশিনে হবে না মেঘার মালপো? কিংবা ঝুমির ঝুরি!

আরো ঘন হ'য়ে, সে প্রায় বিজয়ের কানে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলল, 'বিজয়, আস্তে আস্তে আমি সেই মন্দির গড়তে যাচ্ছি। আমি হরিসেবায় কোনদিন দশটা টাকা খরচ করিনি। কিন্তু আমার যা আছে সব দিয়ে আমি ওইটি করতে

পারব না ? তবে আস্তে, খুব আস্তে। ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে ঢেলে দেব ওইদিকে।'

নির্বোধের মত তাকিয়ে রইল বিজয়। কখন তারা ঘুরে ফিরে সেই গঙ্গার ধারে এসেছে, টের পায়নি। দূরে খেয়াঘাটের আলোয়, মেঘনাদকে অচেনা লাগল বিজয়ের। একটা অতিকায় বিরাট অমানুষিক মূর্তি। চাপা উল্লাসের লক্ষণ তার সর্বাঙ্গে। বিজয় এ মানুষটাকে চেনে না! মানুষটার কথাও বুঝল না। একটুও অনুভব করতে পারল না তার উল্লাস।

মেঘনাদ বলল, 'কিন্তু এখুনি নয়। এতো আমার সারা জীবনের কথা হে। কিন্তু বল, এ বিষয়ে আমাকে কে দুটো কথা বলে একটু সাহায্য করবে। কে একটু পরামর্শ দেবে, একটু দেখবে শুনবে? যার কথা বল, আমি তার কাছেই যাব।'

কি বুঝল বিজয়, জানিনে। সে হঠাৎ দৃঢ় গলায় বলল, 'বিন্‌চৌ ছাড়া এখানে আর কারুর কথা তো আমার মনে হচ্ছে না বোনাই। সে যদি সত্যি সত্যি তোমাকে দেখে, তা'হলে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না।'

মেঘনাদ বলল, 'লোকটাকে তো ভাই আমার তেমন খারাপ মনে হল না। একটু বেশী 'বড় বড়' বাই আছে লোকটার। বোধহয় খেটে ব্যবসা করতে হয়নি তাকে তা-ই।...'

বিজয় তখন অন্য কথা ভাবছে। গঙ্গার ধার থেকে তাদের কারখানাটা দেখা যায়। কারখানার চিমনীর মাথায় দুটো লালবাতি জ্বলছে। একপাল শুয়োর ছড়িয়ে পড়েছে গঙ্গাধারের আলো-আঁধারি আনাচে-কানাচে।

মেঘনাদের মন্দির গড়ার কথা শোনার পর থেকে তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে, ওই চটকল কারখানা। বোনাইয়ের যন্ত্র কারখানা যদি মন্দির, তবে ওইটাও মন্দির। তারও বিরাট যন্ত্র। ওইটা যদি মন্দির, তবে তার সেবাইত নিশ্চয় কোম্পানী। আর পুজুরী হল ওই ম্যানেজার, সেলসাহেব, কেরানীসাহেব আর লেবার অফিসার। তবে আমরা কি?

মুহূর্তে তার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল। দু'চোখে জ্বলে উঠল ঘৃণার আগুন।

ওই মন্দির তাদের দিবানিশি শুষছে। ফাঁক পেলেই ঠকাচ্ছে। কাজ নয়, যেন চোরাবালিতে চলেছে তারা পা টিপে টিপে, কখন ভরাডুবি হবে, সেই ভয়ে।

চকিত আলোয় সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল তার চোখ থেকে। মনে মনে বলল, বুঝেছি. বোনাইয়ের এত খুশীর কারণ বুঝেছি। বোনাইয়ের লোভ বেড়েছে। সে আজ আর অল্পে তুষ্ট নয়। সেই ওই কারখানার মত মন্দির গড়ে, নতুন সেবাইত হতে চায়।

সে ডাকল, 'বোনাই।'

মেঘনাদ তন্ময় ছিল নিজের ভাবনায়। তন্ময় ছিল, আপন বেগে চলা ওই গঙ্গার মত।

বলল, 'বল।'

: তা হলে আমাদের কারখানাটাও মন্দির।

হঠাৎ আন্দাজ করতে পারল না মেঘনাদ তার কথা। বলল, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

বিজয় বলল, 'বুঝেছি বোনাই। আমরা শালা হাজারগণ্ডা ওই মন্দিরে পেষাই হই। তুমিও শয়তানের মন্দির গড়তে চাও।'

হৃৎপিণ্ডে তীর-বিদ্ধ পশুর মত অস্ফুটে আর্তনাদ ক'রে উঠল মেঘনাদ, 'না না।'

বিজয়ঃ তা-ই বোনাই, তা-ই। তোমাদের জাত আলাদা। বড় বড় কথা বলছ, পুজো, মন্দির। ছেনালের সাবিত্রী ব্রত। তোমাদের মত ধর্ম্মিষ্টরা কেন ওই মন্দির গড়ে, তা' আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। শালা, সেরেফ্ টাকার নেশা আর লোভ।

ব্যথা ও বিস্ময়ে দলা পাকিয়ে গেল মেঘনাদের মুখ। গোঁফজোড়া কাঁপতে লাগল। সে ডাকল, 'বিজয়।'

বিজয় তবু বলে গেল, 'আমার মত অনেক লোকেরা তোমার কারখানায় একদিন মিস্তিরি হবে। তুমি আমার বোনাই, বোনের বর, তোমার যন্ত্রের কারখানা হবে, আমার শালা কত সুখ। কিন্তু বোনাই দোহাই, মাইরী মন্দির বলো না ওটাকে। বলির পাঁটার মত আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

বিজয়কে ভালবাসে মেঘনাদ। তার আর সহ্য হল না। বলে উঠল, 'শালা, তুই কি বলছিস।'

'ঠিক বলছি বোনাই। তুমি বল, কারখানা হবে, লোক হবে। একদিন তোমার কারখানার মজুরেরা ইউনিয়ন করবে, লড়বে। হায়রে শালা মন্দির। ঠিক বলেছ বোনাই। অমন খাসা মন্দির আর হয় না, সংসারে।' মেঘনাদ চুপ। দুজনেই চুপ। আগে, মেঘনাদের কথা বুঝতে পারছিল না বিজয়। এখন বিজয়ের কথা বুঝতে পারল না মেঘনাদ। বুকভরা একটা দুরন্ত চীৎকার পথ না পেয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বিজয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল মধ্য গঙ্গার স্রোতের ঝিকিমিকিতে। চোখে তার বোবা বিস্ময় ও ব্যথা। টাকার নেশা, ইউনিয়ন, লড়াই···। বুঝল না কিছু।

আকাশে মিটি মিটি তারা, ধোয়া আকাশে জ্বলছে সোনার বিন্দুর মত। যেন টোকা দিলে বেজে উঠবে টিং টিং করে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে শুয়োরগুলি দূরের খেয়াঘাট থেকে আসছে চাপা গুলতানি।

হৃদয়বেগে দুজনেই সমান। মেঘনাদ ভাবল, সর্বস্ব পণ করে আমি যাত্রা করছি। কিন্তু এ কিসের তুলনা দিচ্ছে বিজয়। শয়তানের মন্দির! কেন, কেন? আমি পড়ে থাকব পেছিয়ে, মান্ধাতার আমলে। যা সুরু করেছিলাম, তার শেষ দেখব না! এ কি আমার পাপের আশা। আমার এত সাধ, এত বাসনা। আমি কাউকে মারতে চাইনে, ডোবাতে চাইনে, ঠকাতে চাইনে। কিন্তু যন্ত্র দিয়ে কারখানা গড়ব একদিন পুরোমাত্রায়, আমার সেই সৌভাগ্য অপরাধ! কেন, কেন?

যদি ষ্টীমার পাই, তবে কেন বৈঠা ধরে হাল টানি। সে না ফিরেই দৃঢ় গলায় বলল, 'বিজয়, তোমার কথা আমি সব বুঝলাম না। কিন্তু যা-ই বল, ওই আমার চাই। যতদিন বাঁচব, খাটব, শুধু ওইজন্য। ঘরছাড়া হয়েছি, সর্বস্ব নিয়ে এসেছি। লোভ বল, নেশা বল, যা-বল, পলে পলে খেটে খেটে ওইখানেই যেতে চাই। মরবার আগেও। সে-ই আমার সুখ। আমার চিরকালের আশা।'

বিজয় কি দেখল মেঘনাদের মুখে, কথা বলতে পারল না। পাপ লোভ নেশা, কিছুই দেখতে পেলনা তার মুখে। বরং সেই সুদূর দিনের আশার আবেগটাই আমার এসেছে ফিরে। মুখ ভরে উঠেছে স্বপ্নে।

সে কি বুঝল কে জানে। নিজের সংশয় ও জ্বালাকেই চাপা দিল সে। বলল, 'বোনাই, খুব রাগ করেছ?'

: না। তুমি এত কথা বললে, আমি আমার দোষ ধরতে পারলাম না।

মেঘনাদের অস্পষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত আবার চুপ করে রইল বিজয়। তার কথা কি বোনাই একেবারেই বোঝেনি। আশ্চর্য! বলল, 'বোনাই, কি কথা যে বলেছি, তা বোধহয় নিজেই শালা ভাল বুঝিনে। ঘরপোরা গরু কি না, তাই অমন ফোঁস ফোঁস করে উঠেছি। তোমার সেদিনের তো দেরী আছে এখনো।

: হ্যাঁ, বুঝি অনেক দেরী।

: 'আসুক সেদিন। সেদিন যদি মাইরী তোমার প্রাণটা এমনি থাকে, তবে বেঁচে যাই।' তারপর একমুহূর্ত নীরবতার ফাঁকে, সে দিনের ছবিটা ভেসে উঠতে লাগল। তারই সঙ্গে, বাপ মা ভাই বোন, এমন কি লালা, যাকে নিয়ে বোনাইয়ের প্রাণে হয় তো কিছু ব্যথাও আছে, সকলের একটা পাল্টা ছবি দেখা দিল। হঠাৎ বলল হেসে, 'দেখো বোনাই, সেদিন যেন আমার দিদি, তোমার কালোবউটাকে ভুলে যেও না।'

মেঘনাদ হেসে উঠল। হাসতে হাসতে, হঠাৎ ব্রেক কষার মত চাপা শব্দে থেমে, দাঁত খিঁচানা যন্ত্রের মত বিকৃতমুখে বলল, 'ভাই তোমার দিদির কালো মুখ কোনদিন পাইনি। যদি কালো পায়ে একটু ঠাঁই পাই, মেঘুসা'র তা-ই অনেক ভাগ্য।'

ব'লে আবার হেসে উঠল। তীব্রস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল একটা শুকরী। পরমুহূর্তেই একটি বিচিত্র যাদু মাখানো চাপা সুর ভেসে এল, হা—হুপ্! হা—হুপ্!···সেই শব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠল জানোয়ারগুলি। জান্তব সোহাগে নাক

দিয়ে কোঁৎ কোঁৎ শব্দ করে সেই স্বরের দিকে এগুতে লাগল। ডাক পড়েছে ওদের পালকের!

গঙ্গা ছল্‌ছল্‌ করছে।

এই সময়ে, গঙ্গার ওপারে, খেয়াঘাটের ভেজা মাটি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল নারিকণ্ঠের চাপা হাসিতে। লীলা আর তিলি এসেছিল নদী পার হ'য়ে সিনেমা দেখতে। একপারের ছবিগুলি দেখা হয়ে গেছে আগেই। এবার আর এক-পারের সিনেমা দেখে, ছুটে আসতে আসতেও খেয়া নৌকাটি গেছে ছেড়ে। তাই হাঁফ ধরা-গলায় দু' বোনের এত হাসি। এত বিস্রস্ত এলোমেলো ভাব।

তিলি আজ আসতে চায়নি। লীলা তাকে চুল ধরে টেনে এনেছে প্রায়। যাবিনে কি লো মুখপুড়ি। আজ তার প্রাণে তীব্র স্রোত। আজ সে বেরুবেই, ঘুরবেই, ছুটবেই, হাসবেই। প্রাণ না চাইলেও, না এসে তিলির উপায় কি। বাদলাপোকার বোবা উল্লাস লেগেছে মনে। মহামরণের আলেয়া জ্বলছে দিকে দিকে দপ্‌ দপ্‌ ক'রে।

হাঁপাতে হাঁপাতে হাসতে হাসতে এল দুই বোন। তিলি বলল, 'মুখপোড়া মাঝি একটু দেখতেও পেলে না আমাদের!'

লীলা বলল, 'সে চোখ কই ব্যাটার!'

হেসে উঠতে গিয়ে থামল দুজনেই। একটা নৌকা নোঙর তুলছে। ঘাটে বাঁধা কিন্তু খেয়াপারানী নৌকা নয়। লোকে বলে এগুলিকে প্রাইভেট্ নয় তো রিজার্ভ। খেয়াঘাটে পয়সা দিতে হয়, আবার এদেরও দিতে হয় অনেক বেশী। নৌকার যাত্রী দেখা যায় না।

দুই বোন কিছু বলবার আগেই, নৌকাটা একটি পাক খেল। তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। পশ্চিমা মাঝি যেন কার সঙ্গে কথা বলল। নৌকা একেবারে কিনারে নিয়ে এসে বলল দুই বোনকে, 'আইয়ে মাইজী।'

দুই বোন চোখাচোখি করল। তিলি জিজ্ঞেস করল, 'কত বেশী নেবে?'

মাঝি ফিরে তাকাল ছইয়ের ভিতর। ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল

একজন পুরুষ। ধূতি পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক। ঘাটের ওপরের আলোয় চট্ ক'রে চেনা যায় না। বেরিয়ে এসে বলল, 'ওপারে যাওয়া হবে তো? আমি রিজার্ভ করেছি, পয়সা কেন? আমিই তো রয়েছি।'

হুজনেই চমকে উঠে দেখল বিন্চৌ। সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি তাকাল তিলি আর লীলা। লীলার চোখে বিস্ময় ও চাপা হাসি। তিলির বিস্ময় ও তীব্র অনুসন্ধিৎসা। চাপা অসহায় ও ভয়। হঠাৎ মনে হল, সবটাই যেন সাজানো, পূর্বপরিকল্পিত। কিন্তু লীলার হঠাৎ বিস্ময়ে, ষড়যন্ত্রের কোন চিহ্ন নেই। মানুষের মুখ দেখে তো বোঝা যায়।

দুজনকেই নীরব দেখে বিনয় বলে উঠল, 'ভুল করিনি নিশ্চয়ই। আমাদের বিজয়ের বোন ঠুমি তো তুমি।'

ওমা! নামও জানে দেখছি। না জানবে কেন। রাজীবের কাছে শুনেছে নিশ্চয়। তা' বলে ডাক নামটা-ই! তিলির ইচ্ছে হল, বলে, ঠুমি নয়, তিলক-রাণী সাহা। আজকাল নাকি দাসী বলা উঠে গেছে।

জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

বিনয় বলল, 'তবে এস, আর দেরী ক'রো না।'

লীলা বলল, 'চ'না।'

তিলি দেখল দিদির চোখে, ছেঁড়া নোঙরের টান। সে উঠবেই, ভাসবেই ওই নৌকায়। তবু বড় ভয় করে। তবু উঠতে হল।

বিনয় বলল, 'তোমরা ছইয়ের ভেতরে বসতে পার ঠুমি, আমি বাইরেই আছি।'

ছইয়ের ভেতরটা অন্ধকার। বিন্চৌ অচেনা নয়। তবু তিলি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাটাতনের উপর। তবে শক্ত করে ধরা লীলার আঁচল। যেন লীলা ঝাঁপ দিতে পারে জলে।

বিনয় বলল, 'যদি ভেতরে না বস, তবে ছইয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াও। নয়তো পড়ে যাবে।

তাই দাঁড়াল দুজনে। বিনয় দাঁড়াল একটু সরে। নৌকা ছেড়ে দিল

মাঝি। ডাঙ্গায় বাতাস তেমন টের পাওয়া যায় না। কিন্তু গঙ্গার বুকে বাতাস আছে। পাল তুলে দিল মাঝি।

মধ্যঋতুর শেষ টানে ঢলো ঢলো গঙ্গা। ছোট ছোট ঢেউ ছপাৎ ছপাৎ করে লাগছে নৌকার গায়ে।

তিলি দেখল, লীলার বাঁকা ঠোঁটে হাসি। বিন্‌চৌ তাকিয়ে আছে সকালের মতই। চাউনির অর্থটা অস্পষ্ট নয়। কিন্তু কোন নগ্ন কদর্যতা নেই। বিন্‌চৌএর চোখে আরও কিছু ছিল। তার চোখের বিষণ্ণ ব্যাকুলতা।

হঠাৎ বিনয় বলল, 'কোথায় গেছলে?'

কাকে বলল। দু বোনই ফিরে তাকাল। বিনয় আবার বলল, 'তুমি?'

তিলি বলল, 'সিনেমায়।'

বিনয় বলল, 'ও।' তারপরে বলল তার ভদ্রভাষায়,'ইনি বুঝি তোমার দিদি?'

তিলির রাগ হল। কিন্তু, প্রতিপত্তিশালী ভদ্রলোক বড়লোক বিন্‌চৌ। তাকে তো যা তা বলা যায় না।

বলল, 'হ্যাঁ।'

জানে বিনয়। তবু, এতক্ষণে আইনত ফিরে তাকাবার অধিকার পেল যেন। লীলার কাছ থেকে হাতখানেক দূরে সে। আঁচল এসে উড়ে উড়ে লাগল প্রায়। বিজয় মিস্তিরির বাড়ির কাউকে আপনি ক'রে বলা বিনয়ের পক্ষে শক্ত। কিন্তু লীলা মেঘনাদের স্ত্রী। বলল, 'ও, আপনি তা'হলে মেঘনাদবাবুর স্ত্রী।'

লীলা ভ্রূ তুলে, একটু যেন বিদ্রূপভরে তাকাল। ভাবখানা, সে কথা বুঝি এখনো জানে না?

আর জ্ঞানী গুণী বিত্তশালী বিনয় চৌধুরীকে বলল লীলা, 'আপনি তো বিন্‌চৌ।'

তিলির সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেল ভয়ে। বিনয় এক মুহূর্ত থেমে হেসে উঠল হা হা ক'রে। বলল, 'শোনা হয়ে গেছে দেখছি এর মধ্যেই। কে বলল?'

আরো ভয় পেল তিলি, সর্বনাশী নাম করবে নাকি! কিন্তু লীলা বলল, 'অনেকেই।'

হাসির রেশটা যায়নি তখনো বিনয়ের। বলল, 'ও।'

তিলির মুখের দিকে আড়চোখে দেখে লীলা আবার ঠোঁট উল্টে বলল, 'খুব রাগ করলেন নাকি?'

: কেন?

: ওই নামটা বললাম ব'লে?

: না। বরং ভালই লাগল। ব'লে ঘাড় কাৎ ক'রে তাকাল বিনয়। যেন বলতে চাইল, অন্তত তোমার মুখে ভালই লাগে। তারপর বিষাদ অথচ খুশী মাখানো চোখে তাকিয়ে রইল একমুহূর্ত। আবার বলল, 'ওই নামে ডাকে আমাকে সবাই। তবে আড়ালে। যদি ভাল লাগে, ডাকুক। আপনার যদি ভাল লাগে—'

'তা' হ'লে ওই নামে ডাকব?' বলে খিলখিল্ করে হেসে উঠল লীলা। হাসতে হাসতেই বলল, 'তা' আমার বেশ লাগে ওই নামটি। বড়মানুষি বড়মানুষি গন্ধ থাকে না। বরং—'

চোখের কোন্ দিয়ে বিদ্যুৎ হানল লীলা। মধ্যগঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে দুলছে তার শরীর। বিনয় বলল, 'বরং?'

লীলা বলল, 'কাছের মানুষ মনে হয়।'

: সত্যি! বিনয় হেসে হেলে পড়ল যেন আরো। আর লীলা হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম ক'রে, তিলির গায়ে পড়ল। তিলির আর সহ্য হয়নি। সে লীলার আঁচল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে। লীলা সামলাতে পারে নি। বলল, 'কি লো মুখপুড়ি, এখুনি যে পড়ে মরতাম।'

তিলির কথা পর্যন্ত ফোটে না মুখে। মনে মনে দাঁত পিষে বলল, 'বাঁচা যেত তা'হলে।'

আর কী বিচিত্র বিনয় চৌধুরী। লোকে দেখলে হয় তো বিশ্বাস করতে পারত না, সে এমনি করে কথা বলছে সদ্যপরিচিতা বিজয় মিস্তিরির দিদির সঙ্গে। এমনি হেসে হেসে, প্রেম নয়, এমনি পীরিতে গদগদ হ'য়ে। যারা তাকে বিন্‌চৌ বলে, তারাও ভাবতে পারে না বোধ হয়। পশ্চিমা মাঝিটা অনেক

দিনের মানুষ। অনেকদিন পার করেছে বিনয়কে। সেও কোনদিন বাবুর এমনতরো জোয়ার ঢালা গঙ্গার কলকলানি দেখেনি। ভাবছে, কে হবে এই জেনানা দুটো!

ইতিমধ্যে বিনয়ের উদাস চোখ চলে গেছে দূর গঙ্গায়। ঈষৎ ফিরে বলল, 'মেঘনাদবাবু আসেনি যে আপনাদের সঙ্গে!'

লীলা বলল ঠোঁট উল্টে, 'নাদ্‌বাবুর এ সব স্বাদ ভাল লাগে না। রুটির কারখানা করবে কে তবে?'

তিলির ক্রোধ চড়তে লাগল। বিনয়ের চোখে অন্ধকার গঙ্গার তরঙ্গের ঝিকিমিকি। সহৃদয় গলায় বলল, 'সত্যি, ভদ্রলোকের এতবড় একটা আশা! জমজমাটি কারবার ফেলে চলে এসেছেন। দেখা যাক্. মনে হয় ওঁর কারবার ভালই চলবে।'

'সত্যি নাকি? তা' হতে পারে। বিন্‌চৌ যখন আছে'—ব'লে বিদ্রূপ ভরে হেসে উঠল।

একমুহূর্ত দিশেহারা মনে হল বিনয়কে। বিদ্রূপের পাল্লাটা ঝুঁকেছে কোন্ দিকে, ঠিক ধরতে পারছে না। বলল, 'আপনারা স্বামীস্ত্রীতে খুবই মনোকষ্টে আছেন, বুঝতে পারি।'

লীলা মনে মনে বলল মাইরী! তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁট রেখায়িত ক'রে বলল তীব্র গলায়, 'সত্যি? বুঝতে পারেন? তবে মনোকষ্ট দূর হবে নিশ্চয়!'

পরমুহূর্তেই সে উঃ ব'লে আর্তনাদ ক'রে উঠল। তিলি প্রাণপণ জোরে চিমটি কেটেছে ডানায়। রাগে তার কান্না পাচ্ছে এবার।

লীলা বলে উঠল, 'রাক্কুসী, খুন করবি নাকি?'

চাপা গলায় বলল তিলি, 'হ্যাঁ।'

লীলা হেসে উঠল। আর বিনয়ের মন, তার চাউনি দুলতে লাগল দূরগঙ্গার অন্ধকার ও হঠাৎ আলোর ঝিকিমিকির মত। ঘাট এসে গেছে সামনে। সে অল্প ঝুঁকে উদাস মোলায়েম গলায় বলল, 'মনোকষ্ট দূর করতে পারব কিনা জানি নে, চেষ্টা করব।'

গলায় তার অদ্ভুত গাম্ভীর্য ও গভীরতা। লীলা ফিরে তাকাল। চোখাচোখি তাকিয়ে রইল একমুহূর্ত। তারপর বিনয় সরে গেল অনেকখানি। ঘাটের আলো এসে পড়েছে নৌকায়।

নৌকা লাগতেই ছুটে এল দুটি রিক্সাওয়ালা। বিন্চৌ বাবুকে নিয়ে যাবে তারা। বিনয় বলল, 'রিক্সায় যাবেন তো?'

তিলি বলল লীলাকে, 'না, পায়ে হেঁটে যাব। বেশী দূরে তো নয়।'

আর একবায় চোখাচোখি করে বিনয় চলে গেল রিক্সায়। অস্ফুটে বলে গেল, 'চলি, দেখা হবে পরে।'

তিলি নীরব। হন্হন্ ক'রে চলেছে লীলাকে পেছনে ফেলে। লীলা পা চালিয়ে কাছে এল। তিলি হিঁসিয়ে উঠল চাপা ঝাঁঝালো গলায়, 'বিন্চৌএর বুকে পড়তে ইচ্ছে করছিল বুঝি?'

লীলা বলল, 'তা যা-ই বল্, মানুষটি বেশ।'

: তুই তো বেশ বলবিই। বড় ভাল লেগেছে কি না।

: মন্দ লাগার কি আছে। তোদের এখানে মস্ত মানুষ। প্রাণে রসও আছে। কেমন করে তাকাচ্ছিল।

: যেন তোর সঙ্গে পীরিত করছিল।

লীলা হেসে বলল, 'মাইরী, সেইরকমই মনে হচ্ছিল।'

রাস্তাটি মিলের পাচিলের পাশ দিয়ে গেছে, আর এক দিকে মাঠ। বড় বড় গাছ ধারে ধারে। কৃষ্ণচূড়া, পিপুল, পিটুলি, তেঁতুল ঢেকে দিয়েছে রাস্তাটার মাথা। খেয়াঘাটের যাত্রী ছাড়া মানুষ থাকে না। এখন একেবারে ফাঁকা।

তিলির রাগ সপ্তমে উঠেছে। বলল, 'লজ্জা করে না?'

: কিসের লজ্জা!

: লজ্জা যাক্, ভয়ও কি নেই?

: কেন, কিসের ভয়?

: হ্যাঁ, তোর বড় বুকের পাটা। ভয়ও নেই। তা' বলে কি একটু মায়া-মমতাও নেই?

বলতে বলতে লীলার হাত ধরে ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'তোর পায়ে পড়ি লো দিদি, পায়ে পড়ি, এমন করিস্‌নে।'

বিষয়টিকে ভয়ের কিংবা লজ্জার মনে হয়নি একটুও লীলার কাছে! তা'হলে এ জীবনে অনেক আগেই ভয়ে লজ্জায় মরতে হত! মায়া মমতা! তার কি দাম আছে এ সংসারে। সকলেই আছে নিজ নিজ পথে। আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির আশায়। কে কবে কার প্রাণের দিকে তাকিয়েছে। একটি চাবিকাটি পেয়েছে সে একজনের। যৌবনের চাবিকাটি। ভাবে, আজ দেখি পুরুষের ওইটি সবচেয়ে সস্তা। পথে ঘাটে বেড়ায় ফেলে ছড়িয়ে। কী দাম তার। বুক ভরা আগুন নিয়ে সে ছুটেছে দিকে দিকে।

তিলির ব্যাকুল ফোঁপানিতে একটুও মন ভিজল না তার। তীব্রগলায় বলল, 'ন্যাকামো রাখ্‌ ঠুমি, এসব আমার ভাল লাগে না। যা পাইনি তার জন্য আমার লজ্জা ভয় মায়ামমতা নেই।'

তারপর তীব্র বিদ্রূপ ক'রে বলল, 'চব্বিশ বছর পার হ'তে চললি, বলিস বুকে তোর আঁচড় লাগেনি একটুও। বুক ভরে, মন ভরে কিছু চাস্‌নি, তুই কি বুঝবি? কাঁদছিস্‌ ঠুমি, তোর কে আছে? কী আছে?...'

অসহ্য যন্ত্রণায় চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল তিলি, 'চুপ কর্‌ চুপ কর্‌ দিদি। ঘাট হয়েছে, আর বলব না, কখনো না।'

আর কোন কথা না বলে, হেঁটে চলল তারা। গলির মোড়ে এসে তিলি হঠাৎ তরল গলায় বলল, 'দেখো, আবার বাড়ি গিয়ে যেন মুখ হাঁড়ি ক'রে থেক না। সবাই ভাববে, আমি আবার কিছু বলেছি।'

লীলা হেসেই বলল, 'বলেছিস্‌ তো মুখপুড়ি।'

বিজয় আর মেঘনাদ তখনো বাড়ি ফেরেনি। নকুড় জড়িয়ে জড়িয়ে নামগান করছে। সুকুমারি ভাড়াটেদের ঘরে কথা বলছে। শুধু পথ চেয়ে বসে আছে ষোড়শী। ঘরের মাঝখানে কাপড় টাঙ্গানো, পার্টিশন খাড়া করা হয়ে গেছে। অতন্দ্র দুই চোখ অন্ধকার ঘরে। কোলের কাছে ছেলে ঘুমন্ত। মানুষের সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখল দুই ননদ।

জিজ্ঞেস করল তিলিকে, 'কি দেখলে আজ ঠাকুরঝি?'

সিনেমায় যাওয়ার সময় তিলি তাকে ডেকেছিল। সে যায়নি। ভয় করে কেন যেন। বোধ হয় বিজয় সঙ্গে থাকে না ব'লে। তিলি বলল, 'তখন বললাম, গেলিনে কেন। আমি বলতে পারব না।'

তারপরে বলল, 'আচ্ছা, বলব'খনি।'

কিন্তু বলা আর হল না। খাওয়া দাওয়া হল। একে একে শুয়ে পড়ল সবাই।

লীলা ঘুমোল, নকুড় সুকুমারি যোড়শী, সবাই। বিজয় মেঘনাদ ফিরে আসেনি। জেগে বসে আছে তিলি। কেন যেন মেঘনাদের উপর তার প্রচণ্ড রাগ হয়েছে। মেঘনাদ তার বউকে সামলাতে পারে না। কয়েকটি কড়া কথা বলবে তাকে।

শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে গেল। নিকষ অন্ধকারে গাছপালা জেগে রইল একটি ছম্‌ছমে ভুতুড়ে বড় সত্তায়। ঝিঁঝিঁর একটানা ডাক আর শিউলীর গন্ধ বাতাসে।

বেশ একটু দেরীতেই ফিরে এল দুজনে। হাত মুখ ধু'ল। খেতে বসবার আগে হঠাৎ বলল তিলিকে, 'কি তুমি ঠাকরুণ! অমন করে বারবার তাকাচ্ছ যে? কি হয়েছে?'

তিলি বলল, 'তোমার উপর বড় রাগ হয়েছে।'

: কেন বল তো?

তিলি হঠাৎ হেসে উঠে চাপা দিল মুখের ভাব। বলল, 'কেন আবার। এত দেরী করলে কেন?'

: ও, এই কথা!

মেঘনাদ ফিরিস্তি দিতে লাগল তাদের ঘুরে বেড়াবার।

বিজয় খালি বলল, 'কাল ভোরে আর উঠতে পারব না।'

আর তিলি ভাবতে লাগল, বিশ্বসংসারে বুঝি সবই মিথ্যে, সত্য শুধু, তার কিছু নেই, কিছু না।

পরদিন সকালে রাজীব এল। মেঘনাদ তৈরী হয়েছিল যাওয়ার জন্য, বলল, 'আসেন। আপনার জন্য বসে আছি। বিজয় চলে গেল কারখানায়। সে সঙ্গে গেলে বড় ভাল হত।'

রাজীব বলল, 'কেন, বিজয়কে আপনার কি দরকার জামাইবাবু।'

মেঘনাদ একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'মেশিনপত্রের ব্যাপার তো ঠিক বুঝি না। বিজয় সঙ্গে গেলে একটু দেখে শুনে নিতে পারত। বিনয়বাবুকে আমার অবিশ্বাস নেই তা' বলে। তবে আমার একটা কর্তব্য তো আছে।'

রাজীবের ঘুর্ণায়মান দৃষ্টি একমুহূর্ত স্থির হয়ে রইল। ব্যস্ত চিন্তিতভাবে, আঙ্গুল দিয়ে চিবুকে ঠুকল একটু। তারপর হঠাৎ বলল, 'বাইরে চলুন। রাস্তায় যেতে যেতে আপনাকে কয়েকটি কথা বলব।'

মেঘনাদের মুখে একটু অস্বস্তি দেখা দিল। কি আবার বলবে রাজীব। দুঃসংবাদ যদি কিছু থাকে, এখানেই বলুক।

রাজীব হেসে বলল, 'কি হল, ঘাবড়াচ্ছেন নাকি? খারাপ কিছু বলব না।' বলতে বলতে রাজীবের চোখ ব্যস্ত চিলের মত ঘুরতে লাগল আশেপাশে। কাকে যেন খুঁজছে। ভাবছে, আর কেউ কি নেই এ বাড়িতে। নকুড় হয় তো কোথাও গেছে। কিন্তু তিলি কিংবা তার দিদি এরা সব কোথায়?

তিলি ছিল বারান্দাতেই। ইচ্ছে করেই নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল। লীলা ভাড়াটেদের কারুর ঘরে আলাপে ব্যস্ত।

মেঘনাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল রাজীব। মেঘনাদ পাটভাঙ্গা বাগেরহাটের ময়ূরকণ্ঠী রংএর পাঞ্জাবী পরেছে আজ। ধুতি পরেছে ধোপদুরস্থ। যদিও দশহাতে কাপড় তার খাটো হয় পায়ে। পরেছে পাম্‌শু। কেবল, মাথার চুলগুলি তার বাগ মানেনি। শুধু জলে কিছু হয় না। ভাল করে তেল জল মাখালে তবে আঁচড়ানো যায়। নইলে, পাকিয়ে পাকিয়ে পাঁশুটে কোঁকড়ানো চুল সাপের ফনার মত ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। তার চেহারা দেখলে এমনিতেই একটু ভয় ভয় করে। আজ পোশাকের পারিপাট্যে খানিকটা সম্ভ্রমের উদয় হচ্ছে।

বিজয় কাল বলে রেখেছিল, বোনাই একটু ফর্সা জামাকাপড় প'রে যেও। হাজার হোক তোমার একটা ইজ্জৎ আছে।

জামা কাপড়ে ইজ্জৎ কতখানি বাড়ে, সে জানে না। কিন্তু তাকে অনেকবার তাকিয়ে তাকিয়ে তিলি দেখেছে। তারপর ঠাট্টা করে বলেছে, 'যা-ই বল বোনাই, তোমার চেহারাটা-ই এমনি, মনে হয় না যে বিজয়মিস্তিরির বাড়ি থেকে বেরুচ্ছ।'

মেঘনাদ বলেছে, 'সকালবেলাই এসব কি বলছ। তা' হলে আমি আর বেরুতে পারব না কিন্তু।'

ঃ না, সত্যি বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে।

মেঘনাদ গোঁফ পাকিয়ে বলেছে, 'পছন্দ হয় তা' হলে?'

তিলি বলেছে, 'ইস্!'

কিন্তু বলতে গিয়ে বুকটা খচ্ করে উঠেছে। মেঘনাদের কথার জন্য নয়। গতকাল লীলার কথাগুলি মনে পড়ে গেছে।

রাস্তায় বেরুতে প্রথম দর্শন হল অমৃতর সঙ্গে। অমৃত চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় চললেন জামাইদা?'

নিশ্চয় পরিপাট্যর জন্যই এ প্রশ্ন। লজ্জিতভাবে জবাব দিল মেঘনাদ, 'বিনয় বাবুর কারখানায়।'

অমৃতর বৈষ্ণব হাসি বাঘের দাঁত খিঁচনোর মত দেখাল।

বড় রাস্তা পার হয়ে, পাড়ার ভিতর দিয়ে পূবদিকে চলল তারা। যুদ্ধের সময় পূবদিকের মাঠে ছোটখাটো দু'একটা কারখানা হয়েছে। কিন্তু পাড়াগুলির গ্রাম্যতা কাটেনি একটুও।

পানাভরা পুকুর আর শেওলা পড়া ভাঙ্গা ঘাট। বাসনমাজা কাপড়কাচার ভিড় সেখানে, চালকুমড়োর মাচা নয় তো পুই লাউডগা ফোঁস ফোঁস করে ক'রে উঠেছে ছাদে কিংবা চালায়। গাছগাছালির ভিড়, শরতের রৌদ্রছায়ায় এক বিচিত্র বর্ণবাহার। কান পাতলে পাখিরও ডাক শোনা যায়। এখনো বাগ্দীপাড়া, দুলেপাড়া, বামুনপাড়ার নাম ঘোচেনি, রূপও ঘোচেনি।

রাজীব বলল, 'আপনাকে বলেছিলাম, দেখুন সে যা-ই হোক বিজয় আমার অনেক আপন। আপনাকে সেইজন্য আমি জামাইবাবু বলেছি। আমি যখন সঙ্গে আছি, তখন আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন।'

মেঘনাদ খুশী হয়ে ফিরে তাকাল রাজীবের দিকে। রাজীব আবার বলল, 'বিনয়বাবু লোক খুব ভাল। দেখুন, মানুষ একটু বড়লোক হলে, তার বিরুদ্ধে লোকে অনেক কথা বলে। বলবেই, নইলে দুনিয়াটা শুদ্ধ একদিনেই সবাই ভগবান হয়ে যেত। কিন্তু ধরুন, বিনয়বাবু যদি আপনাকে ঠকাতেই চান, আমরা কি সব মরে গেছি?'

মেঘনাদ শশব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, আমি কিন্তু বিনয় বাবুকে মোটেই খারাপ মনে করিনে। উনি বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ—'

বাধা দিয়ে রাজীব বলে উঠল, 'না আমি বলছি, আপনি ভাবলেও কিছুমাত্র অন্যায় করেননি জামাইবাবু। টাকা পয়সার ব্যাপার। বিদ্বান বুদ্ধিমান হলেই তাকে যে একেবারে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে হবে, তার কি মানে।'

রাজীব একটু থামল। কিন্তু কোন সমর্থনসূচক কথা-ই বেরুল না মেঘনাদের মুখ দিয়ে। মানুষকে কেন সে খারাপ ভাববে, কেন অবিশ্বাস করবে অকারণ।

রাজীব কি বলতে চাইছে! এযে দুরকমের কথা হয়ে গেল। অবিশ্বাস করবে না আবার বিশ্বাসও করবে না পুরোপুরি। এ সংশয় মনে নিয়ে কাজ আরম্ভ করবে কি করে সে। তার মুখের দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে রাজীব বলল, 'আমি কি বলছি জামাইবাবু জানেন। বলছি, বিনয়বাবু যা-ই করুন, সেটুকু দেখাশোনার ভার আপনি আমার উপর দিতে পারেন। আমার এইটুকু অনুরোধ যখন যা-ই করুন, আমাকে একটু জানাবেন আগে। বিনয়বাবুকে আপনার কাছে আমিই ডেকে নিয়ে এসেছি। পান থেকে চুন খসলে, বিজয়ের কাছে আমার আর মুখ থাকবে না। আপনি সবই করুন, আমার কথাটা ভুলবেন না। আপনার সব কাজে আমাকে একবার স্মরণ করবেন।'

রাজীবের কথায় মনের অস্বস্তিটুকু দূর হল মেঘনাদের। সে বুঝল, রাজীব যে তার ভরসা, একথাটি বলবার জন্য সে উন্মুখ হয়েছিল। সকলের আড়ালে

মেঘনাদের কাছে সে তার প্রাণটা খুলে দিয়েছে। যদি কিছু হয়, সেই ভয়ে, আত্মসম্মানের জন্য আগেই সে নিজের কর্তব্যটুকু ক'রে রাখল। সে বলল, আপনারা ছাড়া, আর কার কাছে যাব। আপনি বলবেন, তবে যাব? আমি নিজে বুঝি আপনার উপর ভরসা করিনি।'

রাজীব বলল, 'জানি, তবু বললাম। জানেন আমাদের বংশ চিরকাল ব্যবসায়ী। একমাত্র আমি ছিটকে চলে এসেছি অন্যদিকে। না এসে পারিনি। স্বাধীন হয়েছি কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকী।

তারপর হঠাৎ হেসে তার চিল-চোখে তাকিয়ে বলল, 'তা' না হয় ঘরের ব্যবসা দেখিনি। দেশের কাজ করতে করতেও না হয় আর একজনের ব্যবসা-ই একটু দেখব। গায়ের রক্তটা তো ব্যবসায়ীর।'

হেসে উঠল সে। মেঘনাদের চোখ পড়েছে ততক্ষণে একটি বিরাট ঢিপির উপরে। উইঢিপি এত বড় হয় না। যেন পাঁশুটে বর্ণের একটি টিলাপাহাড়। জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি?'

রাজীব বলল, 'ওই তো বিনয়দা'র কারখানা। ওটা দেখছেন ঝাড়াই ফেঁশোর ময়লা।'

কারখানার বেড়া বেষ্টনীর মধ্যে এসে ঢুকল তারা। কম্পাউণ্ডটি বেশ বড়। একদিকে চালাঘরে ফেঁশো ঝাড়াই হচ্ছে। আর একটি বড় ঘর গুদাম ঘরের মত লম্বা। পাশেই আর একটি ছোট কোঠাঘর। বিনয়ের অফিস। অফিসের দরজার সামনে একটি লোক বসে রয়েছে টুলে। সে চাকর। কাজ করছে অধিকাংশই মেয়েমানুষ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে কয়েকটি। কোলের ছেলে নিয়েই কাজে এসেছে কয়েকজন মেয়ে মজুর। ছেলেগুলি গাছতলায় কাঁদছে, খেলছে, কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে।

বিনয়ের অফিসে আসতে সে হেসে অভ্যর্থনা করল মেঘনাদকে। চেয়ার দিল বসতে। সিগারেটের টিন দিল বাড়িয়ে।

মেঘনাদ জোড় হাতে সঙ্কোচ ভরে বলল, 'আরে না না, কি করছেন?' এরকম অভ্যর্থনায় সে কোনও দিনই অভ্যস্ত নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই

বিনয়ের অফিস দেখতে লাগল। দেওয়ালে খানকয়েক ছবি। কয়েকটি যন্ত্র আর মোটা কম্বলের মত কাপড়ের ছবি। টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন, সবই ঝকঝকে তকতকে।

মেঘনাদ বুঝল, কারখানার চেহারা যা-ই হোক্, বিনয় বড় কারবারী। বিনয় তাকে কারখানা দেখালো ঘুরিয়ে। মেঘনাদের বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল। হিংসায় নয়। তার কর্মহীনতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বেদনায়।

বিনয়ের ঝাড়াই মেশিন নেই। লোহার মিহি জালের উপর উপুর হ'য়ে মেয়েরা ফেঁশো চটকাচ্ছে। বিনয়ের চেয়েও বেশী দেখছে সবাই মেঘনাদকে। তাকে ভেবেছে একজন অবাঙ্গালি বাবুসাহেব। কিন্তু আশ্চর্য! সেলাম করছে রাজীবকে। এই ঝাড়াই কারখানার ইউনিয়নেরও নেতা রাজীব।

তারপর বড় গুদামঘর খোলা হল। অন্ধকার ঘর। দরজাগুলি সব খুলে দেওয়ার পর আলো দেখা দিল। একদিকে ডাঁই করা রয়েছে ফেঁশোর বস্তা। আর একদিকে নানান্‌শ্রেণীর মেশিন। জং ধরা সেলাই মেশিন থেকে পেপার প্রেসার কাটার পর্যন্ত আছে, কিছু কিছু চটকলের তাঁত আর স্পিনিংএর পার্টস্‌ও আছে। গত বছরে, কারখানার দাঙ্গার সময় একদল গুণ্ডা এগুলি লুঠ ক'রে এনে তাকে সের দরে বিক্রী করেছিল। দোষ পড়েছিল শ্রমিকদের উপর।

দরজার কাছেই তুলে এনে রাখা হয়েছে ডাইস্ মেশিনটি। মেশিনটি মানে, একটি মেশিন নয়। খণ্ড খণ্ড, টুকরো টুকরো রয়েছে। কাজের সময় জোড়া লাগিয়ে নিতে হবে। বোঝা যাচ্ছে, মেশিন সদ্য ঝাড়া পোছা করা হয়েছে। মাইল খানেক দূরে ছিল রহমতের বেকারী। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তার বেকারী উঠে যায়। মেশিনটি সে কিনেছিল, ভবিষ্যতের জন্য। ব্যবহার করা হয়নি আজো। তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল বিনয়। কত দামে কিনেছিল, সেটা রহমত ছাড়া বোধহয় আর কেউ জানে না।

আজ সেই মেশিনের খরিদ্দার হয়ে এসেছে মেঘনাদ।

বিনয় তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতে লাগল মেশিনটি। এইটি মিক্সিং এইটি মিক্সিংএর চাকা, মশলা মেখে ময়দার ড্যালা এর মধ্যেই ঢেলে দিতে হবে।

এইটি প্রেসার, এর তলা দিয়ে, কাচির ধুতির মত মিহি ময়দার পাত বেরিয়ে আসবে এই পথে। সারাদিন ধরে খালি ডলবার কোন দরকারই হবে না। ছাঁচের যন্ত্রটি আছে আলাদা। যে চওড়া রেলিংটার উপর দিয়ে যাবে ময়দার পাত, তার উপর প্রেসার দিয়ে নিমেষে নিমেষে শত শত ছাঁচ কেটে দেবে কাটার। এ মেশিন ইলেকট্রিকে চলবে। ডিজেলেও চালানো যায়। ইলেকট্রিক হিটার থাকলে, তন্দুরের দরকারই নেই।

বিস্মিত খুশীর হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মেঘনাদের সারা মুখে। একটা বোবা বন্য খুশী তার গোঁফের ফাঁকে, গালের ভাজে। যেন দূর বনপাহাড়ের কোনো ট্রাইবেল পুরুষ দেখছে সভ্যজগতের যাদুকরী কারসাজি। মেশিনের সবচেয়ে বড় চাকাটা, যেন বড় ষ্টীমারের সারেঙ্গের হাতের হুইল। তার সর্বাঙ্গ ছটফট করছে, একটু হাতের স্পর্শের জন্য। কী আশ্চর্য! কী সুন্দর! হাত দিলে যেন সারা গায়ে তড়িৎপ্রবাহ খেলে যাবে। কিন্তু লজ্জা করছে হয় তো এরা কিছু ভাববে।

তবু বড় চাকাটার গায়ে হাত দিল সে। ঠাণ্ডা, শক্ত, তবু একটি বিচিত্র শিহরণ খেলে গেল মেঘনাদের গায়ে।

বিনয়ের সেই একই ক্লান্ত উদাস গলা। বলল, 'পারিবারিক ব্যাপারে একটু ব্যস্ত আছি আমি। কেনাকাটার ব্যাপারটা কয়েকদিন বাদেই হবে, কি বলেন।'

মেঘনাদ যন্ত্রের ঘোরে আচ্ছন্ন। বলল, 'কিন্তু জমিটা—'

বিনয় বলল, 'দেখাব! আমার স্ত্রী-পুত্র সব পুরী যাবে দু' একদিনের মধ্যে। আমি একটু ব্যস্ত থাকব। তারপরেই হবে। আজকে শুক্রবার। আগামী মঙ্গলবার জমি দেখাব আপনাকে। সে আমি সব ঠিক করেই রেখেছি, আপনাকে ভাবতে হবে না। এখন রাজমিস্তিরিদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। আর পারমিটের জন্য একদিন যেতে হয় র‍্যাশন অফিসে। কবে যেতে চান?'

মেঘনাদ বলল, 'আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। যখুনি বলবেন।'

রাজীব বলে উঠল, 'মঙ্গলবারের পর।'

বিনয় তাকাল রাজীবের দিকে। রাজীব বলল, 'একসঙ্গে তো সব হবে না।'

তারপরে আবার বলল যেন বিনয়ের চাউনির জবাবে; 'একটার পর একটা করতে হবে।'

বিনয় বলল, 'সেই ভাল।'

বিদায় নিয়ে ফিরের চলল রাজীব আর মেঘনাদ। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ রাজীব বলল, 'এক মিনিট জামাইবাবু, আসছি।'

ব'লে সে ছুটে গেল বিনয়ের কাছে। বলল, 'আপনার স্ত্রী পুরী যাবেন, তাতে কি আপনি সত্যি ব্যস্ত থাকবেন বিনয়দা?'

বিনয়ের বিষণ্ণ-উদাস চোখে হঠাৎ রক্তাভা দেখা দিল। বলল, 'সেটাও তোমাকে বলতে হবে নাকি?'

রাজীবের ঠোঁটের পাশে সামান্য একটু বাঁকা হাসির আভাস। বলল, 'না, উনি মানে আপনার স্ত্রী'র যাওয়ার জন্যে যে আপনি ব্যস্ত থাকবেন, আমি বুঝতে পারিনি। এদিকে আবার দেরী হবে তো।'

বিরক্ত হয়ে বিনয় বলল, 'ওই ক'রে তুমি অনেক ক্ষতি করেছ। বাড়ির ছেলে বউ বাইরে যাবে, আর আমি এসব নিয়ে মশগুল হয়ে আছি, সে সব কি তোমার নতুন জামাইবাবুর চোখে ভাল ঠেকবে?'

নতুন জামাইবাবু অর্থে মেঘনাদ। একমুহূর্ত চুপ থেকে রাজীব বলে উঠল, 'সত্যি, ঠিক, ভুল হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থাকবেন তো?'

ঃ থাকব।

ঃ কিংস্ মিলের ইউনিয়নের সেক্রেটারী রতনসিং আসবে আজ আপনার কাছে। বোধহয় একটা কিছু গণ্ডগোলে পড়েছে।

চলে গেল সে। বিনয় বিষণ্ণ বঙ্কিম ঠোঁটে হাসল।

পূজো এল, পুজো গেল। এরমধ্যে একদিন সবাই দেখল, বিনুচৌএর গাড়িটাতে কিছু লটবহর চাপল।

এই সময়ে বিনয় দাঁড়িয়েছিল নীচের ঘরে সিঁড়ির কাছে। পাশে দাঁড়িয়েছিল গোপাল, বিনয়ের বিশ্বস্ত চাকর। সে যাবে বিনয়ের স্ত্রী, সুলতার সঙ্গে।

দিল্লী থেকে এখানে আসার পর এই প্রথম সুলতা বাংলাদেশের বাইরে যাচ্ছে! এই প্রথম অনুমতি পাওয়া গেছে বিনয়ের কাছ থেকে। সঙ্গে যাবে গোপাল, বিনয়ের প্রতিনিধি।

প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল দুই ছেলে। সিঁড়ির মাঝ পথেই থেমে গেল বিনয়কে দেখে। বিনয়ের মতই প্রায় দেখতে। একটি ন'বছরের। আর একটি সাত বছরের। হঠাৎ যেন লজ্জায় ও অস্বস্তিতে দুজনেই জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। আর একটু খোশামোদের হাসি কাঁপছে ঠোঁটের কোণে।

শান্তি নিকেতনের নিরীহ সৌম্য আবহাওয়ায় তারা মানুষ। তা' ছাড়া ছোটকাল থেকে তারা দেখেছে, মায়ের সঙ্গে বাবার কোথায় যেন একটা মস্ত ব্যবধান। সেই ব্যবধানের মধ্যে এক অজানা বিস্ময় ও ভয় ছিল মিশে। আরো ছিল, দারুন অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। বাবার কাজ ও কথাকে তারা চিনত না। এক বাড়িতে দু'রকমের দুটি মানুষ। মা আর বাবা। তাদের টান গেছে মায়ের দিকে বেশী। ভয় ধরানো থমথমানির মধ্যেও মা তাদের নিয়ে হেসেছে, গান করেছে গুন্‌গুন্ ক'রে। আর দেখেছে, মায়ের চোখে কী এক চাপা ব্যথা। মা'কে তারা চেনে, ভালবাসে। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া পুষ্ট করেছে তাদের মাতৃ-প্রেম। আর এক দুর্বোধ্য ভয় ও বিদ্বেষ দূরে সরিয়ে দিয়েছে বিনয়ের কাছ থেকে।

এবার নেমে এল সুলতা। একমুহূর্ত সেও থমকালো। তারপর ছেলেদের হাত ধরে নেমে এল তরতর ক'রে। খসা ঘোমটা দিল টেনে। বড় ছেলেটির হাত টিপতেই সে কলের পুতুলের মত ব'লে উঠল, 'বাবা, আমরা যাচ্ছি।'

বিনয় ঘাড় নাড়ল।

সুলতা ফর্সা, দোহারা। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি কিন্তু বিষণ্ণ। কপালে সিঁদুর নেই। সিঁথীতে আভাসমাত্র। হঠাৎ নজরে পড়ে না। বলল, 'যাচ্ছি।'

বিনয় বলল, 'ফিরে আসার দিনটা মনে আছে নিশ্চয়ই।'

বিষণ্ণতার মধ্যেও একটু খুশীর আমেজ ছিল সুলতার মুখে। সে আমেজটুকু কেটে গিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'আছে।'

বিনয় বলল, 'গোপাল সব সময় সঙ্গে থাকবে।'

ঠোঁটের পাশ দুটি কঠিন হয়ে উঠল সুলতার। কিছু বলল না।

বিনয় আবার বলল, 'ছেলেরা যদি চায়, তবে ওদের বোলপুর পৌঁছে দিয়ে আসতে পার।' ব'লে উদাস চোখ ফিরিয়ে নিল সে। সবাই চলে গেল। হঠাৎ খেউ খেউ শব্দে বিনয় বুঝল, গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে।

দিল্লীর কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল, ব্রাহ্ম পরিবারের সেই অংকশাস্ত্রের অধ্যাপকের বাড়ির কথা। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ নিজে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন, নতুন ইতিহাসের অধ্যাপক বিনয়কে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়ে সুলতার সঙ্গে। সুলতা তখন ইংরাজী পড়ত। বিনয়ের বাংলাটাও পাস করা ছিল। সুলতার ঝোঁক গেল বাংলাকাব্যের দিকে।

দূর প্রবাসে, সুলতার কাছে বাংলা ছিল অমৃতের মত। দূর প্রবাসের প্রেমিকের মত সেই ভাষা। শৈশবে হেসেছে খেলেছে হিন্দী ভাষায়। বড় হয়ে ইংরেজী হিন্দী বাংলার জগাখিচুড়ি দিয়ে ঝগড়া করেছে চাকরের সঙ্গে, কথা বলেছে বাপের সঙ্গে। বিনয় যখন গিয়েছিল তখন, মাতৃহীন সংসারের সে ছিল সর্বময়ী কর্ত্রী।

সুলতাদের একটা সমাজ ছিল। তার সঙ্গে বিনয়ের চাক্ষুষ দূরের কথা দূর-পরিচয়ও ছিল না একরকম। সে জানত, পবিত্রতার নামগন্ধহীন, রং মাখা এ এক কুৎসিৎ সমাজ। না হিন্দুর গরু, না মুসলমানের শুয়োর।

সুলতা যখন ঘরে থাকত, মুখে রং মাখত তখনো। ঠোঁটের রং বাসি হত না। জর্জেটের বাঁধুনি শিথিল হত না একমুহূর্ত। চাকরকে ডাকত 'বোয় ব'লে, ঝিকে 'আয়া।' বাড়িতে দিবানিশি নানান লোকের আশা যাওয়া। অধিকাংশই সুলতায় মেয়ে আর ছেলে-বন্ধু। অল্প স্বল্প নগেন্দ্রনাথের প্রবীণ বান্ধব। ছেলে মেয়ের দলে বাঙ্গালী ছাড়াও দিল্লী মারাঠা পাঞ্জাবী মাদ্রাজী সবরকমই ছিল। নানান প্রদেশের তীর্থক্ষেত্র বিশেষ।

বাপের ঘরে শাহাজাদীর মত স্থলতা। তার ঠোঁটের রং, চোখের কাজল আর জর্জেটের ঢেউয়ের একটা নেশা ছিল বিনয়ের। মনের এই নেশাটা সে করত চোরের মত লুকিয়ে। যে পরিবারে সে মানুষ, সেখানে প্রেমের চোখে চাওয়াটাই নোংরামি। তা' ছাড়া ছিল ভীরুতা। এই আভিজাত্যকে সমীহ না করুক, ভয় ছিল। স্থলতাকে প্রেমনিবেদনের সাহস তার ছিল না। প্রেম করাটা তার মাথায়ও আসেনি। তাই তার ব্যবহার ছিল শান্ত, মিষ্টি আর খানিকটা নির্বিকার। স্থলতার কাছ থেকে যেটুকু পেত, সেটুকু যেন কোন স্বৈরিণীর কাছে লুকিয়ে পাওয়া অনাচারগ্রস্থ পাকানো রসের মত। সে রস প্রেম না। স্থলতাদের দেহ ও প্রেম ব'লে কিছু নেই, এটাই তার বিশ্বাস ছিল।

ইউনিভার্সিটিতে মেয়েদের কাছাকাছি এসেছে সে। কোন মেয়েকেই সে কোনদিন ভাল চোখে দেখেনি। ভাল হয় না, এইটাই তার জানা ছিল, রক্তে ছিল অবিশ্বাস। তার মা, জ্যাঠাইমা, তার বোন বউদি'রা অন্য মানুষ। তারা ভিন্ন জগতের। তারা হিন্দুনারীর দোষে গুণে মহৎ। স্থলতাদের ঠাঁই নেই সেখানে।

সে যে ঘর ছেড়ে গেছল, তার কারণ তার বাবা। লোকটি জ্যাঠামশায়ের কাছে মার খেয়ে খেয়ে, বিরাগ ও অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়েছিল বিনয়ের মনে। জ্যাঠামশায়ের অদ্ভুত ক্ষমতাটাই তাকে উদ্দীপ্ত ও কৌতূহলিত করেছে। লজ্জায় ও ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেনি, জেঠু, তুমি বাবাকে কি ক'রে ঠকাচ্ছ? জ্যাঠামশাই এদিকে দিনরাত্রি ব্লাডপ্রেসারে আর পেটের ব্যায়রামে কাতরাত। লোকের সঙ্গে মিষ্টি হেসে কথা বলত। সেই লোকটাই কি ক'রে বাবাকে পাগল করছিল!

বড় হয়ে বাবার জন্য তার কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু জ্যাঠামশায়কে সে উপযুক্ত নায়ক মনে করেছিল। বুঝেছিল, এরকম না হলে মানুষ কিছু করতে পারে না বোধহয়। বাবা ভুল করেছে, সে নিজে অন্তত আর এভাবে বোকা হবে না।

এই রকম মন নিয়ে দু'বার পাস করেছে সে। আশ্চর্য? পাস করাটা তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। সারাজীবন পড়লে, সারা জীবনই পাস করতে পারত।

কিন্তু অর্থের প্রয়োজনে ঘর ছেড়েছিল সে। বাইরে এসেছিল পূর্ব অভিজ্ঞতার সজাগ মন নিয়ে, পা টিপে টিপে। পা টিপে টিপে এসেছিল সহৃদয় নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে। তার প্রবাস জীবনকে স্নেহ-সিক্ত করতে চেয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ। সুলতাও চেয়েছিল।

সেই প্রথম বিনয়ের একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। দুষ্পাচ্য খাবার, কিন্তু খেতে ভাল। সুলতার ঠোঁটের রং কদর্য সমাজ-চরিত্রের লক্ষণ, কিন্তু দেখতে ভাল লাগে। নেশাটা রক্তের মধ্যে ধরে গেছল। সোঁদা মাটির টানে কেঁচোর মত বুকে হেঁটে হেঁটে এগুচ্ছিল সে।

সুলতারা দেখছিল এক স্বল্পবাক্, শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান বাঙালি যুবক। চোখে তার স্বপ্ন, প্রবাসের বিষন্নতা। সুলতা বাংলা শিখতে চেয়েছিল আর তার একলা জীবনে দিতে চেয়েছিল মিষ্টি সাহচর্য।

সত্যি, অনেকে ঘিরেছিল সুলতাকে। তার মধ্যে প্রথম হয়ে উঠেছিল বিনয়। শেষ পর্যন্ত, বিনয়ের রাত্রে খাওয়াটাও সারতে হত সুলতাদের বাড়িতেই। বাংলা রান্না খাওয়ার জন্য, সব সময়েই সুলতার কোনো না কোনো ভিন্নদেশের বন্ধুরও থাকত নিমন্ত্রণ।

বিনয় জানত, এ খাওয়ানো মানে সুলতার রংএর আসর জমিয়ে রাখার কারুমিতি। যখন যাকে ভাল লাগে, তাকেই খাওয়ায়। সুলতার ছেলেবন্ধুদের নেশাটার আরো গূঢ় কারণ বুঝেছিল সে। বুঝেছিল, ওরা সুলতার সবরকমেরই সঙ্গী।

কিন্তু আশ্চর্য! হিংসে হত তার। তার একলা ঘরের অন্ধকারে ছটফট করত। যেদিন রাত্রে সুলতা অন্য কোন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বিনয়কে পৌছে দিয়ে যেত, তার বুকের মধ্যে একটি অসহায় ক্রুদ্ধ সত্তা নিঃশব্দে চীৎকার করত। আর ভাবত, যে বন্ধুর সঙ্গে সুলতা ফিরে গেছে, হয়তো এতক্ষণ বক্ষলগ্ন হয়েছে তার।

কেন না ওদের সমাজে যে সবই চলে। ভাবতে ভাবতে অসহ্য যন্ত্রনায় তাকে মাথায় জল ঢালতে হত।

শুধু জানত না, ফিরে যাওয়ার পথে দিল্লীর ঘুমন্ত প্রাস াদের আনাচে কানাচে আটকা পড়ে থাকত স্থলতার দীর্ঘশ্বাস। স্থলতা নির্বাক উদাস বিষন্ন স্বভাব বিনয়কে ততদিনে ভালবেসেছিল।

স্থলতা ভাবে ভঙ্গিতে সম্মতি দিয়েইছিল। প্রস্তাব করেছিলেন নগেন্দ্র। কেন না, বিনয়ের পক্ষে প্রস্তাব করা সম্ভব নয়, এইটাই অনুমান করেছিলেন। হঠাৎ পাংশু মুখে চুপ করে গেছল বিনয়। বিয়ে! স্থলতাকে! কয়েকদিন সময় নিয়ে শুধু ভেবেছিল। ভাবার কোন দরকার ছিল না। জীবনে সেই প্রথম আগুন লেগেছিল তার রক্তে। প্রতিটি শোণিতবিন্দু স্থলতাকে কামনা করছিল।

তা' ছাড়া, সেই প্রথম মনে হয়েছিল, সে তার জেঠুর মত একটা কাজ করতে যাচ্ছে। অঙ্কশাস্ত্রের হেড্ অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট নগেন্দ্রনাথের সারাজীবনের সঞ্চিত টাকাটা তো পাবে সে-ই।

স্থলতাদের সমাজ সংসার মানুষ, সবই পাপ। বিনয় জানত, সে পাপের দুর্নিবার আকর্ষণ রোধ করতে পারছে না। বাড়ির ঠিকানা, পিতৃ-পরিচয়, সবই দিয়েছিল সে নগেন্দ্রনাথের কাছে। দিয়ে বলেছিল, ওই বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক সে ভবিষ্যতে রাখবে না। আর, তারাও দেবেনা সম্মতি এ বিয়েতে।

সেদিক থেকে সংস্কারমুক্ত ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। বিশ্বাসও করতেন বিনয়কে।

বিয়ের পর আলাদা বাসা করেছিল বিনয় স্থলতাকে নিয়ে। গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত দ্বিগুন জ্বালা চেপেছিল বিনয়ের মনে। সে দেখছিল, স্থলতার বিয়ে হয়েছে বটে, সঙ্গীরা তাকে ছাড়েনি। সেও ছাড়েনি সঙ্গীদের। তাদের যাওয়া আসা একই রকম চলছিল। খাওয়া দাওয়া আড্ডা, সবই ঠিক ছিল। বদল হয়েছিল শুধু বাড়িটা।

স্থলতার তখন প্রথম সন্তান হয়েছে। বিনয়ের বিষণ্ণ উদাস চোখের দিকে

তাকিয়ে একদিন সে অদ্ভুতভাবে আবিষ্কার করেছিল, তার বন্ধুদের, বিনয়েরই ছাত্রদের এ বাড়িতে আসা সে পছন্দ করে না।

মনে মনে কষ্ট পেয়েছিল সুলতা। এরা সকলেই প্রায় তার শৈশবের সঙ্গী। বলেছিল, 'কেন বলতো ?'

বিনয় বলেছিল, 'এখন তো আমিই আছি।'

সেই জীবনে প্রথম সুলতার রং মাখা ঠোঁট ফ্যাকাসে হয়ে গেছল। বিনয়ের কথার আসল অর্থ বুঝতে তার একটুও অসুবিধা হয়নি।

তারপর দিনে দিনে বিনয়ের রূপটা খুলেছিল আস্তে আস্তে। ঠিক বিনয়ের মত করেই। সুলতার প্রতি তার আসল ধারনা, আসল বাসনা ফুটেছিল তার একই বিষণ্ণ চোখে, অল্প শান্ত কথায়।

তখন দ্বিতীয় দফার আসন্ন প্রসবা সুলতা।

কিন্তু সুলতা, চোখের জল না ফেলে, বিনয়ের এ বিশ্রী গোঁড়ামিটা ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল তার প্রেমের উচ্ছ্বাসে হেসে। ভেবেছিল, ওর পারিপার্শ্বিকের ঠুলিটা দেবে ফুটো ক'রে। বাইরে যেত, ডেকে আনত বন্ধু-বান্ধবীদের, বেশী করে আলাপ করিয়ে দিত বিনয়ের সঙ্গে।

বিনয় বুঝেছিল বিপরীত। ভেবেছিল, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। একই কথা ভেবেছিল সুলতাও।

সে নির্বাক হয়ে, বিমর্ষ চোখে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল। বেরুতে না দেওয়া আর কাউকে না আসতে দেওয়ার (কাউকে অবশ্য বিনয় নিজের মুখে আসতে বারণ করেনি, সেসবই সুলতার দায়।) অপমানকর ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছিল অনেক। সেই সঙ্গে, নিরালায় পেয়েও কম অপমান করেনি সুলতাকে।

সুলতা চমকে চমকে উঠেছিল বিস্ময়ে, ব্যথায়। তারপরে ভয়ে ও ঘৃণায়। কিছুদিন পরেই তার দ্বিতীয় সন্তান হয়েছিল।

কথাটা চাপা থাকেনি। ফলে, আস্তে আস্তে, বন্ধুবান্ধবদের কান থেকে কথাটা গিয়ে পৌছেছিল কলেজের ছেলেদেরও কানে। বিনয় যে শুধু তরুণদের কাছে অপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল তা' নয়, কলেজে ছেলেরা লেগে গেছল বিনয়ের

পেছনে। পেছনে লাগার ব্যাপারটা এমনই হল, কলেজের গভর্ণিংবডি বিনয়কে কাজে ইস্তফা দিতে বললেন। নগেন্দ্রনাথ অসহ্য ব্যথায় চুপ করে ছিলেন একেবারে।

বিনয় বুঝেছিল, এটা একটা প্যাঁচ্। সারা দিল্লীটা-ই সুলতার ঠোঁটের আশায় ছিল। আর বুড়ো বেহ্মজ্ঞানী নগেন্দ্রনাথ খেলছিল নিশ্চয়ই কড়া অঙ্কের প্যাঁচ।

সুলতা, বিনয় ও বাবাকে ছাড়া সবাইকে অভিসম্পাত দিয়েছিল তখন। সে জানত, সবাই মিলে বিষিয়ে তুলেছে তার জীবনটা।

অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়েছিল বিনয়। তার সমস্ত রাগ ও ঘৃণা এসে জড়ো হয়েছিল সুলতার উপর। বড় বড় দুটি আরক্ত চোখে, আশ্চর্য শান্ত গলায় কোন অপমান করতে সে বাকী রাখেনি সুলতাকে।

সুলতাদের সমাজে, আচারে বিচারে ও শিক্ষায়, এর প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সুলতা ধৈর্য ধরে ছিল, বিনয়কে সে ভালবেসেছিল।

সেই সময়টা যুদ্ধের ঘটা পেকে উঠেছে। তেতাল্লিশের উপোসী বাংলার উপর সারা ভারতের ব্যবসায়ীদের নজর। একদিকে ক্ষুধা, আর একদিকে বোমার ভয়ে জুজুবুড়ি কলকাতা। বেকার বিনয় একটু বেকায়দা বোধ করছিল। সেই সময় জুটেছিল এসে উধমসিং। বাড়ি আগ্রায়। কলেজে চাকরী করত লাইব্রেরীয়ানের। আসলে সে ছিল ইন্‌টেলিজেন্ট্ ব্রাঞ্চের লোক। কাজ ছিল ছাত্রদের উপর নজর রাখা আর রিপোর্ট করা। তার সমবেদনা এসে পড়েছিল বিনয়ের উপর।

সে প্রথমেই খোঁজ করেছিল, বিনয়ের টাকা আছে কি পরিমাণ। কিছু ছিল। একলা মানুষ, বাড়িতে টাকা পাঠাবার দায়িত্ব সে মনেও রাখেনি। বাপের মৃত্যুসংবাদে, কোনরকমে হবিষ্যটা করেছিল থান প'রে। ছাত্র অবস্থায় পয়সার জন্য কোন ব্যাকুলতা ছিল না। কর্মজীবনে পয়সাটা চিনে ফেলেছিল আশ্চর্য-রকম ভাবে! সুতরাং কিছু হাতে ছিল।

উধম এসে বলেছিল, এক ওয়াগণ মাল এসেছে কানপুর থেকে। যার

নামে এসেছে, সে টাকাটা দিতে পারছে না। হাজার তিনেক টাকা লাগবে। যদি বিনয় নিতে পারে সেটা, কাজ হবে।

মালটা কি? নতুন পুরনোর মেশানো কিছু যন্ত্রপাতি আর নাট্ এবং বোলট্স আছে। লাভ? সেটা উধম পরে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

মালটা নিয়ে খালাস ক'রে পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশে। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিনয় দেখেছিল, পুঁজি তার দ্বিগুণের বেশী হয়ে গেছে।

উধম বুঝিয়েছিল, যে মালগুলি আসছে, ওগুলি কারখানারই পুরনো মাল। যে পাঠায়, সে কিছু নতুনও পুরে দেয় এবং যে দরে দেয়, সেটা দিল্লীর দর। আবার বাংলাদেশে ফিরে গেলেই দরটা যায় চড়ে। চড়েও সাংঘাতিক রকম। বিশেষ ক'রে কলকাতার বাজারে তখন লোহালক্কড় সোনা হয়ে গেছে।

এ ঘটনার পর অধ্যাপক জীবনের প্রতি করুণ অবহেলা ভ'রে তাকিয়েছিল। সে স্বাদ পেয়েছিল অনেক বড় জিনিসের। তার বাবা শুধু কেঁদেই মরেছিল। জ্যাঠামশাই ছাড়া সেদিন বুঝি আর কেউ ছিল না তাকে বাহ্‌বা দেওয়ার। উধমসিংকে পারেনি সে ছাড়তে। যেচে তাকে দিয়েছিল টাকা।

উধম তাকে মাত্র আঙ্গুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়েছিল। তারপরে চিনিয়ে দিয়েছিল অলিগলি। জমে উঠেছিল ব্যবসা।

ওদিকে টের পাচ্ছিল, সুলতা সংযোগ রেখে চলেছে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে। চাকরগুলিকে বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না।

প্রতিমুহূর্তে দেখছিল পাপের কারসাজি চলেছে যেন বাড়িটার দেয়ালে দেয়ালে। এমন কি, বিনয় একথাও ভাবত, সুলতার ছেলে কার! ভাবে ভঙ্গিতে সেটা জিজ্ঞেসও করত সুলতাকে।

অল্পদিনের মধ্যেই, উধমের সাহায্যে পাড়ি দিয়েছিল সে বাংলায়। সুলতা আশা করেছিল, দিল্লীর পাপ থেকে বিনয় নিজে মুক্ত হয়েছে। এবার খোলা মনে তার সঙ্গে সংসার পাতবে।

কিন্তু আশ্চর্য! কোন নড়চড়ই হয়নি। আজন্মের দিল্লী ছেড়ে সে এসে বন্দিনী হয়েছিল চব্বিশপরগণার দূর উত্তরের ধোঁয়া ধূসরিত মফস্বল শহরে।

বিনয় তার একটি কথা রেখেছিল। ছেলে দুটিকে সরিয়ে দিয়েছিল এ বাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে।

রং? সে শুধু ঠোঁটে কেন। মন থেকেই তো তার দাগ উঠে গেছল কবে। বিনয় এখনো ভাবে, সুলতার রং মেখে রং করা ঘুচিয়ে দিয়েছে সে চিরদিনের জন্য।

অনেকদিন বাদে দিল্লীর কথা ভাবতে ভাবতে ডুবে গেল বিনয়। আজো তার সেই উদাস চোখ। কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটি তৃপ্তির হাসি চমকাচ্ছে।

রাঁধুনি ঠাকুরটি একটু গিন্নী গিন্নী ভাবের। সে ভাবল, বাবুর আজ মন কাঁদছে বউ-ছেলে ছেড়ে। তাই অত ভাবনা। তাই একসময়ে এসে বলল, 'বাবু, অত ভেবে আর মন খারাপ করে কি হবে। নেয়ে খেয়ে নেবেন চলুন।'

বিনয় এক মুহূর্ত অবাক হয়ে হেসে বলল, 'ঠিক বলেছিস্ চল্।'

উপরে এসে, হঠাৎ কি মনে করে সুলতার ঘরে গেল। এ ঘরে সে মাসে একবারও ঢোকে কিনা সন্দেহ।

মনে পড়ল, এখানে এসে সুলতার সঙ্গে তার সব সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

সুলতা তাকে ঢুকতে দেয়নি এ ঘরে। সুলতার সেই মূর্তি অদ্ভুত! লোক জানাজানি অনর্থ করতেও পেছপা ছিল না।

বিনয় বুঝেছিল, সব রং হারিয়ে আজ সুলতা ক্ষিপ্ত। ঠিক আছে। হঠাৎ ঘন ঘন, সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে পাঠাতে লাগল সে ললিত মজুদার কম্পাউণ্ডারকে। কম্পাউণ্ডারের বড় মেয়েটা জেনে নিল বিনয়ের কাছে, তাদের স্বামী-স্ত্রীতে নিদারুণ বিচ্ছেদ। দরিদ্র মেয়েটা, বিনয়কে করুণা করতে গিয়ে ডুবল। দিনে দিনে ডুবল সুলতারই চোখের সামনে। বিনয় ভাবছিল, দিল্লীর শোধ নিচ্ছে কষে।

তারপর ডাঃ সীতানাথের স্ত্রী। একই বাপার। সুলতার উশর শোধ নিতে

গিয়ে একটা যুক্তিও খাড়া করেছিল সে। নতুন নতুন প্রেমের লোভটাও দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। ডাক্তারের স্ত্রী তার উদাস ক্লান্তজীবনে বন্ধুর মত এসেছিল। দাম্পত্য জীবনের কোথায় তার কিছু ফাঁক ছিল। সেই ফাঁকের মাঝখান দিয়ে বিনয় দাঁড়িয়েছিল সামনে। তারপর পালিয়েছে।

বালবিধবা উগ্রক্ষত্রিয়দের মেয়ে মুক্ত এসেছিল অন্যভাবে। বেচারীর বন্ধকী জমিটুকু হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে টাকা চেয়েছিল বিনয়ের কাছে। বন্ধক ছিল চারু স্যাকরার কাছে। বিনয় টাকা দিয়েছিল। মুক্ত নিজেই সামলাতে পারেনি। ভালো মানুষ ভালো মানুষ ক'রে এলিয়ে পড়ল এমন, দেখল, শেষে জমিটা-ই বিনয়ের দখলে। ওই জমিটা চারু স্যাকরার কাছে পাঁচ বছর আগে বাঁধা দিয়ে মুক্ত তার স্বামীকে রোগমুক্ত করতে চেয়েছিল।

বিনয়ও অবাক হয়েছিল। ব্যাপারটা সে মোটেই ভেবে করেনি। বরং প'ড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা জমিটা যতদিন সে নেয়নি, তার অস্বস্তি হচ্ছিল। তার নানান কাজে কর্মে মনে পড়ত সব সময়। তারপর যখন নিয়ে নিল, তখন সব অস্বস্তির অবসান হয়ে গেল।

বিনয় জানালা দিয়ে তাকাল দক্ষিনের আকাশে। রাস্তায় ভিড় লেগেছে। মিষ্টি মিষ্টি রোদে ভরে গেছে দিনটা। বাড়িটা একেবারে নিঝুম। অবশ্য নিঝুমই ছিল চিরদিন।

চোখের সামনে ভাসতে লাগল মেঘনাদের স্ত্রী লীলাকে। কম্পাউণ্ডারের মেয়ে। ডাক্তারের স্ত্রী সুধা, মুক্ত এমন কি সুলতা, কাউকে দিয়ে হঠাৎ তুলনা করা যায় না লীলার। কালোরূপের এত আগুন আর দেখেনি সে। যে আগুন লেলিহান শিখার মত হাসির ছটায় পুড়িয়ে দিতে চায়। কী সাহস! প্রাণ চাইলে হয়তো মাঝ গঙ্গায় নৌকা ডুবিয়ে বিনয়কে মেরে মরতেও পারত।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে ফিরল সে খাটের দিকে। শূন্য বিছানা, সাজানো গোছানো। দরজার দিকে ফিরে দেখল রাঁধুনী ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে।

বেচারী! গিন্নীমন্ত ঠাকুর। সে ভাবছে, আহা। বাবু বেচারীর কী ব্যথা! থাকতে যাকে মনে লাগেনি, আজ তার জন্যে এ খালি ঘরে মনটা হু হু করছে।

একথা আজ সে কাকে বলবে। তোলা রইল, মা এলে বলবে। সে তো পরের কথা। উল্টে নিজের বাম্‌নীর কথাটাই মনে পড়ে যাচ্ছে।

পূজো গেল। কোজাগরী পূর্ণিমা পড়ে গেল কার্তিক মাসে। আকাশে রং লেগেছে হেমন্তের। শরতের সোনায় পাক ধরে যাওয়া কেমন যেন গোলাপী আভা লেগে গেছে রোদে। হালকা বাতাস বইছে মাঝে মাঝে উত্তর থেকে। হিমালয়ের বাতাস, হেমন্তে পূর্বাভাষ দিচ্ছে শীতের।

মেঘনাদ বেরুবার জন্য অপেক্ষা করছে। রাজীব আসবে। লীলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুয়ে দেখছে। তিলি আর সুকুমারি গেছে গঙ্গায় স্নান করতে। নকুড় বসে আছে বড় ঘরে। ষোড়শী একলাই রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। লীলা শুয়ে শুয়ে দেখছে মেঘনাদকে। দেখছে সিরাজদিঘার সেই পাগলা বাতাস ছুটে এসেছে এখানে। মেঘনাদ মত্ত হয়ে উঠেছে। আপন মনে হাসছে, ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে। চলতে ফিরতে হঠাৎ কখনো আদরও করছে লীলাকে। এমন কি হাঁক ডাকও শুরু করেছে সিরাজদিঘার মতই। লীলা বুঝতে পারে, এসব কিছুর মধ্যেই এক নতুন আনন্দ, নতুন স্ফূর্তি আছে। এক নতুন উত্তম ও নতুন প্রেরণার বশে সে দিবানিশি আচ্ছন্ন।

লীলা যে ঠিক, পদে পদে মেঘনাদের পরাজয় নিরাশা আর গ্লানি চেয়েছে, তা' নয়। তবু, মেঘনাদের এই আশার উচ্ছ্বাস, আনন্দ কেন যেন তার রক্তে কেবলি জ্বালা ধরায়।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিন্‌চৌএর করুন চোখ দুটি। কী ব্যাকুলতা সেই চোখে। তেমনি ক'রে মেঘনাদ একদিন ফিরে তাকায়নি তার দিকে। বিন্‌চৌও ছোট কারবারী নয় কিন্তু পুরুষ হিসাবে মেঘনাদ আর সে কত তফাৎ। বিন্‌চৌ চাইতে পারে, টানতে পারে, ডাকতে পারে। একটু পাওয়ার জন্য লুটিয়ে পড়তে পারে পায়ে।

আর মেঘনাদ। কাজ ও উত্তোগের এক বিশাল যন্ত্র। ফাঁক পেলে, প্রেমের ভারে চটকে দলা পাকিয়ে দিয়ে যায়। তা' ছাড়াও তিলির কাছে,

এ বাড়ির মেয়েদের কাছে, বিন্‌চৌএর সম্পর্কে অদ্ভুত গল্প শুনেছে সে। শুনেছে, বিন্‌চৌ নাকি তার বউয়ের সঙ্গে কথা বলে না, বেরোয় না। তাদের মুখ দেখাদেখি নেই। বিন্‌চৌএর বাড়ির ঠাকুর চাকরের কাছেই নাকি তারা শুনেছে। কি একটা আছে, কে জানে। বড় আশ্চর্য! আগুরিদের মুক্তই তো বলেছে, বিন্‌চৌএর বিবির সঙ্গে নাকি বিন্‌চৌএর বিয়েই হয়নি। দিল্লী থেকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছে। সে বিবি এখন বিন্‌চৌকে তার ঘরেই ঢুকতে দেয় না।

তবে সবাই বলেছে, দেখতে কিন্তু বেশ।

কত বেশ! বেশ! মনসার রক্তে রক্তে বিষ বিস্তার হয়েছে। লীলা তার কালো রূপের কথা জানে না। যৌবনের স্পর্দ্ধা তার বড় বেশী। আর, রক্তে রক্তে তার কৌতূহল বিন্‌চৌএর জন্য। সেই তো সেই চোখ, ভিক্ষুকের প্রাণঢালা সরলতা। ভয়-ই বা কিসের।

লীলা শুনেছে, বিন্‌চৌএর বউ বাইরে গেছে। ঠোঁটের কোন্ কুঁকড়ে ওঠে লীলার। মনে হয়, বিন্‌চৌএর ঢুলু ঢুলু চোখ যেন তার দিকে তাকিয়ে বলছে, তোমারি জন্যে, তোমারি জন্যে।

মেঘনাদের দিকে তাকাল সে। সম্বিত নেই যেন মানুষটির। দাঁড়িয়ে আছে সোজা। সারামুখে ভাবনা ভরা। চুলগুলি অনেক বড় হয়েছে। সিংহ কেশরের মত পাকিয়ে পাকিয়ে পড়েছে ঘাড়ে। লাউডগার মত এসে পড়েছে কপালের দিকে। গোঁফজোড়ার শেষাংশ ঢেউ খেলে গেছে পাকিয়ে। যেন যাত্রার দলের রাজা।

হঠাৎ লীলা কাৎ হয়ে, জামা ধরে টানল তাকে। একটু জোরেই টেনেছে। মেঘনাদ সরে এসে, তাকাল তার দিকে। স্থির দৃষ্টি লীলার।

'কি ভাবছ?'

মেঘনাদ বলল গভীর চিন্তিত স্বরে, 'বিপিনদা'র চিঠি কেন এল না, তাই ভাবছি।'

লীলা অবাক হয়নি। মনটা মিটিয়ে গেল। বলল, 'বোধ হয় মরে

গেছে।' মরে গেছে? মেঘনাদ বিস্মিত ব্যথায় চমকে উঠল। বলল, 'কেন, মরবে কেন?'

লীলা হেসে উঠল, 'তোমার জন্য কেউ মরতেও পারবে না নাকি?'

মেঘনাদ বলল, 'বিপিনদা ম'রে যাবে, একথা ভাবতে পারিনে মহাজন-গিন্নি।'

মহাজন-গিন্নী! ওই নামে কারখানার সবাই ডাকত। মেঘনাদও আদর করে ডাকত ওই নামে।

লীলার ঠোঁট বেঁকেই উঠল। বলল, 'তা' হলে বাজারের সেই বেশ্যেটা নিয়ে এখন কর্তার ভিটেয় সুখে আছে। আর জবাব দিতে মন চাইছে না।'

এমন সময় নকুড়ের ডাক ভেসে এল, 'বাবাজী এস। রাজীবঠাকুর এসেছেন।'

মেঘনাদ উঠে পড়ল। বালিশের তলা থেকে, ঠোঙ্গায় পোরা একরাশ টাকা বার ক'রে পকেটে নিল। লীলা বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

লীলার কথায় মনটা খারাপ হয়ে উঠছিল মেঘনাদের। নতুন দিনের ডাক এসে পড়ল। মন খারাপ করতে পারল না। বলল, 'আজ যে মেশিন কিনব।'

বেরিয়ে গেল সে। সেইদিকে তাকিয়ে অবশ হয়ে পড়ে রইল লীলা। হঠাৎ বিন্‌চৌ, রাজীব, সকলের উপরেই বিদ্বেষের একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল তার মনে।

রাজীব বলল, 'বিনয়দা'র কারখানায় যেতে হবে।'

মেঘনাদও তাই চাইছিল। যন্ত্রটি আবার দেখে আসা হবে। আপাতত যন্ত্রটি বিনয়ের কাছেই থাকবে। মেঘনাদের ঘর উঠলে আনা হবে। তা' ছাড়া রাখবার জায়গা কোথায়।

নকুড় বলল, 'একটু আস্তে যেতে হবে কিন্তু। আমিও যাব।'

রাজীবের ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠল। দেখল মেঘনাদের মুখের দিকে। মেঘনাদ খুশী হয়ে বলল, 'যাবেন বৈকি! চলুন, আস্তেই যাব।'

নকুড় চলতে চলতে আপন মনেই বলল, 'যেতে হয়, বুঝলে বাবা! আজ বড় আনন্দের দিন কি না। তোমার বাবা থাকলে—'

কথাটা শেষ হল না। মনে মনে বলল, আর কি সুযোগ আছে কিছু। আর কি সময় আছে। আশা আছে! কী যে মরীচিকা। কিছুতেই চুপচাপ বসে থাকা যায় না।

বিনয় প্রস্তুত হয়েছিল। আরো দুজন লোক ছিল তার অফিসে। টাকাটা গুণে দিল রাজীব বিনয়ের সামনে। স্ট্যাম্পকাগজে সই ক'রে দিল দুজনেই। সাক্ষী হিসাবে সই করল নকুড় আর রাজীব।

তারপর আবার যন্ত্রটি দেখতে গিয়ে মনটা ভরে উঠল মেঘনাদের। তবু বুকটার মধ্যে খচ্ খচ্ করতে লাগল। তারই জিনিস, কিন্তু জায়গার অভাবে নিয়ে যেতে পারবে না।

নকুড় বলল, 'তা' হলে একবার বাড়ি গিয়ে ঝুমি ওদের পাঠিয়ে দিতে হয়।'

মেঘনাদ বলল, 'কেন?'

: কেন কি বাবা! তুমি সা' ঘরের সন্তান। কারবারের যন্তর। তেল সিঁদুর দিয়ে, ঘরের লক্ষ্মীকে নমো হয়ে বরণ করতে হবে তাকে।'

ব্যবসার মধ্যে লৌকিক আচারটা কোনদিনই রপ্ত করতে পারেনি মেঘনা আপত্তি করল না সে। কেন-ই বা করবে। বলল, 'বেশ তো। আপনি তা' হলে বলুনগে ওদের, ওরা আসুক।'

: তাই যাই।

লাঠি ঠুক্ ঠুক্ ক'রে চলল নকুড়। তার মনে প্রাণে যেন হঠাৎ নতুন বল এসেছে। মনে মনে ভাবছে, চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে না। থাকতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। থাকতে থাকতে মিশে যাবে কাজে। কাজের মধ্যে থাকলে তার কি কোন প্রতিদান সে পাবে না। কোন নতুন রাস্তাই কি খুলবে না চোখের সামনে!

মেঘনাদের মনের পালে বাতাস লেগে গেছে। সত্যি, আজ তার বাবা বেঁচে থাকলে কি করত! তার সেই ছেলে মেঘু, আজ মেশিন কিনল। অনন্তীর ঘাটে শেষ বিদায় দিয়ে আর তো দেখা হয়নি বাবার সঙ্গে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রাজীব আর বিনয় চোখাচোখি করতে লাগল। কারখানার মেয়েরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখছে এদিকে তাকিয়ে। কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তাদের সর্দার নাগাই চীৎকার ক'রে হুকুম দিচ্ছে, হাত চালাও মাগীলোগ্, হাত চালাও, হাত চালাও।

চটকলের লরী এসে পড়ল ফেঁসো নিয়ে। বিনয় গেল দেখতে।

আধঘণ্টা পরেই এল সবাই। সকলের আগে তিলি, তারপরে লীলা। সুকুমারি লীলার সঙ্গে আবার ভাব হয়েছে সুকুমারির। তবে একটি ফাঁক যেন কোথায় থেকেই গেছে।

ব্যাপার দেখে কাজ প্রায় বন্ধ হয় কারখানার। নাগাই চীৎকার করেই চলেছে।

তিলির হাতে পেতলের রেকাবী। রেকাবীতে ধান দুর্বা সিঁদুর পান শুপারী। পেতলের ছোট একটি ঘটে জল। ব্রত নয়, পূজো নয়, এ শুধু বরণ।

লীলার প্রথম চোখ পড়ল বিনয়ের উপর। দাঁড়িয়েছিল লরীর পাশে। চোখাচোখি হতেই, বিনয় ঢুলু ঢুলু চোখে হেসে বিচিত্র ভাবে ঘাড় নোয়াল। লীলা রাণীর মত সোজা যেতে যেতে তাকাল চোখের কোণ্ দিয়ে। ভ্রূ কাঁপাল, হাসল ঠোঁট টিপে।

পাশ থেকে তিলি শুধু বলে উঠল চাপা গলায়, দেখিস্, একেবারে লটকে পড়িস্‌নে।'

লীলা বলল, পড়বই তো।

মেঘনাদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। তার খুশি দেখে লীলার ঠোঁট কুঁকড়ে উঠল।

মেঘনাদ বলল, 'এস যন্ত্র দেখবে।'

তিলি বলে উঠল, বউটিকে ডেকে তো দেখাচ্ছ। তা' বরণের কথা কি একবারও মনে পড়েনি কাল? কথা নেই বার্তা নেই উপশান্তর গিয়ে সব হাজির।

সুকুমারি ঘোমটা টেনে বলল, 'ওসব কি ওর মনে রাখার কথা। ঘরের মেয়ে বউরাই সে-খবর রাখে।

রাজীব দেখছিল তিলিকে। মাঝে মাঝে লীলাকে, লীলার দিক থেকে দূরে বিনয়কে আর সামনে মেঘনাদকে দেখছে। কিন্তু তিলির সঙ্গেই চোখাচোখি করতে চাইছে।

তিলি তা' জানে। সদ্য গঙ্গা স্নান করে এসেছে সে। চুল এলানো। ধোয়া জামা পরা। সে জানে, রাজীব তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু একবারও তাকাতে ইচ্ছে করছে না।

সবাই এল গুদামঘরে। মেঘনাদ যন্ত্র দেখাল। সুকুমারি অবাক হয়ে বলল, 'ঝুমি, চান করিস্‌নি সকালে ?'

লীলা ঘাড় নাড়ল। সুকুমারি হতাশ হ'য়ে বলল, তা' হলে ? কাপড় ছেড়েছিস্ সকালে।

লীলা বলল, ভ্রূ কুঁচকে, তা' ছেড়েছি। কিন্তু কেন ?,

সুকুমারি বলল, ও মা! বরণ তো তুই-ই করবি।

লীলা চকিতে একবার রাজীবকে দেখে অবজ্ঞাভরে ফিরে তাকাল মেঘনাদের দিকে। মেঘনাদ তার দিকেই তাকিয়েছিল।

রাজীব হেসে বলল, 'অভাবে নিয়ম নাস্তি। হয়ে যাক এই ভাবেই। গঙ্গা জল ছিটিয়ে একটু শুদ্ধ করে নেওয়া যাক।'

সুকুমারি আর একবার ঘোমটা টেনে ফোগলা দাঁতে সলজ্জ হেসে বলল, 'তা বটে। বামুন রয়েছে কাছে। দে ঠুমি, রেকাবী দে ঝুমির হাতে।'

লীলা আবার ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মেঘনাদের দিকে। ভাবখানা, এসবও আমাকে দিয়ে ?

রেকাবী নিল সে হাতে। সুকুমারি বলল, গায়ে তেল সিঁদুর দে, ধান-দূর্বা, পান শুপোরী দে, গঙ্গাজল দে। বল্, 'আমার ঘরে তুমি ধন-দৌলত দাও, লক্ষ্মী ছিরি দাও, সুখ শান্তি পুত্র কন্যা দাও। তোমাকে আমি বরণ করে ঘরে তুললাম। যেন জন্ম জন্ম তুলতে পারি।'

ললা মন্ত্রের মত বলে গেল মনে মনে। তেল সিঁদুর ধান-দূর্বা দিল। সুকুমারি বলল, 'গলবস্ত্র হয়ে পেন্নাম কর।'

লীলা হেসে উঠে তাই করল। সুকুমারি লু লু ক'রে উলু দিয়ে উঠল।

মেঘনাদের মনে হল, কিসের একটা তীব্র স্রোত কল্‌কল্‌ করে তার বুকের থেকে ফেটে বেরিয়ে আসছে চোখ দিয়ে।

মনে মনে বলল, 'জন্মে জন্মে নয়, যেন এ জন্মেই, অনেক, অনেক যন্ত্র তুলতে পারি। একসঙ্গে মিলে সেই যন্ত্র উচ্চরোলে মাতিয়ে তুলবে শহর।

কারখানার মেয়েরা কাজ করবে কি! তাদের সর্দার নাগাইও অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখছে।

বিনয় এসে সামনে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণ। সুকুমারি বলল, 'ঝুমি, এনারা বামুন। পেন্নাম কর, আশীর্বাদ চা।'

লীলার চোখের চকিত বিদ্যুৎ খেলে গেল বিনয়ের মুখে। এক মুহূর্তের জন্য বিনয়ের মন এলোমেলো হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য এ সমস্ত পরিবেশ তার বুকের এক অন্ধ গুহায় খোঁচা দিল। সে বলতে চাইল, থাক্ থাক্। পারল না।

লীলা তাকে প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। অপ্রতিভভাবে শুধু হাসল বিনয়। সে সোজাসুজি তাকাতে পারল না লীলার মুখের দিকে।

তারপর রাজীবের আপত্তি থাকা সত্তেও প্রণাম নিতে হল।

একে একে তিলি সুকুমারিও প্রণাম করল। ব্রাহ্মণ নমস্য। কিন্তু অবাক হল সুকুমারি মেঘনাদকে দেখে। সে শুধু হা ক'রে দেখছে। সা' বংশের ছেলে। এমন দিনে ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিচ্ছে না! নকুড় হলে এতক্ষণে ব্রাহ্মণের পায়ে গড়াগড়ি দিত।

সুকুমারি না ব'লে পারল না। এমন দিনে নইলে পাপ হবে যে! বলল, 'বাবা মেঘু, তুমিও এনাদের আশীর্বাদ চাও বাবা। নিজের গাঁয়ে ভিটায় হ'লে আজ সারাগাঁয়ের বামুনকে ঘুরে ঘুরে পেন্নাম করতে হত।'

সম্বিৎ ফিরে পেল যেন মেঘু। কিন্তু কই, সিরাজদিঘার সুরুর দিনে তো

কাউকে সে প্রণাম করেনি ঘুরে ঘুরে। হয়তো, লালমিঞার সাকরেদ ছিল ব'লে। শাশুড়ির কথা রক্ষার্থে এগিয়ে এল সে।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য! বিশাল দেহ কুঞ্চিৎ কেশ মেঘনাদ যেন সার্কাসের শিক্ষিত সিংহের মত এগিয়ে এল। আর বিনয়ও রাজীবের মুখ দুটো আড়ষ্ট হাসিতে অন্ধকার। দুই ব্রাহ্মণ পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে, প্রায় লাফিয়ে উঠল, আরে না না, ছি ছি···

উবু হওয়া আর হল না। প্রণাম হল আধখ্যাচড়া। চীৎকার শোনা গেল বিজয়ের। সেও এসে পড়েছে ততক্ষণে। বোধ হয় কারখানা থেকে বাড়ি গিয়েই সোজা এসেছে।

সকলের ব্যস্ততার ফাঁকে রাজীব বলল তিলিকে, "ব্রাহ্মণের দক্ষিণাটা পাওয়ানা রইল।

তিলির চোখে সেই একই মিঠে বিদ্রূপের হাসি। যে হাসিতে প্রতিপক্ষের লাগে আমেজ।

মেঘনাদ তখন বিজয়কে মেশিন দেখাতে ব্যস্ত। বিজয় খুঁটিয়ে দেখল। একজন ওস্তাদ মিস্তিরের মত ঝুঁকে পড়ল সে মেশিনের উপর। মিক্সিংএর গোল হ্যাণ্ডেল ধরে ঘোরাতেই কয়েক পাউণ্ড ওজনের পাথরের দুটি চাকা পরস্পর দুদিকে ঘুরে গেল। বিজয় বুঝে নিল, ওর চাপেই ময়দা ঠাসা হয়। কিন্তু একসঙ্গে সাজানো থাকা সত্ত্বেও পাশের মেশিনটি অনড়। তারপর···এটা··· এটাকে কি যেন বলে? হ্যাঁ রোলিং, তারপরে এটা ফেন্‌সিং,···

সুকুমারি তাকিয়ে দেখছে তাদের দিকে।

লীলা এদিকে আর বিনয়কে, দুদিকেই দেখছে। বিনয় হঠাৎ বলল, একদিন মেঘনাদ বাবুর সঙ্গে আসুন না আমাদের বাড়িতে।' লীলার সব কিছুতেই, একটু চোখমুখ ঘোরানো অভ্যাস। বলল, একলা-ই না হয় যাব।

বিনয় অস্ফুটে বলল, বেশ তো।

তারপর তার চোখ পড়ল নাগাইয়ের উপর। চোখাচোখি হতেই নাগাই হাঁক দিল, খাটকে খাও মাগীলোগ্‌।'

সবাই চমকে উঠল।

সকলে পূবপাড়ার ভিতর দিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল; মেঘনাদ চলল দক্ষিণ দিকে।

বিজয় বলল, চললে কোথায় এত বেলায়?

মেঘনাদ বলল, তোমরা যাও, আমি একটু ইদ্রিসের কাছে যাব। আমার তন্দুর তৈরী করবে কে, তাই ভাবছি।

সুকমারি বলল, এত বেলায়?

লীলা বলল, এত বেলায় আর কি। সারাদিনে ফেরে তবে তো?

মেঘনাদ চলে গেল। বিজয় বলল লীলাকে, জানিস্ দিদি, বোনাই বড় কড়া মানুষ। কাজে ফাঁকি পাবে না।

লীলা বলল, ঢেঁকির মত। স্বর্গে গেলেও ধান ভানবে তোর বোনাই।

এতক্ষণ উনুনের ধারে বসে ষোড়শীর মুখ অভিমানে থম্‌থম্ করছে। বুঝি ঠোঁটও ফুলছে। ষোড়শী বুঝি মানুষ নয়। তার কাছে বুঝি একদণ্ড একলা থাকতে নেই বিজয়ের।

মেঘনাদ ততক্ষণে মুসলমান হোটেলে এসে উঠেছে। তার নামটি এখন সর্বত্র প্রচারিত। সে বেকারী খুলতে যাচ্ছে, জানে সবাই। তাকে চিনেছে সকলে। খাতির বেড়েছে। হোটেলের মালিক ডেকে বসাল। এ সময়টা হোটেলে শ্রমিকদের খাওয়ার ভিড়। ইদ্রিস তার তন্দুর ছেড়ে নড়তে পারছে না। তন্দূরের চাপাটি গরম গরম ছেঁকে না দিলে খেতে চায় না কেউ।

তবু, অল্পক্ষণ পরেই ইদ্রিস এল তার কাছে। চিবুকের দাড়িতে ঘাম নিংড়ে বলল, কি খবর বাবু?

মেঘনাদ বলল, ইদ্রিস! মেশিন তো কিনে ফেললাম। আজকালের মধ্যেই জমি দেখে, আমার কারখানা তুলব। দু'একমাস লেগে যাবে তাতে। কিন্তু আমার তন্দুর বানাবে কে?

তন্দুর। খামচি দিয়ে ইদ্রিস ধরল তার দাড়ি। ভাববার কথা। বলল, বাবু, এই সারা পশ্চিমবাংলা মুলুকে তন্দুর বানাবার মিস্তিরি নেই আর।

মেঘনাদের চোখের বদলে গোঁফজোড়া-ই বড় হয়ে উঠল। তবে? ঘোড়া নেই, চাবুক কিনে বসে আছে সে। মেশিনের কারখানা হলে দেশী তন্দুরের দরকার হত না। কিন্তু সারাদেশের বেকারী তো এখনো দেশী তন্দুরেই চলছে।

মেঘনাদ বলল, বলছ কি মিঞা! এদেশে তন্দুর বানাবার লোক নেই? তা'হলে ব্যবসা হবে কি ক'রে?

ইদ্রিস বলল, নেই কি ক'রে বলি, আছে। মাত্তর এট্টা বংশ আছে। বদ্ধোমানের জলিলসেখ্ জানত। নিজের ব্যাটা আর ভাইটাকে শিখিয়ে গেছে। সেই খুড়ো-ভাইপো ছাড়া সারা দেশে আর তন্দুরের মিস্তিরি নেইকো। কলকাতা-ই বলেন আর ইদিকের শহরের কথা-ই বলেন। সব বড় বড় তন্দুর ওরা খুড়ো ভাইপো'তে করেছে।

'মেঘনাদ জানে, ঢাকাতেও তন্দুরের মিস্তিরির বড় অভাব। ঢাকা বরিশাল আর চাটগাঁয়, তিন জায়গায় আছে অল্প দু'একজন ক'রে। কিন্তু এখন চিঠি লিখে তাদের এখানে আনাতে, অনেক কাঠখড় পোড়াবার ব্যাপার। বলল, ইদ্রিস্ তাদের কোথায় পাব?

ইদ্রিস বলল, গাঁয়ের নামটা তো ভুলে গেছি বাবু। বদ্ধোমানের দু'একটা আগের ইষ্টিশান হল মেমারি। মেমারি থেকে কোশ দুই আড়াই হবে জলিলসেখের ঘর। শুনেছিলাম, তারা আবার পাকিস্থানে চলে যাবে। গেল কিনা এতদিন, কে জানে।'

মেঘনাদ : পাকিস্থানে কেন যাবে তারা?

ইদ্রিসের চোখে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। বলল, বাবু কেন যাবে, সেকথা এই দিনকালকে পুছ্ করেন। যেমন দিনকাল হয়েছে, তেমন তো হবে।

মেঘনাদ এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইল। বলল, তবু একবার দেখতে হবে মিঞা। নইলে আমার সব আয়োজন যে ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

মেঘনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল ইদ্রিস। তারপর হঠাৎ বলল, বাবু, আপনি যাবেন?

: কোথায়?

: মেমারি ?

: এদেশ কোনদিন দেখিনি, চিনিনে। বল তো যেতে পারি। একটু ভাল করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাও।

ইদ্রিস আবার চুপ ক'রে রইল। বলল, বাবু এবার আবাদ ভাল হয় নাই, ব্যাটার চিঠি এসেছে কাল। তা' আমার একটা ব্যাটাকে আপনার কারখানায় নেবেন তো ?

মেঘনাদ একটু অবাক হল ইদ্রিসের কথা শুনে। সেই সত্যি করিয়ে, ইদ্রিস্ তাকে তন্দুর-মিস্তিরির ঠিকানা বলবে নাকি। বলল, মিঞা কারখানা হ'লে তোমার ছেলেই তো আগে আসবে। এক ব্যাটা কেন ? তোমার দুই ব্যাটা আর তুমি, তোমাদের তিন বাপ-ব্যাটাকেই আমি চাই।'

শোহন্ আল্লা। গোঁফহীন উপর ঠোঁট তুলে, দাড়ি কাঁপিয়ে হেসে বলল ইদ্রিস, 'আপনাকে দিয়ে কসম খাওয়াচ্ছিনে বাবু। গোসা করবেন না ; তা'হলে নিজেই একবার যেতাম আপনার সঙ্গে। মেমারির পথে একবার বাড়ি হয়ে আসতাম। তবে আপনাকে যেতে হবে তন্দুর-মিস্তিরের বাড়ি। আমার কথায় যদি না আসে।'

মেঘনাদের গোঁফজোড়া হাসিতে খাড়া হয়ে উঠল। বলল, যাব বৈকি, নিশ্চয় যাব। কবে যাবে ?

: পরশুকে চলেন।

: পরশু আমার জমি রেজেষ্টারি হবে।

: তবে এতোয়ারটা বাদ দিয়ে, সোমবার লাগাৎ চলেন।

: সেই ভাল। কদিন লাগবে ?

: একদিনে হয়। দুদিনেই ভাল হয়। একটা রাত্রি গরীবের ঘরে কাটাবেন।

: তিন রাত কাটাবার আমার সময় নেই। নইলে তাই কাটাতাম গো ইদ্রিস মিঞা।

হাসতে হাসতে চলে গেল মেঘনাদ।

জমি দেখা হল তার পরদিনই। একটু উত্তরে, বড় রাস্তার উপরেই পশ্চিম-দিকে, জমিটা ছিল বিধবা মুক্তর। বন্ধকী থেকে হয়েছিল বিনয়ের মৌরসী। জমিটার আশেপাশে দু'তিন ঘর আগুরির বাস আছে এখনো। আরো উত্তরে কিছু বস্তি, কয়েকটা দোকানপাট, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা।

দক্ষিণে জংলা পুকুর, তারপর পাড়া ; পূবদিকেও পাড়া, সামনের দিকে নানান শ্রেণীর দোকান।

বিনয় যখন জমি দেখাচ্ছে বিজয় মিস্তিরির বোনাইকে, দূরের শজনেতলা থেকে দাঁড়িয়ে দেখল মুক্ত। একটি কথাও বলল না। তার মা অবলা ফুঁসে উঠতে চাইল। মুক্ত দিল না। করে রাড়ি ঘুসকি বলে তাকে সবাই। সে ঘুসকি কি না কে জানে। কিন্তু বিন্‌চৌ তার সব লজ্জা-ই লুটে নিয়েছে। তবু, খারাপ মেয়েমানুষ হ'য়েও তার লজ্জা হল কিছু বলতে। শুধু দেখল সে নীরবে। আর দেখল অবাক হয়ে, বিজয় মিস্তিরিয় বোনাইকে।

জমি মাপজোক হল। খুঁটি পোতা হল। প্রায় সোয়াবিঘা জমি আছে। জমি দেখা হল সকালে। দরাদরি হবে বিকালে।

নকুড় বলল মেঘনাদকে, বল তো আমি একবার মিস্তির মশাইদের জিজ্ঞেস ক'রে আসি, জমির দর কি রকম যাচ্ছে। ওঁরা তো মেলাই জমি বিক্রী করছেন।

বিনয়ের উপর কোন সংশয় ছিল না মেঘনাদের। তবু বলল, ,দখতে পারেন। দোষ কি আছে।

নকুড় লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে বাইরে এল। প্রথমে এল অমর্তের মুদী দোকানে। অমর্ত শ্বশুরের মত খাতির ক'রে বসাল তাকে। নকুড় বলল, 'নতুন মানুষ জামাই ; বললে, বাবা একবার জমির দামটা কি রকম যাচ্ছে, জেনে আসুন কোথাও। তাই বেরিয়েছি।'

অমর্ত বলল অন্য কথা।

বিনয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলল না। বলল, 'জামাই কাছে থাকতে থাকতে ছোট মেয়েটার বে দিয়ে দিন না?' ব'লে ছানি পড়ারমত ভ্রূ কুঁচকে তাকালে সে।

নকুড় বলল, 'সে তো জামাই দিয়ে দেবে বলেছে। আমাকেও বলছিল একটা মুদীখানা করে বসতে।'

অমর্তের বুকে কেটে কেটে বসল বুড়োর কথাগুলি। মেয়েটাকে বিয়ে দেবে। আবার মুদিখানা করবে! জিজ্ঞেস করল, মুদীখানা কোন্ পাড়ায় হবে?'

নকুড় বুঝল, অমর্ত নিজের কথা ভাবছে। যদি এ পাড়ায় হয়, তবে তার মুশকিল। বলল, হলে, বাজারের দিকেই হবে। তবে, এই বুড়ো বয়সে, বুঝতেই তো পারছ অমর্ত...

নকুড়ের বুকের মধ্যে কনকনিয়ে উঠল। বিদায় নিয়ে বাইরে এসে, আবার রাস্তা ধরল। মিত্তির বাড়ির বড় ছেলের সঙ্গে কথা বলে বুঝল, বড় রাস্তার উপরে কম ক'রে প্রতি কাঠা পাঁচশো টাকার কম হবে না। অনেকদিনের চেনা মানুষ মিত্তিরেরা। খবরও রাখে সব। বড় ছেলে নকুড়কে বলল, আপনার জামাই তো জমি কিনবে শুনছি চৌধুরির কাছ থেকে। একটু দেখে-শুনে কিনতে বলবেন। মুক্ত ছুঁড়ির জমিটা তো পাঁচশো টাকায় ফুঁসলে নিয়ে নিল।

নকুড় ফেরার পথে দেখল, সে মাঠের রাস্তায় এসেছে। হেমন্তের হলেও রোদ বেশ কড়া লাগছে। ঘাম ঝরছে। কিন্তু মাঠের পথে কেন। বুকটা ধুক ধুক করছে মেঘনাদের। বড় ভয় করছে; যাব না যাব না ক'রে বিনয়ের কারখানায় এসে পড়ল। কিন্তু কেন? কি বলবে সে বিনয়কে।

বলবে নাকি, মিত্তিরদের কাছে এই এই শুনে এলাম। জামাই আমাকে জমির দর জানতে পাঠিয়েছে। তা' যদি আমাকে জমির টাকা কিছু দাও...তবে...

সেই মূহূর্তে বিনয় বেরিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বলল, কি খবর?

নকুড় ততোধিক বিস্মিত হাঁফ ধরা গলায় বলল, অ্যাঁ? ও! কি কাণ্ড দেখুন। কোথায় যাব, কোথায় এসেছি। ভুল ক'রে এসে পড়েছি। হেঁ হেঁ......

ফিরে চলল সে। বিনয়ের ঠোঁটের কোণটা কুঁকড়ে উঠল। বলে উঠল, 'দরকার হলেই যেন আসা হয়। আমি কিছু মনে করব না।'

: আঁজ্ঞে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আসব। আসব!

বলতে বলতে গলাটা ধ'রে এল নকুড়ের; কোঁচকানো গাল বেয়ে জল ঝরে পড়ল। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বুড়োর ঘাম ঝরছে সারা মুখে, পড়ছে টপ্ টপ্ ক'রে।

তবু, বিনয় অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

বিকলিবেলা মেঘনাদ এল বিনয়ের বাড়ি। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিমর্ষ হ'য়ে উঠেছে সে। জমির সম্ভাব্য দামের কথা শুনে সে থম্‌কে গেছে। তার মধ্যে সেই মানুষটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। যে মানুষ আবেগে চলতে চলতে, হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়ে ভাটার বেলায়। ঝিমিয়ে পড়ে, শঙ্কিত হয়। নাবির মুখে, তলে তলিয়ে যাবে বুঝি। নাবির মুখে, মোহনার ঢেউ সমারোহ বড় বেশী। সেখানে ধাপে ধাপে ওঠার কোন রাস্তা নেই।

মেঘনাদ ছোট, বড় ছোট। আজ সব দিক থেকে এইটি বড় যন্ত্রণা। চারদিকে সবই বিপুল, বিশাল, বিরাট আয়োজন। মেঘনাদ সেখানে কত তুচ্ছ, কত ছোট। যেন একটি বড় চাকে, একটি মৌমাছির মত। ছোট হওয়ার অনেক লজ্জা, অনেক ব্যথা। এখানে ছোট করে ভাবতে পারে না। এখানে অনেক বড় শুরু, তারপর আরো বড়, তারো চেয়ে বড়। আর বর্ষাকালের পিঁপড়ের মত মাটিতে বুক ঠেকিয়ে ধীরগতিতে চলেছে মেঘনাদ। পিঁপড়ের অভিজান, সে তো শুধু মাত্র শীতের সঞ্চয়। কিন্তু সওদাগরের অভিজান, সে তো কোন ঋতুর সীমা মানে না। ছোট, মেঘনাদ বড় ছোট। কেমন ক'রে তাল মিলিয়ে ছুটবে সে আজ এখানে।

বিনয় ছিল বাইরের ঘরেই। হেসে অভ্যর্থনা করল মেঘনাদকে। বসতে দিল চেয়ারে। মেঘনাদ হাসতে চেষ্টা করল। সারা মুখে দুশ্চিন্তা। গোঁফের ফাঁকে হতাশা ও লজ্জায় মেশা অদ্ভুত হাসি। বিনয়ের কাছে সে ভিক্ষে করতে

আসেনি। হার স্বীকার করতে এসেছে। চেয়ারে বসতে তার কত কুণ্ঠা ছিল। কিন্তু সে কুণ্ঠার কথা মনেও নেই এখন। নিঃশব্দে বসল শোফায়।

বিনয় অপলক তীক্ষ্ণ চোখে দেখল মেঘনাদকে।

তার কারখানার আফিস ঘরের সঙ্গে, এখানকার কোন মিল নেই। এখানে দেয়ালে দেয়ালে কামিনী রায় আর রতনলালের পেণ্টিং। রবীন্দ্রনাথের মস্তবড় ছবি

বিনয় বলল, কি ব্যাপার, আপনাকে এত ভার ভার দেখছি যে! কিছু হয়েছে নাকি?

মেঘনাদের শিরদাঁড়ায় মোচড় লেগেছে। সে যেন নত হয়ে পড়ছে। মুখে তার অসহায় করুণ ভাব। বলল, 'ভার? ভার নয়, বোধ হয় একেবারেই পাত্‌লা হয়ে যাবে এবার।'

ব'লে, এক মুহূর্ত নীরব রইল। বিনয়ও চুপ। সে মেঘনাদের মুখ থেকেই কিছু শুনতে চাইছে। মেঘনাদ আবার বলল, 'জমিটা আমার পছন্দ হয়েছে। দামের বিষয়টা আপনার সঙ্গে একটু—'

: হ্যা, নিশ্চয়ই, আমি তো সেইজন্যেই বসে রয়েছি।'

বিনয়ের টানা টানা চোখে দুষ্টামির ঝিকিমিকি। কাগজ টেনে, কলম নিয়ে লিখতে লিখতে, না তাকিয়েই বলল, 'আপনি হয় তো জানেন. রাস্তার ধারের জমি, খুব কম করেও পাঁচশো টাকার কমে কাঠা পাওয়া যাবেনা। অবশ্য জমির দাম আরো বাড়বে, খুব শীগ্‌গিরই বাড়বে। যে রেটে পূর্ববঙ্গ থেকে আসতে আরম্ভ করেছে মনে হয় না আর এক ছিটে জমিও পড়ে থাকবে। সে যাক্‌গে, পাঁচশো টাকা কাঠা হ'লে, সোয়াবিঘার দাম কত হয় মেঘনাদবাবু।'

কত হয়? তা' কি জানে না বিনয়। বিনয়ের গলায় কোথাও কি বিদ্রূপের আভাস রয়েছে! না কি নিষ্ঠুর উপহাসে মেঘনাদকে, ভাসিয়ে দিতে চাইছে। বুকের রক্তে নাগের বিষ যেন পড়ছে টপ্‌টপ্‌ ক'রে। সোয়াবিঘার দাম কত হয়, সেটাও কি কষতে পারবে না মেঘনাদ। শুধু হিসাব কষা কেন; মেঘনাদ কি সেই দামেই জমি নিতে পারে না। পারে।

পারে, কিন্তু সঞ্চয়ের থলিটায় এত বড় একটা থাবা ফেলবার জন্য প্রস্তুত হয়নি তার মন। তবু বলল, সাড়ে বারো হাজার টাকা দাম হয়।

বিনয় হেসে উঠে বলল, 'আশ্চর্যরকম সস্তা। অবশ্য আপনার পক্ষে বলছিনে। কোন সাহেব কোম্পানী সাড়ে বারো হাজার টাকায় কারখানার সোয়া বিঘা জমির দাম শুনলে দশ হাত লোহা ঢুকিয়ে দেখত সেই জমিতে, নীচে পুকুর আছে কিনা। নইলে অত সস্তা কেন? কলকাতায় লোকে বসতবাড়ি করে দশ হাজার টাকায় এক কাঠা কিনে। আর মফস্বলে এখনো জলের দর।

জলের দর। সত্যি হয় তো জলের দর। কিন্তু মেঘনাদের কাছে, তা যেন জলহীন মরুভূমির বুকে, প্রাণের বিনিময়ে তৃষ্ণার এক ফোঁটা জলের দাম।

বিনয় আবার বলল, অবশ্য এর থেকে অনেক অল্প দামের জমি আপনাকে আমি দেখাতে পারি। কিন্তু, মেঘনাদবাবু আপনার একটা ভবিষ্যৎ আছে। তা' ছাড়া, বেশী ভেতরে হলে, পাইকেরদের নজর এড়িয়ে যাবে, খুচরো ব্যবসায়ীরা যেতে চাইবে না। ভেতরে ঢুকে যাওয়ার অনেক সমস্যা।

তারপরে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বলল, 'আপনার সঙ্গতি কেমন, তা তো আমি জানিনে। তবে, আমার মনে হয়, সাড়ে বারো হাজার টাকা জমির পেছনে ব্যয় করা আপনার পক্ষে এই সময়ে বোধ হয় একটু অসুবিধে হবে।

মেঘনাদ একটু করুণভাবে হাসল। হাসিটুকু বোধ হয় তার অসুবিধা স্বীকারের হাসি। পরমুহূর্ত্তেই মেঘনাদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। গোঁফের ফাঁকে একটি অদ্ভুত দৃঢ় রেখা উঠল ফুটে। বলল, হ্যাঁ, অসুবিধা তো আছেই। আমার সবই খুব সামান্য। বুঝতেই তো পারছেন। আমরা বিলান্ দেশের মানুষ, জমির বিষয় আমরা মাথায় হাত দিয়ে কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু আমি যা করতে যাচ্ছি, তা শুরু করতে গেলে এ দেশে আমাকে পেছুলে তো চলবে না।

বিনয়ের স্বরে তরলতা, সুর অন্তরঙ্গ। বলল, কিন্তু আপনি এত বিমর্ষ কেন? জমির জন্যে বুঝি! বুঝতে পারছি, ওই জমিটাই আপনার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। আমিও সেইজন্যেই ওটা আপনাকে দেখিয়েছি।

বলতে বলতে সেও হঠাৎ গম্ভীর হল। বলল, 'যত দাম-ই হোক্, আমি আপনাকে ওইখানেই কারখানায় ভিত্ গাড়তে বলব। ফ্যাক্টরীর প্রেস্টিজ্ চাই। সামনেই একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী রয়েছে আর একটি নতুন কারখানা করবার কথা শোনা যাচ্ছে কাছে পিঠে। মেঘনাদবাবু—যেন অনেকগুলি ওয়ার্নিং বেলের পর, হঠাৎ ফাইনাল ঘণ্টা বেজে উঠল বিনয়ের গলায়। মেঘনাদ বলল, বলেন।

বিনয় বলল, 'আমিও ব্যবসা করি। আমিও আপনার মত বড় হতে চাই। আপনাকে আমি যা তা বলতে পারব না। সাড়ে বারো হাজার আমি চাইব না আপনার কাছ থেকে।

মেঘনাদের দুচোখ নিঃশব্দ উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, কত, কত?

বিনয়ের চোখের সামনে মুক্তর মুখখানি ভেসে উঠছে। কাঁদো কাঁদো করুন অবলা মুখ নয়। ভয় ভয়, শ্রদ্ধামাখা গোপন প্রেমের নেশা লাগা মুক্তর দুটি চোখ। মুক্তর পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত, সব দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যবতী মুক্ত, পুষ্ট, উন্নত! স্বামীর শোকটা যেন দেহ ও মন থেকে ঝেড়ে ফেলে, মুক্ত হতে চেয়েছিল। আর মুক্ত হতে চেয়েছিল, চারু শ্যাকরার পাঁচশো টাকা বিনয়ের কাছ থেকে নিয়ে। আজ বিনয়ও মুক্ত হতে যাচ্ছে। বিনয় বলল, আপনি আমাকে দশ হাজার টাকা দেবেন মেঘনাদবাবু। বাকী আড়াই হাজার টাকা আপনার অন্য কাজে লাগবে, সেটা আপনাকে আমি বলছি। আর সেই আড়াই হাজার টাকাই দেবে আপনাকে আসল জিনিষ।

গানের ওস্তাদ যেন দ্রুত লয়ে গেয়ে চলেছে। আর উৎসুক সাকরেদের মত মেঘনাদ বিনয়ের প্রতিটি কথা শোনবার বোঝবার চেষ্টা করছে। আসল জিনিষ আড়াই হাজার টাকায়। সেটা আবার কি!

বিজয় বলল, 'আপনি রাজী মেঘনাদবাবু।'

একটু ধীরে। শত হলেও মেঘনাদ ধলেশ্বরী তীরের মহাজন। সব কথা সহজে বোঝে না। বলল, কিসের রাজী!

ঃ জমির ব্যাপারে!

: নিশ্চয়। আমি তো বললাম আপনাকে, আমি পেছুব না। কিন্তু আসল জিনিষ কি বলছেন আপনি, আমি বুঝতে পারছি না।

বিনয়ের গলায় একটু উত্তেজনার ধার ফুটে ছিল। চোখে মুখেও ছিল সেই আভাস। যেন এই মাত্র ঘোড়দৌড়ের মাঠে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, হঠাৎ নিরুত্তেজ শান্ত হয়ে গেছে। বলল, বল্‌ছি।

রাস্তায় রাস্তায় একটা গণ্ডগোল শোনা যাচ্ছে। ছুটি হয়েছে, কিন্তু শুধু ছুটির গণ্ডগোল নয়। আরো কিছু, যেন পথে পথে কিসের জটলা চলছে।

বেলা ছোট হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নামছে এর মধ্যেই। বিনয় বলল, দেখুন, যতদূর জানি, বাংলা দেশের গভর্ণমেণ্ট বোধ হয়, এ দেশে বিস্কুট ম্যানুফ্যাক্চারিং বন্ধ করে দেবে। অর্থাৎ বাংলা দেশে। বোধ হয় নয়, দেবেই বন্ধ ক'রে দু'এক মাসের মধ্যে। সুতরাং পারমিটটা আমাদের আদায় করতে হবে দিল্লী থেকেই। আপনাকে আমি সেণ্ট্রালের পারমিটের কথা এই জন্যে আগেই বলে রেখেছিলাম। আমি দরখাস্তের সব রকম ফর্মই এনে রেখেছি, আপনি সই করে দেবেন।

ড্রয়ার থেকে কয়েকটি ফর্ম বের করল সে। কিন্তু আসল কথা বলা হয়নি তখনো। বরং অন্য কথা জিজ্ঞেস করল সে, আপনি নিজে দিল্লী যেতে পারবেন তো?

দিল্লী! মেঘনাদ অবাক হয়ে বলল, 'দিল্লী কোথায় যাব?'

বিনয় আশ্বস্ত করার সুরে বলল, 'আপনাকে একলা যেতে বলছিনে। সঙ্গে রাজীবও যাবে। নিশ্চয়ই বোঝেন, এরকম হাজার হাজার ফর্ম সই হয়ে, কলকাতার ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের পারমিট অফিসে পড়ে আছে। পড়ে আছে, ধুলো পড়ছে, নষ্ট হচ্ছে, শত শত রিমাইণ্ডার পড়ছে। কিছুই হচ্ছে না। নিয়ম মাফিক দরখাস্ত আমরাও করব। কিন্তু, দরখাস্তে বোবা কথা বলে না। নিজেদের কাউকে দিল্লীতে যেতে হবে, আর···আর···

হেসে উঠল বিনয়। বলল, 'আর বোবাকে কথা বলাবার জন্য কিছু টোটকা টুটকিও করতে হবে।'

মেঘনাদ কিছুটা বিস্মিত, বেয়াকুফ, হয়েছিল এতক্ষণ। শুধু শুনছিল, একটার পর একটা কথা। নতুন নতুন তার মানে। এবার গোঁফজোড়া নড়ে উঠল ঈষৎ। হাসি ফুটল মুখে, কিছুটা শ্লেষ বাঁকা হাসি। বলল, 'টোটকা আর কি! টোট্‌কা একমাত্র টাকার বাজনা বাজাতে হবে কানের কাছে।'

বিনয় হাসল। দৃষ্টির তলে তলে তার বিস্ময়। অদ্ভুত বুদ্ধিদীপ্ত তীব্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনে হচ্ছে মেঘনাদকে। এরকম কথাও কি বলতে পারে নাকি সে।

পারে, মার খাওয়া মানুষ পারে। ঢাকা শহরের দুই জন কেরানীকে সে হাজার টাকা দিয়েছিল জল খেতে। ঘটনার ধাপে ধাপে সেই কথাই মনে পড়ে গেছে তার। পারমিট নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করতে হবে, ঢাকা না গিয়ে যেতে হবে দিল্লীতে। তারপর…তারপর তো বোবাকে কথা বলানোর কাজ ছাড়া আর কিছু নেই। তা'হলেই সব আসবে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে আগেই। সুতরাং বলতে পারবে না কেন এমন কথা। তবে, সেটা ঢাকা, এটা কলকাতাও নয়, একেবারে দিল্লী। দিল্লীর বোবারা কততে কথা বলে কে জানে।

বিনয় বলল, দিল্লী আর কলকাতা, দু, জায়গাতেই কিছু দিতে হবে। অবশ্য দেওয়ার বন্দোবস্ত আমিই করব। এইটিই আপনার আসল কাজ বলছিলাম। আড়াই হাজার টাকা—

মেঘনাদ বলে উঠল, তা'হলে আপনাকে আমার একটি কথা রাখতে হবে। আড়াই হাজার টাকা আমি দেব সেজন্য। কিন্তু, ওই সোয়াবিঘা জমি থেকে পাঁচ কাঠা আপনি আলাদা করে ঘিরে রাখেন। বিক্রী ক'রে দেন আর কাউকে। এতগুলো টাকার ক্ষতি কেন করবেন আপনি আমার জন্যে।

যদিও বোঝা যায় না ওপর থেকে, তবু সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে বিনয়ের চোখে। মেঘনাদকে অন্যরকম লাগছে। করুণ অসহায় ছায়াটুকু সরে গেছে মেঘনাদের মুখ থেকে। এখন যেন কিছুটা ঝাঁজের আভাস।

সত্যি, জ্বলছে মেঘনাদের বুকের মধ্যে। যত জ্বলছে, তত সংশয় পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে মনের মধ্যে। দৃঢ় হচ্ছে মন। ভাবছে, কেন সে ভুলে গেছল, সে সব ছেড়ে এসেছে। এসেছে রাজধানী, মহারাজধানীর পাল্লায়। সব দিতে হবে, সর্বস্ব। অনেক ঘুষ দিতে হবে সব কিছুর জন্য। আর কি রকম আশ্চর্য শান্ত গলায় প্রতিটি কথা বলছে বিনয়। বিনয় যত শান্ত, তত অশান্ত তার হৃদয়। কেন, কেন এত অশান্ত হচ্ছে সে। কি লাভ তাতে। সে ছোট, অনেক ছোট। কিন্তু তাতে ভেঙ্গে পড়ে কি হবে। করুণ হয়ে লাভ কি, বিনয়ের পাঁচ কাঠা জমি বিনামূল্যে নিয়ে, যদি কুড়ি কাঠার দাম দেওয়া যায়।

বিনয় লালমিঞা নয়। তবু ব্যবসায়ীর দরদে পাঁচ কাঠাও দিতে চেয়েছে। ব্যবসায়ী হ'য়ে সে কেন ব্যবসার মর্যাদা নষ্ট করে।

বিনয় হঠাৎ অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে মাথায় হাত ঘষল। তারপর বলল বিষন্ন গলায়, মেঘনাদবাবু, পাঁচ কাঠা জমিটাই বড় হল। বন্ধু না হতে পারি, সামান্য চেনাশোনার জন্যেও কি এটুকু আমি করতে পারিনে। মেঘনাদবাবু, আপনি যদি ওই পাঁচ কাঠা অলাদা করেন, আমি খুব দুঃখ পাব।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিমের দরজা জানালা দিয়ে গাঢ় রক্তাভা এসে পড়েছে সরল রেখায়। হেমন্তর ঝক্‌ঝকে তীব্রতা সেই রংএ।

মেঘনাদের মনটা ভরে উঠল। একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেওয়ার মত বিনয়ের কথাগুলি। বিনয়ের সব কথাই এমনি শান্ত। ব্যবসার কথা, দুঃখের কথা, কোন কথার স্বরে নেই ওঠা নামা।

মেঘনাদ নিজেই লজ্জিত হ'য়ে উঠল। সে বলল, না না, আপনি কেন দুঃখ পাবেন; আমি আপনার ক্ষতির কথা বলছিলাম। আপনি যদি কিছু দেন, সে তো আমার সৌভাগ্য।

বিনয় বলল, সৌভাগ্য নয়, আমারই ভাগ্য, নিজের ক্ষতি না করেও আপনার সামান্য উপকার লাগল।

বিনয় হাসল শান্তভাবে। শান্ত, অথচ দ্রুত, আকাশের রং বদল হ'য়ে

যাচ্ছে। রাস্তার মানুষের, চোখ নাক মুখ হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ছায়া ছায়া হয়ে উঠছে। ঘনিয়ে আসছে আকাশটা। আরো লাল হচ্ছে, কালচে লাল, কালকের আরো আগের জমানো, গতদিনের রক্তের মত।

মেঘনাদ বলল, 'আড়াই হাজার টাকায় ওদিকটা হবে তো ?'

বিনয় বলল, 'ওই টোটকা ? হবে বৈকি। আর আপনি যদি যান দিল্লী—'

মেঘনাদ বলল, 'আমি যেতে পারব না। যেতেও চাই না। এ কাজ রাজীববাবু একলা পারবেন না ?'

ঃ তা' পারবে। কাজ তো কিছু নয়, শুধু দিল্লী যাওয়ার কষ্টটুকু ছাড়া। আমি চিঠি দিয়ে দেব। সেইটি নিয়ে দিতে হবে গিয়ে। বরং রাজীব একলা গেলে আপনার কিছু খরচা কমই হবে।

মেঘনাদ বলল, 'সে-ই ভাল। রাজীব বাবুই যান। আমাকে আবার দু'এক দিনের মধ্যেই একবার বর্ধমান যেতে হবে তন্দুর মিস্তিরির জন্য। এখন থেকে তাদের বায়না দিয়ে না রাখলে, সময়মত পাওয়া যাবে না।'

রাস্তায় চীৎকার চেঁচামেচি চলেছে। কিছুটা উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কে একজন চীৎকার ক'রে উঠল, 'হারগিস্ নহি চলেগা। বিনা খানা মে কারখানা নহি চল্ সকতা।'

কারখানা নহি চল্ সকতা! বিনয়ের কানের মধ্যে কথাটি আটকা পড়া মাছির মত ফর্‌ফর্ করতে লাগল।

হঠাৎ, কিসের জটলা শুরু হল চারদিকে। অস্বস্তি দেখা দিচ্ছে তার মুখে, অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছে। তবু, ফর্ম এগিয়ে দিল মেঘনাদের দিকে।

ইংরেজী লেখা ফর্ম। কালো কালো অক্ষরের কতগুলি অজানা কথা। মেঘনাদ বোঝে না। তার অতবড় মুখটি ভরে উঠল ছেলেমানুষের বিস্ময়ে, কৌতূহলে। এ বেদনা বয়স্ক মানুষের।

বিনয় ফাইণ্টেনপেন দিল তার হাতে। জায়গা দেখিয়ে দিল সই করবার। একটু অবিশ্বাস কিংবা সংশয় হল না তার মনে। গুটি চারেক সই করল মেঘনাদ, বাংলায়, আঁকাবাঁকা অক্ষরে, শ্রীমেঘনাদ দাশ।

বিনয় বলল, 'তা'হলে জমি রেজিস্টারি কালকেই করবেন ?'

মেঘনাদ বলল, 'তা' ছাড়া আর তো সময় নেই।'

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ। জমির কাজটা মিটে গেলেই, রাজীবকেও পাঠিয়ে দেওয়া যাক দু'একদিনের মধ্যেই।'

পরদিন, শনিবারেই জমি রেজিস্টারি সম্ভব হল না। সোমবার জমি রেজিষ্টারি হল। অনেকগুলি টাকা ব্যয় ক'রে, বুকের জ্বালাটা বাড়ল না মেঘনাদের। বরং কমে গেল। আরো কাজের নেশা পেয়ে বসল তাকে।

বিজয় কারখানার ব্যাপারে ব্যস্ত রয়েছে। আবার নতুন গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কোম্পানী নোটিশ দিয়েছে, তারা ভাবছে চীপ্ র্যাশন বন্ধ ক'রে দেবে। তার দামটা দিয়ে দেবে শ্রমিকদের।

সমস্ত কারখানায় উত্তেজনা, রাজীব বলছে, কোম্পানী ভাবছে মাত্র, বলেনি বন্ধ ক'রে দেবে। এর মধ্যেই চেঁচামেচি শুরু করার কি আছে। আলাপ আলোচনা চলুক। শোনা যাক কোম্পানীর যুক্তি। শ্রমিকদের দাবি হাজির করা হবে পরে।

বিজয় দিশেহারা অবাক। সে বলল, 'কি বলছেন রাজীবদা। কোম্পানীর ভাবার মানে, এও কি আবার বুঝতে হয়।'

রাজীবকে শান্ত নির্বিকার দেখে, শ্রমিকেরা অবাক। তারা চীৎকার করছে, ইউনিয়ন থাক। মজুর তার নিজেরটা নিজে বুঝে নেবে।

এই রকম সংশয় আর উত্তেজনার মুহূর্তে, বিজয় শুনল, বোনাই তিন হাজার টাকা দিয়েছে শুধু ময়দার পারমিট বের করার জন্য।

বিজয় বলল, 'কবে টাকা দিলে বোনাই।'

মেঘনাদ বলল, 'কেন, আজই জমি রেজিষ্টারির সময়।'

ঃ কে নিল টাকাটা তোমার কাছ থেকে ? বিন্‌চৌ ?

'বিন্‌চৌ !' বলল, 'ও, হ্যাঁ বিন্‌চৌ।'

বিজয় বিস্ময়ে স্থবির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। অবুঝ শিশুর মত বলল, 'তবে যে রাজীবদা বলে, এটা এখন স্বাধীন দেশ।'

মেঘনাদের জ্বালা অনেকখানি থিতিয়ে এসেছে। তবু, তীব্র বিদ্রূপে হা হা ক'রে হেসে উঠল। বলল, 'বিজয়, তুমি পাক্কা শালা। স্বাধীন হলে বুঝি ঘুষ নেয় না?'

কিন্তু বিজয় তেমনি বিস্মিত বিভ্রান্ত। তাকে দেশপ্রেমিক বলা যাবে কি না, জানিনে। মজুর ইউনিয়নে থাকতে থাকতে, অনেক কথা শুনতে শুনতে, এ দেশের ভালমন্দ সে ভাবতে আরম্ভ করেছিল। অবশ্য তার নিজের মত ক'রে। স্বাধীনতার ব্যাপারেও তাই। সে ভাবল, স্বাধীন যদি তবে আবার ঘুষ কেন, আর সেই ঘুষের টাকা-ই হাতে করে নিয়ে যাবে রাজীবদা। আবার রাজীবদা-ই বলবে, এ দেশ তোমার, এ দেশ স্বাধীন।

তার মাথার মধ্যে দলা পাকিয়ে গেল সব। চট কল কোম্পানী চলে তার নিজের মর্জি মতই, চারদিকে যেমন ছিল তেমনি আছে। সেই পাপ লোভ লুঠ। আসলে, কারখানার ব্যাপারটিই তার মাথায় ঘুরছে চক্রাকারে।

সে ছুটে গেল রাজীবের কাছে। রাজীব তাকে বুঝিয়ে দিল অনেক কিছু। সে জানত, বিজয় এমনি মজুর-সুলভ কিছু বলবে তাকে। সে বোঝাল, কিন্তু বিজয় বুঝল না।

রাজীব অপমানিত বোধ ক'রে, তীব্র গলায় বলল, 'তোমার বোনাইয়ের ব্যাপারে, তুমি কেন মাথা গলাচ্ছ। তোমার বোনাই তুমি নয়। কিছু আদায় করতে গেলে কিছু দিতে হয়। ওটা শোধবোধের ব্যাপার। কিছু না বুঝেই কি তোমার বোনাই তিন হাজার টাকা দিচ্ছে। সে একজন কারখানার মালিক হতে যাচ্ছে। ঘুষ দিচ্ছে সে তার স্বার্থে।'

কথাগুলি শুনল বিজয়। কিন্তু কতগুলি নিরর্থক প্রলাপের মত সব কথাগুলি তার মগজটিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলল। রাজীবের কথার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেল না সে। সে চীৎকার ক'রে উঠল, 'ধোকাবাজী, সব ধোকাবাজী। শালার দুনিয়াটা আমাদের উল্লুক ঠাউরেছে।'

তারপর ঘুরে ফিরে এল সেই কথা, ইউনিয়ন নিয়ে যা খুশি করুন আপনারা

রাজীবদা। কোম্পানীর সস্তা র‍্যাশন আমরা চাই। মজুরেরা নিজেদেরটা নিজেরা বুঝে নেবে।

ক্রোধে ও বিস্ময়ে আত্মহারা রাজীব নির্বাক। বিজয় পথে আসতে আসতে, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নতুন জিনিস আবিষ্কার করল। মনে পড়ল বোনাইয়ের সেদিনের কথা। সেই মন্দির! সবটাই তো ধোকাবাজী। সবটাই তো, শেষ পর্যন্ত সেই একই পাপের কারসাজি।

মেঘনাদকে সে কিছু বলতে পারল না। এখন মনে হল, বোনাই যে হেসে উঠেছিল তার কথা শুনে, সে হাসি এই মিস্তিরি শালার পাগলের মত কথা শুনে। পাগলের মত কথা! বোনাইদের পয়সা আছে, কারখানাকে বলে মন্দির। ওদের কথা সে বুঝবে না। ঘুষ দিতে ওরা পেছ্‌পা নয়, কিছু পাবে ব'লে। পাগলই তো সে।

তবু বুকটা ভরে উঠল অভিমানে। অভিমানে রাগে ঘৃণায়। রাজীব, বিন্‌চো, ইউনিয়ন আর বোনাই, সব মিলিয়ে শুব্ধ হয়ে রইল সে। আশ্চর্য! বোনাই মানুষটিকে সে ভালবেসেছে। যাদের জীবনে কোথাও মিল নেই, কোনদিন থাকবে না, তাদের আবার ভালবাসা। দায়ে পড়ে যে আছে আ৷ তার ভাঙ্গা ঘরে, কাল সে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। যাবেই তো। এ মিস্তিরির ঘরে তো বোনাই চিরকাল থাকতে আসেনি।

বিজয়ের ভাব কেউ না বুঝলেও মেঘনাদ কিছুটা আন্দাজ করল। সবটুকু যে বুঝল, সে ষোড়শী। ওই কালো শক্ত রূঢ় মুখটিতে কখন কোন্ রংএর ছায়া, সে চেনে। কিন্তু বিজয় তাকে শুধু ভালবাসে। শুধু সোহাগ করে। রাগ-দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা, কোন কথা বলে না।

নকুড় একেবারে নির্বাক। সে যেন এ বাড়িতে নেই। কত কথা ভেবেছিল, কত পন্থা চিন্তা করেছিল। পারল না কিছু করতে। তারই চোখের সামনে, তারই ঘরে বসে হাজার হাজার টাকার লেনদেন চলেছে। সে বসে রইল স্থবির জড় পদার্থের মত। যন্ত্রণা শুধু, সেই জড়ের মধ্যেও প্রাণ চলছে এখনো ধিকি-

ধিকি, জ্বলছে ধ্বকধ্বকিয়ে। স্থবিরের এই পোড়া চোখ দুটিতে এখনো নজর আছে। এখনো দেখতে হচ্ছে।

ঠাকুরগলির বেশ্যাপল্লীতে তার ছেলে অনন্ত তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল, নজর রেখো, রেজিস্টারির সময়, মুক্তকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া দলিলটি বিন্‌চৌ বোনাইকে দিয়ে দেয় কিনা। যদি না দেয়, সামনে কিছু ব'লো না, আড়ালে গিয়ে ধ'রো বিন্‌চৌকে। কিছু আদায় হয়ে যাবে। বড় ভয় করেছিল নকুড়ের। চোখের দিকে তাকাতে পারেনি বিন্‌চৌ-এর। কিন্তু পাকা লোক বিন্‌চৌ। জানত, চেনাশোনা সাবরেজিস্ট্রারকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না। মুক্তর দলিল গোপন করেনি সে।

নকুড় মনে মনে বলেছে, আমি সেই চিরকালের ব্যর্থ নকুড়, হাজা মজা পচা, অ লক্ষ্মীর কালপ্যাঁচা। আমারই দুর্ভাগ্য, বিন্‌চৌ ফাঁকিও দিতে পারল না।

আর সুকুমারির চোখে কী তীব্র ধিক্কার। তলে তলে প্রচণ্ড ঘৃণা লীলার উপর। তবু, যেন ভুলে গেছে সব অপমান। মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু নকুড়কে বিদ্যুৎ হানছে প্রতিমুহূর্তে। চোখে তার এত বহ্নি যৌবনেও কোনদিন বুঝি দেখেনি নকুড়। চোখের কালো কোলে তার হাজার রেখা। নির্বাক ধিক্কার হানছে, পারলে না তুমি। আজো চাই মুখে পান, পায়ে আলতা ; কপালে সিন্দুর দিয়ে গলায় পরব সোনার সাতনরী হার। নতুন গদীতে বসবে তুমি, আমি হব মহাজন-গিন্নী। আমার চিরজন্মের সাধ। কিন্তু পারলে না তুমি। লক্ষ্মী গড়াগড়ি যাচ্ছে তোমারই দরজায়। তুমি বসে আছ ঘাটের মরার মত।

বুঝি তাই। নকুড় যেন বোবা অন্ধ হয়ে গেছে। মড়মড় করছে বুকের হাড়। তবু ভাঙ্গছে না।

মেঘনাদের মনে হয়েছিল একটু, শ্বশুর যেন নিস্পৃহ, চুপচাপ। একটু আনন্দও নেই। কিছু যে হয়েছে, মেঘনাদ যে কিছু করেছে সেটুকুও বোঝা যায় না তাকে দেখে। অথচ মেশিন কেনার দিন কত উৎসাহ ছিল। শাশুড়িও তেমনি। নির্বিকার একেবারে।

তারপর ভেবেছে, শ্বশুর শাশুড়ি, দুজনেরই নিশ্চয় অসুখ করেছে। কেমন

যেন শুকিয়ে উঠছে দুজনেই। কিংবা, বুড়ো বুড়ি মানুষ, মন খারাপ আছে কোন কারণে।

কিন্তু তীব্র বিদ্রূপ ভরা হাসি নিয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল লীলা। তেরছা নজরে চেয়ে দেখল নতুন দলিলটি মেঘনাদের হাতে। মেঘনাদ হাসতে হাসতে এল। দশ হাজার টাকার সম্পত্তি তার। এসে হাতে দিতে গেল তার।

লীলা বলল, 'আমাকে কেন? কি করব ওটা দিয়ে আমি?'

মেঘনাদ বলল, 'রেখে দেও।'

লীলা বলল, বিতৃষ্ণা ভরা গলায়, 'তোমার কারখানার দলিল, তুমিই রাখ। ম'লে আমাকে পোড়াবার সময় চিতায় দিও। তবু বুঝব, মরার পরেও তোমার সব কিছুর চেয়ে আমিই বড় ছিলাম। তখন পারবে তো দিতে?'

: কেন, জ্যান্ত থাকতেই তো দিতে চাইছি।

: তোমার এখন কারবারের আনন্দ। কী না দিতে পার এখন। তোমার দশটা হাত পা' গজাবে, রাজা হবে। আমার কী!

তার কী! লীলার কি কিছুই নয়। এ তর্ক অনেক হয়েছে জীবনে। তর্ক করার ধরন ধারন, তর্কে ধরাশায়ী করার ছলা কলা মেঘনাদ শেখেনি। যত তর্ক হয়েছে জীবনে, লীলা তত হিস্ হিস্ ক'রে বিষ ঢেলেছে।

জীবনের মাঝখানে কোপ্ মেরে দুভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে লীলা। যাকে হয় বেছে নাও। ময়দার ড্যালার সুখ দুঃখের উদ্বৃত্তে প্রাণ ভরবে না লীলার।

কিন্তু ময়দার ড্যালার সুখ দুঃখের উদ্বৃত্তের কথা কোনদিন ভাবেনি মেঘনাদ। সে জানত, তার ব্যবসা, সতীনের চেয়েও ঘৃণার বস্তু লীলার কাছে। ওই দিয়ে নাকি সে লীলাকে শুধু ঠকিয়েছে, জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে। কেমন করে, সেটা আজো জানে না মেঘনাদ।

সে জানত, আজকেও একথাই বলবে লীলা। তবু, প্রাণ চেয়েছিল, তাই এসেছিল কাছে। আজ কারবারের আনন্দ না থাক, উন্মাদনা আছে দারুণ। সে আর স্থির থাকতে পারছে না।

থম্‌থমে মুখেও হাসি ফুটিয়ে নিজেই সে দলিলটি রাখল। তবু, বুকটার

মধ্যে টনটন করতে লাগল। এসময়ে, একমাত্র মনে পড়ছে বিপিনদা'র কথা। যে তাকে হেসে, আনন্দ করে, উৎসাহ দিতে পারত। কিন্তু তার কোন চিঠিপত্র পর্যন্ত এল না।

তিলি বাইরে দাঁড়িয়েছিল। শুনেছে সব কথাই। হাতে তখনো হলুদের জল রয়েছে লেগে। আসছিল, মেঘনাদকে বকুনি দিতে। সেই গেছে বেলা দশটায় না খেয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন। রুক্ষ মুখ, পাগলের মত এক মাথা চুল। ওবেলার বাড়া ভাত রয়েছে তেমনি। কাজের ফাঁকে কি একবার খেয়ে যেতেও পারত না সে।

কিন্তু, দিদির সঙ্গে কথাবার্তা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে একটি যন্ত্রণা পাকে পাকে জড়াতে লাগল। হঠাৎ মনে হল, সত্যি যেন দিদির জীবনে কোথায় কি ঘটিয়েছে বোনাই। নইলে বারে বারে ঘুরে ফিরে সেই কথা কেন।

কিন্তু মেঘনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, পাকে পাকে জড়ানো যন্ত্রণাটা তীব্র ব্যথার মত টন্‌টন্ ক'রে উঠল। ওই মুখে সেই পাপ কোথায়, ভীরুতা কোথায়।

চব্বিশ পঁচিশের অনূঢ়া বুকের এ ব্যথা এই সংসারের চোখে পাপ। কিন্তু, তিলি নিজে তো জানে, কোন পাপই নেই তার প্রাণে। দিদি ভগ্নিপতি, দুজনকেই ভালবাসে সে। তাই বড় লাগে বুকে।

তারপর হলুদের হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল সে। হেসে হেসে ধমকের সুরে বলল, 'কি হচ্ছে দুজনের ঘরে বসে বসে। দুজনেই কি রাজা-রাণী হয়ে বসে আছো নাকি? খাওয়া দাওয়া সব কি চুকে বুকে গেছে?'

লীলা বলল ঠোঁট বেঁকিয়ে, 'রাণী হয়নি কেউ। রাজা হয়ে এসেছে তোর বোনাই।'

তিলি বলল, 'তাই দেখছি। সারাদিনে নাওয়া খাওয়া নেই, বাড়ি আসা নেই—'

মেঘনাদ বলল, 'কি ক'রে আসি বল। কাজটি তো আর ছোটখাটো নয়। আজ যে জমি রেজিস্টারি হল আমার।'

তিলি বলল, 'আমার আমার ক'রে তো খুব মশগুল আছ। আমাদের বুঝি আর একটু আনন্দ করতে নেই!'

তোমাদের আনন্দ! মেঘনাদের মুখে আলো ফুটে উঠল। বলল, 'আমার কাজে তোমাদের আনন্দ, তা' কি হবে কোনদিন?'

তিলি লীলার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আনন্দের ভাগ দিলে কেন হবে না। যা একাল্‌সেরে তুমি!'

তারপরে হঠাৎ বলল, 'তা, দুজনে অমন চুপচাপ বসে আছ যে? ঝগড়া করেছ নাকি?'

মেঘনাদ বলল, 'ঝগড়া নয়। তোমার দিদিকে দলিল দেখাচ্ছিলাম।'

লীলা তেমনি নির্বিকার ভাবে চুপ ক'রে রয়েছে। তিলি বলল মেঘনাদকে, 'আমাকে তো একটু দেখালে না।'

মেঘনাদ বলল, 'দেখবে?'

কত আগ্রহ মেঘনাদের। দিদি রাগ করতে পারে ভেবে বলল, 'পরে দেখব, তুমি আগে হাত পা ধুয়ে এসে খেয়ে নেও।'

মেঘনাদ বলল, 'না, আমি চান করব। হাত পা ধুয়ে শরীরের গ্লানি কাটবে না।'

সে স্নান করতে গেল। তিলি বলল, 'দলিলটা তুই নিলিনে কেন দিদি।'

লীলা বলল, 'আমার বয়ে গেছে নিতে। ওর দশলাখ টাকার দলিলও আমি ছুঁতে চাইনে।'

: কেন ছুঁবিনে।

: আমার খুশি।

তিলি বলল, 'খুশির মরণ তোর। বিন্‌চৌএর কথা ভাবছিলি বুঝি?'

লীলা হেসে উঠল, 'সত্যি। চল্ একদিন যাই ঠুমি।'

: কোথায়?

: বিন্‌চৌ-এর বাড়িতে।

: মরতে ?

: হ্যাঁ।

তিলি রেগে উঠল মনে মনে। হাসল না। কিন্তু রাগ প্রকাশ করতেও সাহস করল না। মনে আছে সেদিনের কথা। শুধু মুখ তার কালো হয়ে উঠল আরো। এই ভরা সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কী ভীষণ জ্বালা। বুকের মধ্যে যন্ত্রণা নিয়ে সরে গেল সে। ওদিকে রান্না পুড়ছে।

রাত পোহাতে মেঘনাদ বুঝল, বর্ধমান যাওয়ার উপায় নেই। এখন জমিতে কারখানা তোলার কাজ শুরু করতে হয়।

বিনয় বলল, 'আপনাদের দেশের রিফিউজীরা এসে যত্রতত্র জমি দখল ক'রে বসছে। জমি ফেলে রাখা ঠিক হবে না।'

রিফিউজী আবার কী। বিনয় এমনভাবে বলল যেন, এক শ্রেণীর ভয়াবহ জীব আসতে আরম্ভ করেছে এ দেশে। তারপর মেঘনাদ বুঝল, সে নিজেও একজন রিফিউজী। পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা। রিফিউজী ব'লে একটি আলাদ জাত তৈরী হচ্ছে। মেঘনাদদের আর কোন জাত নেই এখন।

তিনদিন অপেক্ষা করতে হল মেঘনাদকে। বিনয় নিজেই কারখানার প্ল্যান তৈরী করাল। প্ল্যান সাব্‌মিট করল মিউনিসিপালিটিতে। এখানে দিকে দিকে সর্বভূক্ কাক-বাহিনী হা ক'রে আছে। প্ল্যানটা পাশ করতে দু'শ' টাকার জলপানি খেল পৌরকর্তৃপক্ষ।

বিনয় বলল, 'জলপানিটা তিনদিনের করাড়ে। নইলে তিন মাস লাগত প্ল্যান বার করতে। ইন্‌স্পেকশন হতেই লাগত দু' মাস।'

কিন্তু তন্দুর মিস্তিরির কাছে না গেলে আর চলে না। মেঘনাদ বিজয়কে বলল, সে টাকা রাখুক, কাজ করাক রাজামিস্তির লাগিয়ে।

বিজয় বলল লাফিয়ে উঠে, 'ওরে বাপ্‌রে। তোমার ইঁট কাঠ বইতে পারি বোনাই! টাকা দিয়ে আমি কাজ করাতে পারব না।'

মেঘনাদ লীলাকে বলল, 'তোমার বাবা বুড়ো মানুষ। তুমি টাকাটা নেও,

মালপত্র আনিয়ে কাজটা শুরু করে দেও। যেতে হবে না, খালি শ্বশুরমশাইকে একটু দেখতে শুনতে পাঠিও।'

লীলা বলল, 'আমি ওসব পারব না।'

মেঘনাদ নকুড়কে বলল, 'আপনাকে হাজার দু'য়েক টাকা দিয়ে যাচ্ছি। আপনি মালপত্র আনাতে পারবেন? বিনয়বাবু আপনাকে গোলায় নিয়ে আলাপ করিয়ে দেবে।'

নকুড়ের বুকের মধ্যে ধ্বক্‌ধ্বক্ করছে। তার হাতে দু' হাজার টাকা দিয়ে যাবে! দু'হাজার! ইঁট, বালি, চুন, শুরকি···কিন্তু দু' হাজার টাকা। কি হল আজ। একি ভগবানের কারসাজি।

সামনে তাকিয়ে দেখল, সুকুমারি। তার চোখ বলছে, পেছিও না, খবরদার!

গলা যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে, তবুও নকুড় বলল, 'তুমি ফিরে এসে করলে হত না।'

মেঘনাদ বলল, 'আমার ফিরে আসতে দু চারদিন লেগে যেতে পারে। আপনারা থাকতে, কাজটা বন্ধ হয়ে থাকবে। তাই বলছি—'

নকুড় বলে উঠল, 'না বাবা, সেজন্য বলিনি আমি। পারব না কেন? তোমার কাজ, তোমার বাবা থাকলে করত না!'

মেঘনাদ দু' হাজার টাকা নকুড়ের সামনে রাখল। বলল, 'রাজমিস্তিরিকে সব বুঝিয়ে দেওয়া আছে। কালকেই সে কাজ আরম্ভ করবে। আপনি গোলায় গিয়ে কথা বলে আসবেন। মালপত্রটা একটু দেখেশুনে নেবেন। জমি গাঁথতে গাঁথতেই আমি এসে পড়ব হয় তো।'

নকুড় বলল, 'কিন্তু ভিত্ পত্তন কে করবে বাবা?'

ভিত্তিস্থাপন! নিয়মানুযায়ী ভিত্তিস্থাপন তো করতেই হবে। কে করবে! লীলা? সে করবে না। ছেলেপুলেও নেই লীলার। শ্বশুরকে বলল, 'আপনিই ভিত্ গাড়বেন। আপনি গুরুজন। আর কাউকে তো দেখিনে।'

কথাগুলি ভাল শুনতে পেল না নকুড়। তার হাতের মুঠো যেন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। দু' হাজার টাকা।

সুকুমারির গায়ের মধ্যে কাঁপছে। এর পর? সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পাড়ায় বেরিয়ে গেল।

বিনয় চিঠি দিল রাজীবের হাতে। বলল, উধমের হাতে দিও। উধমসিং-এর গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার। চিনতে অসুবিধা হবে না। যদি উধমকে এখন দিল্লীতে না পাও, দু'দিন অপেক্ষা করবে।

ব'লে দ্বিতীয় চিঠি দিল রাজীবের হাতে। বলল, তখনো যদি উধম না আসে, তবে মিঃ জমিরুদ্দিনকে দেবে এই চিঠি। উনি বাঙ্গালী, খুব শিক্ষিত মানুষ। টাকা পয়সার কথা উচ্চারণও ক'রো না। কাজ হ'য়ে গেলে ছুটির দিনে ওঁকে একটা ডিনার আর ড্যান্স্ দেবে। উনি ভাল মদ খেতে ভালবাসেন, মনে রেখ। উধম দু'এক শ' পেলেই কাজ ক'রে দেবে। সেও এখন খুব বড় পোস্টে আছে। ডিনার ড্যান্স দিলেও তোমার খুব বেশী খরচা হবে না। তোমার হাতে অনেক থাকবে। এনী হাউ, পারামিটটা আদায় করা চাই।

রাজীবের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ভয়ে নয়, বিস্ময়ে আর চাপা চাপা লজ্জায়। তার হাতে অনেক থাকবে, এই কথাটি শুনতে তার নিজেরই কেমন লাগছে। পুরো এক হাজার টাকা বিনয় দিয়েছে রাজীবকে। বাকী দু' হাজার রেখেছে। তার থেকে কিছু খরচা হবে, কলকাতার ইন্‌স্পেক্টর এবং ক্লার্কদের জন্য। কিছু স্থানীয় অফিসারের। বোর্ড অব মেসিন ইনডাস্ট্রির মহকুমা অফিসারটিও লাফালাফি করতে পারে। চট্ ক'রে কিছু দিয়ে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বিনয় আবার বলল, 'অসুবিধা বুঝলে চিঠি দেবে।'

রাজীব বলল, 'বুঝেছি। জানেন বোধ হয়, কারখানায় ওরা একটা নোটীশ দিয়েছে, চীপ র‍্যাশন সম্পর্কে এখন কিছুই হবে না। যেমন আছে, তেমনি

থাকবে। হেড্ অফিস থেকে কোন অর্ডার এলে জানাবে। বিজয় একটু ঠাণ্ডা আছে এখন। ইউনিয়নের কোন মিটিং আর এখন দরকার নেই।'

একথা বলার কারণ কিছু নয়। রাজীব চায়, বিনয় যেন ওদিকটায় না ঘেঁষে। বিনয় তার ঢুলঢুলু চোখে চেয়ে হাসল শান্তভাবে। বলল, 'অত ভয় কেন তোমার। নেক্স্‌ট ইলেকশনের দেরি আছে এখনো অনেক। দিল্লী তো খাপ্পা বাংলার উপরে। মিনিস্ট্রি বদল হল ব'লে। আটচল্লিশের চেহারা-ই বদলে যাবে। একান্নতে কে কার ডুগডুগি বাজাবে, কোন ঠিক নেই। সাতদিন তুমি অনায়াসে ঘুরে আসতে পার।'

রাজীব তাড়াতাড়ি বলল, 'না, সেজন্য বলিনি।'

বিনয় বলল, 'যেজন্যই বলে থাক। আমি যা, তা-ই আছি। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ওদিকে যাওয়ার আমার ইচ্ছে নেই একেবারে। তা' ছাড়া তোমার দিল্লী যাওয়া দরকার। উধমসিং, জমিরুদ্দিন, এদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করা দরকার।'

তবুও রাজীব একবার তাকাল বিজয়ের দিকে। এ অঞ্চল ছেড়ে এক-মুহূর্ত সে নড়তে চায়নি কোনদিন। ছেচল্লিশে প্রবীণদের কথা রাখতে গিয়ে সে নির্বাচনপ্রার্থী হয়নি। এখন প্রবীণদের উপর তার প্রচণ্ড ঘৃণা। নিজের রাস্তা সে পরিষ্কার রাখতে চায় ভবিষ্যতের জন্য।

রাজীবের দুটি চিলের মত চোখ আছে। কিন্তু সে চোখ বিজয়ের বিষণ্ন টানা চোখ বিঁধিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারে না। অবিশ্বাস ও সংশয় তার মজ্জায় মজ্জায়।

বিদায় নিল সে।

কেউ নেই বাড়িতে।

হেমন্তের শীত ধরা ধরা বিকালবেলা। রোদ চলে গেছে গাছগুলির মাথা থেকে। এই সময়ে পাখীগুলি নির্বাক হ'য়ে যায়। চোখ অন্ধ হ'য়ে আসে। গাল গলা ফুলিয়ে শুধু ডানা খোঁটে ঠোঁটে। হেমন্তের বিকাল বিষণ্ন হ'য়ে উঠেছে।

নকুড় নেই, সুকুমারি নেই। ষোড়শী আর লীলাকে নিয়ে অন্য ঘরের একটি বউ গঙ্গার ওপারে গীর্জা দেখতে গেছে। বিজয় ফেরেনি এখনো। মেঘনাদ গেছে বর্ধমানে সকালবেলা। তিলি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল অসময়ে। এ সাঁঝবেলায় ঝাঁটপাট দিতে নেই। সুকুমারি বকত বাড়ি থাকলে।

এমন সময়ে এল রাজীব। ধোপদুরস্থ জামাকাপড় পরনে। হাতে একটি মস্তবড় চামড়ার ব্যাগ। মনে হয়, সদ্যস্নাত। বলল, 'বিজয় আসেনি এখনো?'

তিলি ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করে, ঝাঁটা ফেলে রাখল। বলল, 'না তো।'

রাজীব ঠোঁট টিপে একমুহূর্ত ভাবল। 'একটু দেখা ক'রে যাওয়ার দরকার ছিল। আমি দিল্লী যাচ্ছি আজ।'

তিলি বলল, 'আপনাদের ইউনিয়ন অফিসেই বোধহয় সোনাদা আছে। দিল্লী যাবেন কখন?'

: এই তো বেরিয়েছি। হাওড়ায় গিয়ে উঠব, দশটায় গাড়ি।

ব'লে তিলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চোখ নামাতে পারল না। রোদ নেই। হেমন্তের রক্ত মেঘের ছায়া পড়েছে ঘরে, তিলির মুখে। কনে দেখা মেঘ। রং তার, তিলির শরীরের বাঁকে বাঁকে জাদু বুলিয়ে দিয়েছে। কাজে এলোমেলো আঁচল, খোলা চুল তিলির।

রাজীবের চাউনি দেখে, খেলা খেলা হালকা বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল তিলির ঠোঁটে। তবু শিরদাঁড়ায় একটা অদ্ভুত অচেনা কাঁপুনি। কিন্তু রাজীব কোনদিনই তিলির এ হাসিটুকু বুঝতে পারেনি। তিরিশের সন্ধিক্ষণেও মেয়ে মুখে হাসি মানেই প্রেম বুঝেছে। তিলির গায়ের মেঘের আভা ধিকিধিকি জ্বলে উঠল তার রক্তে রক্তে। চিলচোখ দুটো এখন বোকা বোকা, অবাক মনে হল। বলল, 'কি ব্যাপার! বাড়িতে কেউ নেই নাকি?'

তিলি বলল, 'না।'

একটু দূরে ছিল রাজীব। কাছে এল। গলার স্বর গেল বদলে। বলল, 'একটু চা খাইয়ে দেবে নাকি তুমি?'

তিলি যেন অনেকদূরে তাকিয়েছিল। তবু ঠোঁটে সেই হাসি। বুকের মধ্যে রক্তের তোলপাড়। বলল, 'উনুন ধরাতে হবে তা' হলে।'

চায়ের কথা ভুলে গেল রাজীব। আর একটু ঘন হ'য়ে বলল, 'তুমি সমিতিতে যাচ্ছ না কেন?'

শরীরের কাঁপুনিটা থামাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে তিলি। জবাব দিতে পারল না হঠাৎ।

কিন্তু জবাব দেওয়ার আগেই, তার একটি হাত ধরল রাজীব। সেই মুহূর্তে সমস্ত কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল তিলির। রাজীব দেখল, ঠাণ্ডা শক্ত হাত। কিন্তু রক্তে রাজীবের অদ্ভুত দোলা। ব্যাগ মাটিতে রেখে, দু' হাতে তিলিকে কাছে টেনে নিয়ে এল সে। ডাকল, 'ঠুমি।'

কিন্তু আশ্চর্য! যেন প্রাণ নেই ঠুমির শরীরে। ঠাণ্ডা, শক্ত, নিশ্চল। রাগ নেই, টান নেই, বিদ্বেষও নেই। ভাবলেশহীন জড়পদার্থ। চোখ রয়েছে দূরে, অন্যদিকে। ভয় নেই, খুশীও নেই। খালি বলল, 'ছাড়ুন।'

মুহূর্তে শিথিল হাত খুলে গেল রাজীবের। কি হল, সে বুঝতে পারল না। বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করছে শুধু। কেমন যেন ভয় লাগছে তিলিকে। এ সেই তিলিই নয়। অথচ সে ক্রুদ্ধাও নয়। যেন শুধু ছমছমে থমথমে অন্ধকার। রাজীব পেছিয়ে এল একটু। কথা সরছে না গলায়। তবু বলল, 'ঠুমি, রাগ করলে?'

তিলি তেমনি গলায় বলল, 'না।' তারপর হঠাৎ বলল, 'এতে কার কী হবে, বলুন।'

রাজীবের মনে হল দৈববানী শুনছে, মুহূর্তে মনে হল, সব ফাঁকা শুধু অর্থহীন।

সত্যি, এতে কী হবে, কী হবে! ঠুমির গলার স্বরের মত, সব অর্থহীন, বিষাদশূন্যতায় ভরা। কী হবে।

তবু বুকের মধ্যে জ্বলছে। ব্যাগ হাতে ক'রে সে পালাতে চাইল। পারছে না দাঁড়িয়ে থাকতে।

তিলি বলল, 'চা খাবেন ?'

কি বলল বোঝা গেল না। বেরিয়ে চলে গেল রাজীব।

সেই মুহূর্তে একটি শব্দহীন তীব্র চীৎকার উঠল তিলির বুকের মধ্যে। ছিঁড়ে পড়তে চাইল বুকের রক্তবাহী শিরগুলি। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

তার কী আছে! চব্বিশ বছরেও দাগহীন অকলঙ্ক কুমারী। স্পর্শহীন সহস্রলেহনে সর্বাঙ্গ সাফ হয়ে গেছে। তার কী আছে। শুধু অনূঢ়ার অপমান। ঘরে বাইরে অপমান।

গীর্জায় যেতে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল লীলা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিনয়। রাস্তায় অনেক লোক। তবু হাসল বিনয়। বলল, 'আসুন না।'

দুর্জয় সাহসিনী লীলা। সঙ্গিনীদের বলল, 'তোমরা এগোও, আসছি।'

ব'লে বিনয়ের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বিনয় নীচে নেমে এল। দরজা বন্ধ ক'রে বলল, 'বসুন।'

লীলা প্রথমে সোজাসুজি তাকাল বিনয়ের দিকে। সেই বিষণ্ণ করুণ চোখ। মার্জিত পুরুষের ব্যাকুল ভিক্ষা সেই চোখে। সোজা চোখ বাঁকা হল লীলার। বসল না। বিচিত্র কৌতূহলে চারদিকে দেখতে লাগল।

ঘোমটা নেমে গেছে অনেকখানি। খোঁপায় চিক্‌চিক্ করছে সোনার কাঁটা। যেন কালো পাথরের নারীমুর্তির গলায় চওড়া সোনার হার। শাড়ি পরতে জানে না লীলা। তার তীব্র শরীরের আমেজটুকু পোশাকের প্রাধান্য মানেও না কখনো।

হঠাৎ একটি লোককে দেখে, ফিরে তাকাল লীলা। খালি গা' গামছা কাঁধে আধবুড়ো লোকটা এসেই চলে গেল। লীলা বলল, 'কে ?'

বিনয় বলল, রাঁধুনী ঠাকুর।

লীলা আবার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। জানে সেই চোখজোড়া ঘুরছে গায়ে গায়ে, পায়ে পায়ে। সংসারও সমাজের শিকড়হীন মনে তার উল্লাস জাগছে।

. ছোট্ট মেয়েটির মত টিক্ টাক্ ক'রে সুইচ্ টিপে হেসে উঠল।

জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি ?'

বিনয় বলল, 'রেডিও। বাজাব, শুনবেন ?'

: শুনব।

বিনয় রেডিওর সুইচ্ টিপে দিল। একটি মেয়ে গলার গান শোনা গেল। হঠাৎ সেখান থেকে উঠে, সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল লীলা। রেডিও বন্ধ ক'রে কাছে এসে বিনয় বলল, 'ওপরে যাবেন ?'

: যাব।

উপরে এল দুজনে। ঘরে ঘরে উঁকি মেরে দেখল লীলা। রাস্তার ধারের ঘর থেকে, তাদের গলিটাও একটু দেখা যায়। সুলতার ঘরে এসে, ঠোঁট দুটি আরো একটু বেঁকল লীলার। তাকাল বিনয়ের দিকে। নির্বাক বিষণ্ণ ব্যাকুলতা।

লীলা বলল, 'ডাকলেন কেন ?'

বিনয় বলল, 'কেন, ডাকতে নেই ?'

: একলা বাড়িতে—রয়েছে বিন্‌চৌ।

বিনয় হেসে ফেলল,—'তাতে কি ?'

: একলা বাড়িতে কেউ মেয়েলোক ডাকে নাকি ?

: সবাইকে ডাকা যায় না। যাকে ডাকতে ইচ্ছে করে—

চুপ করল বিনয়। খিলখিল ক'রে হেসে উঠল লীলা। বলল, 'তাকেই ডাকে বুঝি বিন্‌চৌ। বেশ !'

বিনয়ের এ করুণ ব্যাকুলতা, পূজা-তৃপ্ত দেবীর মত উপভোগ করতে লাগল লীলা। বিনয় পুরুষ, লীলা—পূজারী। ভাল লাগছে তার। বলল, 'এমন ইচ্ছে করল কেন বিন্‌চৌ-এর ?'

বিনয়ের চোখে ঢুলুনী। যেন বলল নিঃশব্দে, 'তুমি-ই জান তা।' তার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল লীলা। হাসির মধ্যে যেন দেবী মনসার বর দানের ইশারা। বলল, 'বিন্‌চৌ-এর চোখগুলো খুব খারাপ।'

বিনয় বলল, 'কি ক'রব। বদলাবার তো উপায় নেই।'

লীলা আবার হেসে উঠল। বিনয় এবার বলল, 'তা' হলে একটা কথা বলি।' লীলা তাকিয়ে রইল। বিনয় বলল, 'আপনার চোখ যে আরো ভয়ংকর।'

অর্থাৎ ভয়ংকর সুন্দর। পূজার নৈবেদ্য ভরে উঠতে লাগল। লীলা বলল, 'এবার তা'হলে অন্ধ হয়ে যাব।'

বিনয় ত্রস্ত চকিত গলায় বলে উঠল, 'না না।'

তার ত্রস্তভাবে, হাসির ভারে লীলায়িত হয়ে উঠল লীলা। একটুক্ষণ চুপ-চাপ। বিনয় বলল, 'মেঘনাদবাবু বর্ধমানে চলে গেছেন ?'

লীলা ঠোঁট উল্টে বলল, 'বোধহয়।'

বোধহয় ? বিনয়ের দৃষ্টি একটু তলসন্ধানী হল। সেদিনও সন্দেহ হয়েছিল, মেঘনাদ আর লীলার মাঝে যেন কি আছে। মেঘনাদ গেছে সে জানে, তবু লীলা ঠোঁট উল্টে 'বোধহয়' বলছে। আবার জিজ্ঞেস করল, 'তা'হলে আপনিই কাজ আরম্ভ করছেন কাল থেকে ?'

কাজ ? ভ্রূ কুঁচকে উঠল লীলার। বলল, 'কিসের কাজ ?'

ঃ কারখানা বাড়ি তোলার কাজ ?

লীলার ঠোঁটে তীব্র বিদ্রূপ। চোখের দৃষ্টি শাণিত যুদ্ধমান। বলল, 'বয়ে গেছে। সে কী আমার কাজ! যার কাজ, তার কাজ। আমার কিছুই নয়।

ঃ আপনার কিছুই নয় ?'

ঃ না। আমার আমি। যার যা নিয়ে খুশি, থাকতে পারে।

বিনয় একমুহূর্ত চুপ থেকে হেসে উঠল। বলল, 'তা হলে, আমার একটি খুশি আছে। আমি তাই নিয়ে থাকতে চাই।'

লীলা ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'কী ?'

বিনয় ঃ যদি ইচ্ছে করে, সময় পেলেই আসবেন।

লীলা ঃ আমার যদি খুশি না হয়।

করুণ গলায় বলল বিনয়, 'এই খুশির উপর তো হাত চালাতে পারব না।' লীলা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল।—'আর পারলে ?'

বিনয় যা-ই হোক। তারও বিস্ময় কম নেই, হঠাৎ কথা বলতে পারল না। হেসে উঠে লীলা বলল, 'এবার চলে যাই।'

নেমে এল। বিনয় বলল, 'কিছুই যত্ন করতে পারলাম না।'

লীলা বলল, 'তোলা রইল।'

চলে গেল সে। কানে বাজতে লাগল তার, যত্ন যত্ন যত্ন। যত্ন পা'য়ে ধরে, অনেক প্রেম দিয়ে, শুধু যত্ন।

বাড়িতে এসে চোখাচোখি হল দুই বোনে। তখন বাতি জ্বলেছে ঘরের। তিলি বলল, 'বৌদি কোথায়?'

: গীর্জা দেখতে গেছে।

: তুই যাস্‌নি ?

: না।

: কোথায় গেছলি ?

: বিন্‌চৌ-এর বাড়িতে।

থ হয়ে গেল তিলি। বলল, 'কি করলি ?'

: কী আবার। কথা বললাম।

: কী কথা।

: মরণের কথা।

তিলি বলল ফিস্‌ফিস্ করে, 'মরবি, সত্যি মরবি।'

লীলা সরে গেল।

নকুড়ের হাত কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ ক'রে। কোচড় থেকে খুলে দেড় হাজার টাকা দিল গোলার মালিকের হাতে।

গোলার মালিক সদয় গলায় বলল, 'শরীর খারাপ নাকি আপনার ?

নকুড় বলল, 'অ্যাঁ ? হ্যাঁ, শরীরটা বড় খারাপ।'

মালিক বলল, 'তাই দেখছি, আপনার হাত কাঁপছে। আমাদের রিকসাটা-ই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তা' হলে, এখন আঠারো হাজার ইঁটই দেব ?

আর দশ গাড়ি বালি, আট গাড়ি চুণ, শুরকি……'নকুড় তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যা বলেছি।'

ঃ আচ্ছা, আপনি চলে যান। বেলা বারোটার মধ্যেই সব পৌঁছে যাবে। আপনার মিস্তিরি ভিত কাটতে আরম্ভ করেছে ?

ঃ হ্যাঁ।

কোমরে পাঁচশ টাকা। পাঁচশটি আগুনের হল্‌কা। শীত প'ড়ে যাচ্ছে। তবুও দরদর ধারে ঘাম ঝরছে শরীরে। এর নাম কি কালঘাম! কোথায় যাবে নকুড়। কোথায় রাখবে! পাওয়া গেছে, পাওয়া যেতে আরম্ভ করেছে। সোনাহুলি চরের মুখ থুবড়ে পড়া উপবাসী আত্মা পেয়েছে এতদিনে প্রার্থিত বস্তু। আত্মভোলা লক্ষ্মীকে খপ ক'রে ধরা গেছে চুলের মুঠিতে। পিতৃপুরুষের বাসনা কামনা, তাদের হন্যে হাওয়া প্রেতাত্মাদের পিণ্ডদানের দিন এসেছে। গদী, লক্ষ্মী, ব্যবসা……

কেউ নেই ঘরে। শুধু নকুড় আর সুকুমারি। দুজনেই কাঁপছে, ঘামছে। দুজনেই, একবার নকুড় আর একবার সুকুমারি টাকাটা হাতে নিচ্ছে। যৌবনের নাম ধরে ডাকল নকুড়, চিনি বউ, টাকাটা তুমি রাখ।

চিনি বউ এক মুহূর্ত রাখে। আবার দিয়ে দেয়।—তুমিই রাখ।

দু'জনেই অস্থির। এরকম হচ্ছে কেন? নকুড় বলল, 'অনন্তের কাছে রেখে আসব?'

সুকুমারি কুঁকড়ে উঠল, 'না না না।'

তবে? তবে, কোথায় রাখা যায়। এতদিনে যদি পাওয়া গেল, তবে রাখারও ঠাঁই নেই! পালিয়ে ফিরে যেতে হবে নাকি ধলেশ্বরীর পারে সেই সোনাহুলির চরে। গদী পাততে হবে নাকি সেখানে। একটা শালিক ডেকে উঠল। নকুড় চমকে উঠল, চিনি বউ, হেমন্ত ডাকল আমাকে?

হেমন্ত। হেমন্ত বড় ছেলে, সে তো কবে মরে গেছে। কাঁটা দিয়ে উঠল সুকুমারির গায়ে।

পাঁচশ টাকা। হিসাব? সে সব ঠিক করে রেখেছে নকুড়। কিন্তু

ভাটালাগা নাড়ির রক্ত সব বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়ছে কেন ওই টাকার উপর।

: চিনি বউ, আমি আর বসে থাকতে পারছিনে।

: আমিও না।

: চল বাইরে যাই।

: চল।

সুকুমারি তাড়াতাড়ি গামছা টেনে নিল। বুড়ো বুড়ি চলল জংলা পুকুরের দিকে কিন্তু সেখানেও দাঁড়াতে পারল না। দুজনেই এল বড় রাস্তার ধারে। তারপরে আবার ঠুক্ ঠুক্ করে চলল।

গাড়ি আসছে, বড় বড় লরী, মোটর, বাস। ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী। তারপরে, বাঁয়ে গলি। ঢুকেই, গোলার দোকান।

নকুড় ঢুকে, পাঁচশ টাকা বার করে দিল মালিকের হাতে। বলল, মালটা আরো বেশী লাগবে।

সুকুমারি বাইরে দাঁড়িয়ে। গোলার মালিক বলল, বসুন, বসুন।

নকুড় বলল, সময় নেই। বাইরে আমার পরিবার রয়েছেন। আমার শরীর খারাপ কি না!

আহা হা! মালিক অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়ল।—আর কাউকে পাঠালেন না কেন? বুড়ো মানুষ—দাঁড়ান, আমাদের রিক্সাটা—

: না না, কিছু লাগবে না। আমি যাচ্ছি।

বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল। মালিক দেখল, আর হাত কাঁপছে না নকুড়ের। হাঁটার মধ্যে তেমন কম্পিত জড়িত ভাব নেই। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল নাকের ডগায় চশমাটি নিয়ে।

আহা! কী বাতাস বাইরে। কী সুন্দর রোদ। নকুড় বলল, চিনিবউ, শীত পড়ল ব'লে, না?

সুকুমারির চোখ থেকে জল পড়ছে, বড় ভাল লাগছে। বলল, হ্যাঁ।

: চিনিবউ, আমাদের হেমন্ত, হেমা এ সময়েই মারা গেছল।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ চিনিবউ, বসন্তটা কোথায় চলে গেল, আজো এল না।

সবচেয়ে ছোট ছেলে বসন্ত। ঠুমিরও ছোট। কাজ করত না, বেকার। ঝগড়াঝাটি ক'রে চলে গেছে।

সুকুমারি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, 'ও আমার কোলপোছা।'

নকুড়ের চোখ ফেটেও জল এসে পড়ল।—আসবে চিনিবউ, বস্‌না আসবে ফিরে। সংসারে চিরদিন দুঃখ থাকে না। পাপ চিরদিন থাকে না। একদিন তারও শেষ হয়। একদিন শান্তি আসবে, সুখ আসবে, মানুষের মন ভাল হবে—

জংলা পুকুরের ধারে এসে পড়ল দুজন। টাকা পয়সার কথা কেউ একবার উচ্চারণও করল না। চান করল। বাড়ি গিয়ে তিলিকে তাড়া দিয়ে, সবাইকে অবাক ক'রে দুজনেই খেল। তারপর ঘুমোতে লাগল শিশুর মত। কেবল ঘুমন্ত নিঃশ্বাসও কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

॥ দিক্‌শূল ॥

ভিত্‌ কাটা চলছে। একদল কামিন ভাঙ্গছে ইঁট। লরী এসে মাল নামাচ্ছে। সবাই ভিড় করছে আশেপাশে। কি হবে? কারখানা! রুটি বিস্কুটের কারখানা।

মেঘনাদ তখন চলেছে ইদ্রিসের সঙ্গে। স্টেশন থেকে তিন ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসে উঠল তন্দুর মিস্তিরি গোলামিঞার বাড়ি। গোলামিঞা, বড়মিঞা নামে খ্যাত। ভাইপোর নাম খাঁদন আলী। খুড়ো ভাইপো তন্দুর মিস্তিরি। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে শুনল, বাড়ি নেই, কলকাতায় আছে। ঠিকানা নিল। রাজাবাজারের এক বস্তিতে আছে।

স্টেসনে ফিরতে ফিরতে রাত হল। সেখান থেকে পাণ্ডুয়ায় ফিরে এল ট্রেনে, ইদ্রিসের বাড়িতে।

অনেক রাত হয়েছে, উনুনে কাঠ জ্বালিয়ে বসে আছে ইদ্রিসের বিবি আর ব্যাটার বিবিরা। ব্যাটারাও বসে আছে, মেহ্‌মানের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে, খাতির যত্ন করবে। পাড়ার আরো কয়েকজন এসেছে, সকলেই মুসলমান আর সকলেই রুটি বিস্কুটের কাজের কারিগর। র‍্যাশানিং আর পারমিটের যুগে এখন সকলেই বেকার হ'য়ে পড়েছে। ময়দা নেই দেশে, কারখানাগুলি উঠে গেছে একে একে। নিজেদের টিম্‌টাম্‌ ব্যবসাও তুলে দিতে হয়েছে ময়দার অভাবে। এখন সকলেই ক্ষেতে মজুরী করে। এদের মধ্যে ইদ্রিসের অবস্থা একটু ভাল।

মেঘনাদের বার বার লালমিঞার কথা মনে পড়ল। তারপর যখন শুনল, তার জন্য নতুন হাঁড়ি রয়েছে, নিজের হাতে রান্না ক'রে খেতে হবে, তখন সে অবাক হল। বলল, নিজেরটা ফুটিয়ে খেতে পারি, সেটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু আমি তো মুসলমানের বিচার কোনদিন করিনি। করব কি করে। আমার সে সাহস কই।

কিন্তু ইদ্রিসও সাহস করতে পারছে না। পাশেই এক হিন্দুবাড়ি ছিল। সেখান থেকেই রান্না হ'য়ে এল।

মেঘনাদ ইদ্রিসের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে নিল। পনরদিন বাদে এক ছেলে চলে যাবে মেঘনাদের কাছে কাজ করতে। এখান থেকেই, পাড়ার আরো দু'জনকে মেঘনাদ কাজে নিল। বলল, নতুন শুরু করতে যাচ্ছি। কারবারটা জমুক। তেমন দিন এলে আমি অনেককেই নিয়ে যাব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুয়ার সমস্ত কারিগরদের একটি কথা বলে সে নিরাশ করে গেল। ব'লে গেল, ভবিষ্যতে আমি যন্ত্র দিয়ে কারখানা করব, এই আমার বড় আশা।

পরদিন একটি বেলা অপেক্ষা করতে হল ইদ্রিসের জন্য। কাজ মিটিয়ে কলকাতায় পৌঁছুল বিকালে। বড়মিঞা আর খাঁদনকে পাওয়াও গেল। দুজনেই আসাম যাবে পরদিন। পথ খরচা আর বায়নার টাকা পেয়ে গেছে।

মেঘনাদ দুশ্চিন্তায় মাথায় হাত দিল। বলল, 'ক'দিন লাগবে সেখানে?'

গোলামিঞা বলল, 'তা' আজ্ঞে বলা যায় না। দূরে গেলে, যার যা কাজ আছে, সবই করিয়ে নেয়। বারে বারে কলকাতা থেকে পথ খরচাও লাগে, আমাদেরও কষ্ট হয়।'

মেঘনাদ বলল, 'সে সব জানিনে। আমারটা তা' হ'লে করে দিয়ে যেতে হবে মিঞাসাহেব।'

গোলামিঞা বলল, 'বাবু, এইটা আমার ব্যবসা। কথার খেলাপ করা ভাল না।'

ইদ্রিস বলল, 'বড় মিঞা, অবস্থাটা একটু বুঝেন। পরের খিদমতগারীতে মিছা বললে, খোদা গোস্তাকি নেয় না। আপনি আসাম চ'লে গেলে, বাবুর বড় দুর্ভোগ হবে। একজনের জন্য তো না। আসামের শহরে শহরে হয়তো ঘুরে বেড়াতে হবে আপনাকে। তা' আপনি যান, দু' চারদিন বাদে যান. বাবুরটা করে দিয়ে যান। আসামে একটা চিঠি দিয়ে দেন।'

খুড়ো ভাইপো চোখাচোখি ক'রে চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ। আরো কিছু

কথাবার্তার পর রাজী হল তারা। মেঘনাদ একশো টাকা বায়না দিল। পরদিনই যাওয়া স্থির। পথখরচাও দিয়ে গেল।

তারা যখন বেরুল, কলকাতার রাস্তায় বাতি জ্বলছে। হাওড়া থেকে আসবার সময় কলকাতা দেখার সুযোগ পায়নি মেঘনাদ। ইদ্রিসের পেছনে পেছনে সে কলকাতার রাস্তা দেখতে দেখতে চলল।

শিয়ালদহের কাছে এসে মেঘনাদ বলল, আর একটু দেখে যাই কলকাতাটা। কলকাতা দেখতে দেখতে মেঘনাদের মনে হল, সে কত ছোট, কত কিঞ্চিৎ। পৃথিবী কী বিশাল, এ সংসারের সরঞ্জাম ঐশ্বর্য কী বিরাট! এই প্রথম সে অনুভব করল, বিনয় কেন সব কিছুই বড় করে করতে চেয়েছে। যারা এই বিশাল, পরিপূর্ণ জগতে ঘোরাঘুরি করছে আজন্ম, তারা ছোট ক'রে কিছু ভাবতে পারবে কেন। মেঘনাদ নিজেও পারত না। ধলেশ্বরী পারের সিরাজদিঘার সঙ্গে এর কত তফাত। আকাশ পাতাল ফারাক বললেও ব্যবধান বোঝানো যায় না।

এই বিচিত্র ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ সংসারের সমকক্ষ হতে হবে। সিরাজদিঘা ব্যাপ্তিলাভ করবে কলকাতায়, তবেই তো মেঘনাদের নতুন জীবন সার্থক।

ট্রেনে ফিরতে গিয়ে এক কাণ্ড ঘটে গেল।

হঠাৎ একটি ছেলে ট্রেণের কামরায় উঠে গান ধরে দিল। তারপরেই পেটে চাঁটি। মেঘনাদ ফিরে দেখল চালিস্। মেঘনাদকে সে দেখতে পায়নি। নানান অঙ্গভঙ্গি ক'রে লোক হাসাচ্ছে, রাগাচ্ছে। তারপরেই চালিস্ ঝুমির ঝুরির ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল।...বাবুর বড় বিস্কুটের কারবার। বাবুর বউয়ের নাম ঝুমি। বড় মনোমোহিনী সোহাগী বউ, জানেন? বাবু বিস্কুটের নাম দিলেন ঝুমির-ঝুরি।...

মেঘনাদের বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করছে। সে চালিস্ আর সমস্ত যাত্রীর মুখ দেখছে। তার মনে হচ্ছে, সব লোক তাকিয়ে আছে তার দিকে।

চালিস্ ততক্ষণে গান ধরেছে,

যে খাবে ঝুমির ঝুরি
সে পাবে, ঝুমি এক কুড়ি।

কে একজন বলল, 'এক কুড়ি সোহাগী বউ ঝুমি ?'

: হ্যাঁ।

: তবে নিয়ে আয় শালা তোর ঝুমির ঝুরি। এক কুড়ি ঝুমিই যদি পাওয়া যায়—

চালিস্ বলল, 'গানটা আর এট্টুস্ আছে।' ব'লে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে গাইল,

তখন, ঝুমি চিবিয়ে খাবে কুড়মুড়ি।

হাসির রোল পড়ে গেল। সবাই বলল, 'কিন্তু, বিস্কুট কোথায় রে তোর ছোঁড়া ?'

মেঘনাদ হাসিতে কৌতূহলে, অদ্ভুত উত্তেজিত। কি বলে শোনার জন্য উৎকর্ণ হল সে। চালিস্ বলল, 'হবে বাবুরা, পাবেন শীগ্‌গিরই। বাবুর কারখানা উঠছে, ঝুমির ঝুরি এল ব'লে। এখন আমাকে এট্টা পয়সা দেন।'

আবার হাসি।

ইদ্রিসও হাসছিল। হঠাৎ বলল, 'বাবু, নামতে হবে। ইস্টিসন এসে গেছে।'

মেঘনাদ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে, চালিসের কাছে এসে খপ্ ক'রে তার হাত ধরল।

: কে মশাই ? ব'লে তাকিয়েই চালিসের চোখ ছানাবড়া। হাতে আর এক বিন্দু শক্তি নেই।

মেঘনাদ বলল, 'আয়।'

সুড়সুড় ক'রে নেমে এল চালিস্। মেঘনাদ বলল, 'বদমাইস্! মুখের ভাত ফেলে পালিয়েছিলি যে বড় ?'

চালিস্ চুপ। মেঘনাদ তাকে ধরেই হাঁটতে আরম্ভ করল। খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, 'বদরুদ্দিনের খবর জানিস্ ?'

চালিস্ বলল, 'বদরুদ্দিন মারা গেছে।'

অ্যাঁ? কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল সে। তারপর বলল, 'সিরাজদিঘা গেছলি নাকি এর মধ্যে?'

ঃ একবার, গত মাসে ঘুরে এসেছি। আর যাই না।

ঃ কেন?

ঃ মা, ভাই, সবাই ম'রে গেছে। আর কী করতে যাব।

মেঘনাদ উৎসুক হ'য়ে উঠল। চালিস্ আবার বলল, 'লক্ষণসা'য়েরা এসেছে এদিকে, কাপড়ের দোকান করেছে। সব রিফিউজী কি না!'

মেঘনাদ বলল, 'আচ্ছা, সিরাজদিঘার মেঘনাদ সা'র কর্মচারী বিপিনের খবর জানিস্?'

চালিস্ মেঘনাদের মুখের দিকে একবার তাকাল। দেখে নিল রাগ আছে কিনা বাবুর মুখে। বলল, 'তার বড় ব্যারাম শুনলাম। বাজারে এটা মেয়েমানুষ ঘরে পড়ে থাকে। শুনলাম, বাঁচবার আশা নেই। বাবু—'

ঃ বল্।

ঃ সা কত্তা, আপনার কারখানার টিন, চালা কিছু নাই। সব চোরেরা খুলে নিয়ে গেছে। তণ্ডুল ভেঙ্গে যাচ্ছে। তার মধ্যে এখন শিয়াল কুকুরের বাস। গদীঘরের চাল বেড়াও কাটা।'

মেঘনাদের হাতের মধ্যে চালিসের হাতটা প্রায় গুঁড়িয়ে যাওয়ার দাখিল। অসহ্য যন্ত্রণায় ও উত্তেজনায়, তার সারা দেহের মধ্যে কিছু একটা পাক দিয়ে উঠতে লাগল।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই শ্মশানের চিহ্ন। ছেড়ে আসা কূল কোনদিন থাকে না। এক কূল ভাঙ্গে, আর এক কূল গড়ে। ভেঙ্গে পড়ছে এক কূল। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে তার চিহ্নও থাকবে না। এই নতুন কূল-ই ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা। মনের মধ্যে একটি ক্ষীণ আশা ছিল, এখানে মার খেলে, আবার সাহস ক'রে ছুটে যাবে একদিন সেখানে। আজ তাও ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। তা-ই বিপিনদা'র কোন চিঠি নেই। উত্থানশক্তি রহিত, অসহায়, শুধু দেখছে সব চেয়ে চেয়ে।

ঃ কি অসুখ ?

চালিস্ বলল, 'গায়ে ঘা। সবাই বলল, বাঁচবে না।'

বাঁচবে না। লীলার কথা মনে পড়ে গেল। সত্য হল তার কথা-ই। তারপর মেঘনাদ শুনল চালিসের কথা। বাড়ি তাদের কাদিশাল। সিরাজদিঘা থেকে বেশী দূরে নয়।

মেঘনাদ বলল, 'আমার কারখানায় কাজ করবি ?'

চালিস্ বলল, যদি দেন্—

ঃ দিতে তো চাই। পালিয়ে যাবি না তো।

ঃ কত্তা। তখন এট্টা মিছে কথা বলে ফেলেছিলাম—

মেঘনাদ বলল, 'থাকবি ইদ্রিসের কাছে এখন। খাবি আমার কাছে। কারখানা তৈরী হয়ে গেলে সেইখানে থাকবি। কী কাজ জানিস্ ?'

ঃ ছিট মালে ছাপ কাটতে পারি।

ইদ্রিসের যাতায়াত ঘোরাঘুরি, সব পয়সাই মেঘনাদ দিয়েছে। তবু বলল, 'ইদ্রিস্ তোমার মজুরি কামাই হয়েছে দোকানে। সেটা তুমি আমার কাছ থেকে নেও।'

কিন্তু ইদ্রিস্ কিছুতেই টাকা নিল না।

বাড়ি ফিরে এসে সিরাজদিঘার কথা বলল সে লীলাকে। লীলা নিস্পৃহ নির্বিকারভাবে ঠোঁট উল্টে রইল। তবু চোখের তারায় তারায় অদ্ভুত হাসির ধার।

নকুড় তাড়াতাড়ি জানাল, গোলার মালিককে সে সব টাকা দিয়ে দিয়েছে। সিরাজদিঘার কথা শুনে সে আক্ষেপ করল। প্রাণহীন আক্ষেপ। সুকুমারিরও সেই রকম। তারা দুজনেই যেন কিসের ঘোরে নিমগ্ন।

শুধু তিলি বলল, 'বোনাই, যা' আছে ওখানে সব বিক্রী ক'রে দেও।'

মেঘনাদ বলল, বিক্রী করার কিছু নেই ঠুমি। ভিটেটা আছে, এ্যাদ্দিনে তারও চাল বেড়া হয়তো খুলে নিয়ে গেছে কেউ। বেচে আর আমি কি পাব। থাক্ সে সব।'

মেঘনাদের মুখে ব্যথার ছায়া দেখে, ও বিষয়ে আর কিছু বলল না তিলি। বলল, 'তবে, এখানেও তো তুমি শুরু করেছ। ভগবান করুন, এখানে যদি তোমার ভাল চলে, তবে আবার সব হবে।'

'হবে ঠুমি ?' ব'লে সে উৎসুক হাসি নিয়ে তাকাল। বলল, 'ঠুমি, আমার কথা তুমি ভাব, না ? জানি না, এ বাড়িতে কি হয়েছে, আমার বড় একলা একলা লাগে। বিজয়ও আমার উপর খুশী নয় বোধ হয়। বিশ্বাস কর ঠুমি, আমি কিন্তু বুঝি, তুমি বোনাইকে মনে রাখ।'

তিলি অদ্ভুত হাসি-ত্রস্ত মুখে, অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'না, না, মোটেও নয়। আমি কারুর জন্য ভাবিনে, একটুও না।'

বলতে বলতে অন্ধকার হল মুখ। বলল. 'বোনাই, তোমার কাছে একটি কথা বলব।'

বিস্মিত মেঘনাদ বলল, 'বল।'

তিলি নিজেকে চাপতে পারল না। চোখে জল এসে পড়ল। বলল, বোনাই তুমি দিদিকে একটু ভালবাস, একটু। তোমাদের এমন কেন, আমি বুঝিনে।'

রাত হয়েছে। ঢাকা বারান্দায় উনুনের কাছেই খেতে বসেছে মেঘনাদ। সবাই প্রায় ঘুমোচ্ছে।

মেঘনাদের সারা মুখে ব্যাকুল যন্ত্রণা। বলল, 'ঠুমি, কেন বলছ এ কথা, আমি বুঝি না। কি করে তোমাকে বোঝাব! আমি মুখ্যু মানুষ। কিন্তু জীবনে কোনদিন কোন মেয়ে মানুষের কাছে যাইনি। তোমার দিদির ভালবাসা পাব, এই আশায় আমি ঘুরছি। কিন্তু কি পাপ করেছি জানি না, তোমরা দোষো আমাকে। তবে বুঝি আমি ভালবাসা জানি না। ঠুমি ঠাকরুণ, তবে তুমি আমাকে একটু ভালবাসা শিখিয়ে দেও।'

হেসে ফেলল তিলি। আর হু হু ক'রে জল এসে পড়ল চোখে। এই হাসি কান্নার মধ্যেও কেমন একটু চাপা চাপা ভয়, ত্রস্ত উৎকণ্ঠা। বলল, 'ওমা! না, না, আমি ও বস্তুর কিছু বুঝিনে। তোমাকে শেখাব কি।'

সে আর তাকাতে পারল না মেঘনাদের দিকে। মেঘনাদ কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, 'তবে তোমার দিদির বিষয়ে আমার আর কিছু করার নেই। তুমি অন্য কিছু চেয়ো বরং আমার কাছে।'

ব'লে সে উঠল। তিলি আবার বলল, 'একটি জিনিস চাইব তোমার কাছে একদিন, আজ নয়।'

: কি ?

: সে কথা আজ বলতে পারব না।

তন্দুর মিস্তিরি খুড়ো ভাইপোর চোখ গোল হয়ে গেল সব দেখে শুনে। তখনো, কারখানা ঘরের মেঝে তৈরী হয়নি। তন্দুর করবে কোথায়। মেঘনাদ বিনা কাজে মজুরী দিয়ে বসিয়ে রাখল চারদিন। তারপর তন্দুর আরম্ভ হল। তন্দুরের মেঝে তৈরী হয় বালি আর নুন দিয়ে। নীচে ইঁট, তারপরে বালি, নুন, তারপরে আবার একপাটি ক'রে ইঁট। তার উপরে, কাদা মাটির গাঁথনি দিয়ে উঠল তন্দুরের খিলেন। সিমেণ্ট বালির গাঁথনিতে, উত্তাপের ভার-সাম্য বজায় থাকে না। উত্তাপের এদিক ওদিক হলে, তন্দুরের সমস্ত মাল নষ্ট হয়ে যাবে। কেরামতি জানে তারা খুড়ো ভাইপো। তন্দুরের খিলেন ওঠে ইঁট দিয়ে, কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে, অনেকটা মস্‌জিদের গম্বুজের মত হয়। মাথার কাছে গিয়ে ইঁট কাদাতেই এমন চাবি এঁটে দেয়, সব কিছু ভর করে থাকে সেখানে। ওইটি খুলে গেলে সব ঝুরঝুর করে পড়ে যাবে। সামনের দিকে তন্দুরের মেঝের সঙ্গে খোলা রইল শুধু হাত খানেক লম্বা চওড়া একটি মুখ। অন্ধকার গহ্বর। প্রকাণ্ড ঢাকা উনুনের মুখের মত। যেন বিশাল রাক্ষসটা হা করে রয়েছে। চিমনী উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

রাজমিস্তিরিদের খাঁটুনি হল একটু। এ্যাসবেস্টাসের চাল তুলতে হল সন্তর্পণে, কাঁচা তন্দুরের উপর পড়লে ভেঙ্গে যাবে।

সমস্ত জায়গাটির চেহারা বদলে যেতে লাগল। মুক্তর পোড়ো জমিতে আজ ইঁট কাঠ চুনের ছড়াছড়ি, লরী, গরুর গাড়ির ভিড়।

মেঘনাদ আছে সর্বক্ষণ। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। বিজয়ের মন যত ভারই থাক। সে রোজ আসে কারখানা থেকে ফিরেই।

নকুড় আসে লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে। চোখে বোধ হয় আর একটু ছানি পড়েছে। শরীর শুকোচ্ছে, ওদিকে চোখও ঘোলা হয়ে উঠছে আরো। বড় অন্যমনস্ক। কী যেন তার হারিয়ে গেছে।

বিনয়ও ছোটাছুটি কম করছে না। তাকে দেখলেই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সে এলেই মনে হয়, মেঘনাদ কেউ নয়, সে-ই আসল মালিক।

তিলি, স্নকুমারি, ষোড়শী সবাই দেখে গেছে। আসেনি শুধু লীলা। আসেনি, আসবে না। বলেছে, ও দেখে আমি কি করব। আমার চিতায় কেউ মঠ তুলছে না।

দুই বোনে কথা কাটাকাটি করেছে। মেঘনাদ জানে সব। ভাববার অবকাশ পায়নি। সময় নেই একবিন্দু। সময় নেই, তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে বুকটা টন্‌টন্ করে।

সাতদিনের মাথায় যখন তন্দুর শেষ হল, তখন একদিন ইদ্রিস বলল সসঙ্কোচে, বাবু, আপনার মিশিন কারখানার তো দেরি আছে।'

ঃ তা' আছে। কেন বল তো মিঞা।

ঃ বলছিলাম, এক তন্দুরেই গেদো আর ছিটের কাজ করতে অসুবিধা হবে না!

সামনে ছিল বিনয়। সে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ, আর একটা তন্দুরের দরকার।' যেমন করেই হোক, বিনয় এ কাজকর্মের কথা কিছু জানত। গেদো মাল হল রুটির ময়দা। ছিট্ হল বিস্কুট। এক তন্দুরে দুটি কাজ এক সঙ্গে হবে না। বিস্কুট রুটির উত্তাপের তারতম্য আছে।

বিনয় আবার বলল, 'কাজের চাপ বাড়লেই, তখন আর একটা তন্দুরের জন্য মিস্তিরিদের পেছনে ছোটাছুটি করতে হবে, কাজটি হয়ে থাকা ভাল।'

তা' ভাল। কিন্তু মেঘনাদ অন্য কথা ভাবছিল। ভাবছিল, আর একটি তন্দুর মানে আর একটি ঘর তৈরী করতে হবে। কিন্তু ভাববার সময় নেই।

তার নিজের সময় নেই, তন্দুর মিস্তিরিরও সময় নেই, তা' ছাড়া ইদ্রিস বিনয়, তুজনেই যখন বলছে, হয়ে যাক।

বিনয় বলল, 'এতে কি ভাববার কিছু আছে কি মেঘনাদবাবু।'

মেঘনাদ বলল, 'না। কিন্তু বিনয়বাবু, পারমিট পাব তো।'

বিনয়ের টানা টানা চোখে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'সে কথা আপনি ভাবছেন কেন। মরবার আগেও দিয়ে যাব।'

নতুন তন্দুরের হুকুমের আগেই, নতুন ঘরের হুকুম হল।

কারখানা মূর্তি ধরছে একটু একটু করে। মেঘনাদ দূর থেকে দেখছে লুকিয়ে লুকিয়ে। হাসছে আপন মনে।

সাতদিন বাদে চিঠি এল রাজীবের। প্রথমে উধম সিং অনুপস্থিত ছিল। জমিরুদ্দিনের কাছে তুদিন গিয়ে দেখা করা যায়নি। উধমসিং ফিরে এসেছে। কার চিঠি দেওয়া যায়? উধমের না জমিরুদ্দিনের।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে বিনয় অন্য কথা ভাবল। ভাবল, পার্টির চব্বিশপরগণার কর্তারা তার সহায়। সুখেন্দু রায় মজুমদার এখন ক্ষমতায় বসে আছেন। এ অঞ্চল থেকেই দাঁড়িয়েছেন তিনি। তিনি রাজীবকে অপছন্দ করেন। ইউনিয়নগুলিতে রাজীবের কর্তৃত্ব পছন্দ করছেন না। রাজীবের যদি আর সাতদিন দিল্লী থেকে ফিরতে দেরি হয়, অন্তত তুটি বড় বড় ইউনিয়নে জরুরী সভা ক'রে, নতুন নির্বাচন করে ফেলা যায়। কারণ? কারণ আর কিছুই নয়। চীপ র‍্যাশনের ব্যাপারে, কয়েকজন নেতার কার্যকলাপ সুবিধার মনে হচ্ছে না। ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হওয়া প্রয়োজন যাতে সংগ্রাম করতে পারে শ্রমিকেরা। রাজীব হল এক নম্বর লোক, যে সংগ্রাম করতে চায় না।

রাজীবের চিঠির জবাব দেওয়ায় আগে, ইউনিয়নের কয়েকজনকে চিঠি লিখল সে। জরুরী সভা, বিনয় চৌধুরীর বাড়িতে।

মনে মনে ঠিক ক'রে নিল, যদি সভা কার্য্যকরী হয়, তবে সমস্ত ইউনিটের সেক্রেটারীর নামটা হওয়া চাই বিনয়চৌধুরীর।

রাজীবকে এখন কার্যকরী সমিতি থেকেও বাদ দিতে হবে। সে বড় মালিক ঘেঁষা। তারপর? তারপর একান্ন সালের নির্বাচন। অবশ্য তার দেরি আছে।

রাজীবকে লিখল, উধমের সঙ্গে আলাপ কর, কয়েকদিন চিঠি দিও না। চিঠি দাও জমিরুদ্দিনকে।

জমিরুদ্দিনের চিঠিটা লিখেছে সে একজন গম্ভীর এডুকেশনিস্ট, কালচারিস্টের মত।

তার চাকর গোপালের চিঠিও এসেছে। পাঁচদিন পর, স্থলতাকে নিয়ে ফিরছে সে। অথচ বিনয়ের চোখে মুখে যেন আগুন লেগেছে। তার বিষণ্ণ চোখ জ্বলছে নিরালায়। সেই জ্বলুনির মধ্যে একটি চাপা চাপা লুব্ধ উল্লাস।

সে পুড়ছে, জ্বলছে, কিন্তু কী মহানন্দ সেই জ্বালা পোড়ায়। লীলা দেহে, মনে, হাসিতে, কথায়, ব্যবহারে এক সর্বনাশা আগুন। যার শিকড় আছে তার মৃত্যু আছে। যার পেছন আছে, তাকে পেছন ফিরতে হয়। যার আছে সম্মুখ তাকে অগ্রসর হতে হয়। লীলার কিছুই নেই সেসব। সে বাতাসবাহিনী দাবানল। যেন মনে হয় বিনয়ের উপযুক্ত সঙ্গিনী।

কিন্তু মহানন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে হঠাৎ মনটা কুঁকড়ে ওঠে। এই বাতাসবাহিনী দাবানলের মধ্যে আছে বন্যতীব্রতা, কিন্তু বড় স্থূল। বিনয়ের ভিতরের কালচারিস্ট প্রেতাত্মাটার সম্মানে লাগে। লীলার ধার আছে, কিন্তু সেটা গ্রাম্য অজ চাষীর কাটারির ধার। ধারটা অর্বাচীন। যদিও সে অভিমান তার ভেঙ্গে গেছে মুক্তর বেলাতেই, তবু মনে হয়। একটু যেন লাগে তার আত্মভিমানে।

প্রায় প্রতিদিন আসছে লীলা। কী দুর্জয় সাহস। তবু, এরই মধ্যে এক নতুন লোভে লোলায়মান হয়ে উঠেছে বিনয়ের চোখ। নিজেকে সে চাপছে, ঢাকছে। ঠিক এমনি হয়েছিল মুক্তর জমিটার সময়। শেষ পর্যন্ত বিনয়

মুক্তর প্রেমের মর্যাদা রাখতে পারল না। জমিটা গ্রাস করে ফেলল। তেমনি এক নতুন দিক দেখা দিয়েছে লীলার মধ্যে। তেমনি, কিন্তু বিনয় যেন ভাল ছেলের মত, বিষয়টি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

মনের মধ্যে কোথায় তার একটি বিচিত্র স্ব-বিরোধ আছে। তার সেই বিরোধের জোর বড় কম। এত কম যে, সে তার বাল্য জীবনের তাদের সেই মস্ত বড় বাড়িটার পরিবেশ কখনো কাটিয়ে উঠতে পারে না। বাবা ভার্সেস জ্যাঠার সেই অদ্ভুত ছিঁচকেমিটা বংশানুগত কীটের মত ঘুরছে তারও রক্তের মধ্যে। এক ইঞ্চি পাঁচিল জিতে নেওয়া কিংবা, সম্পত্তির মধ্যে শজনে গাছের দুটি ডাল হেরে যাওয়া। অথচ এই লোকগুলিই পূর্বপুরুষের কী অদ্ভুত গৌরব করত, আর বলত, ঠিক তেমনটি আবার হতে হবে এই বংশকে। পণ্ডিত হতে হবে প্রত্যেকটি ছেলেকে।

অবাক বিনয় আত্মভোলা হয়ে দেখত আর শুনত সেই সব ব্যাপার। জানত না তার আত্মভোলা অবচেতন কাঁচা মনের শিরায় শিরায় কেমন ক'রে তা' চারিয়ে গেছে।

সেই এক ইঞ্চি পাঁচিল আর শজনে গাছের দুটি ডাল আজকে পালটে গেছে। তার রূপটি হয়েছে অন্যরকম। হয়তো একদিন বিনয় মিনিস্টার হবে। এই বাসনাটি তার রক্তের মধ্যে কেঁচোর মত বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সেইদিন এই মুক্ত কি ভাববে! ডাঃ সীতানাথের স্ত্রী সুধাকে সে কিছুই ফাঁকি দেয়নি। কিন্তু লীলা কী চোখে দেখবে! স্ব-বিরোধ তার এইটুকুই। অনেক পাপ করে একদিন সে এমন একটি পর্যায়ে উঠবে, যেদিন সে পাপের ঊর্ধ্বে চলে যাবে। সেদিন সে এ জগতে ফিরে আসবে না, তাকাবে না, মনেও করবে না একবার। সেদিন সে ভাল কাজ করতে চাইবে, মহৎ হবে, উন্নত হবে। মন্দের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাল হবে সে।

তবু, তাদের সেই বাড়িটার ছিঁচকে প্রেতটা পায়ে পায়ে ঘুরছে তার। দেরি করা যায় না আর। লীলার কাছে আরো কিছু পাওয়ার আছে তার। হয়তো ওইটুকুই আসল পাওয়ানা। পাঁচদিন পরেই ঘুরে আসছে সুলতা।

তাতে ভয় নেই, সুযোগেরও অভাব হবে না। কিন্তু সুলতার চোখের সেই নিঃশব্দ ঘৃণার গুপ্তি বিঁধবে বার বার। অসুবিধা হবে নিশ্চিন্তে কাজ গোছাবার।

পাঁচদিন গেল না। তিনদিন পরেই, সন্ধ্যাবেলা ফিরে এল চাকর গোপাল। গোপাল একলা, সুলতা আসেনি।

লীলার সঙ্গে বিনয় তখন উপরে।

বিনয় বলছে, তার বিষণ্ণ ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে, 'ঝুমি তোমার কি ভয় করে না একটু ?'

লীলার চোখে-মুখেও আগুন। নতুন প্রেমের মাধুর্যে, প্রাণ-জুড়নো শীতল ঢল নামেনি তার শরীরে। ঈষৎ কৃশ, আরো তীব্র হয়েছে তার নাগিনী তনু।

বলছে, কিসের ভয়, কাকে ভয় ?

: বাবা, মা, ভাই বোন।

: তারা আমার জীবনের কে ?

: তোমার স্বামী !

: স্বা ী কাকে বলে, আমি জানিনে। আমার ভয় ও নেই।

: আমাকে ভয় কর না তুমি ঝুমি ?

ভয় কেন করব ? এক মুহূর্ত থেমে বলছে লীলা, বিন্‌চৌ এমন ক'রে তাকায়, আমার মন মানে না। কেন তাকায়, সে-ই জানে। ফাঁকি দিয়ে সরে যেতে মন চাইল না। বিন্‌চৌ যদি কিছু পায় এমন ক'রে চেয়ে, নিয়ে নিক। কী ধরে রাখব, কেন ধরে রাখব, কিসের জন্য, কার জন্য। ভাবি এই বুঝি ভালবাসা। বিন্‌চৌও তো তাই বলে।

ব'লে খিল্‌খিল্ করে তীক্ষ্ণস্বরে হেসে উঠছে লীলা। বলছে, 'পুরুষের ভালবাসা ! বিন্‌চৌও পুরুষ। কেটে যেতে পারে বিন্‌চৌ-এর ভালবাসা। জানি, জানি। ভয় কিসের। সেদিন বিন্‌চৌ পালিয়ে বেড়াবে আমার কাছ থেকে।'

বিনয় ঢুলুঢুলু চোখে করুণ গলায় বলছে, 'রাগ করছ ঝুমি।'

লীলা হাসতে হাসতে ঝিকিমিকি করে উঠছে একটি তীক্ষ্ণ পাত্‌লা ফলার মত।

বিনয়ের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, 'না, বিন্‌চৌ ভয়ের কথা বলছে তাই। যদি বাঁচতে না পারি, মরে যাব। ভয় কিসের।'

এমন সময় গোপাল এল। নীচে ঠাকুর বলল গোপালকে, এসেছিস? শালা আবার একটা মেয়েমানুষ এসেছে কোত্থেকে। ওই যে লোকটা কারখানা করছে, তার বউ। বউ-মা কোথায়?

গোপাল বলল, আগে বল, বাবু কোথায়।

ঃ উপরে। যাসনি, দরজার কাছে গিয়ে ডাক্।

গোপাল এসে ডাকতেই চমকে উঠল বিনয়। ছুটে এল দরজায়। পেছনে লীলা গোপাল শুধু একখানি চিঠি দিল। বিনয় আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল, নীচে যা।

লীলা বলল, কিসের চিঠি?

বিনয় নিস্পৃহ গলায় বলল, কারখানার।

লীলা গোপালকে চেনে না। বিনয় চিঠিটি পড়ল, ইংরেজীতে লেখা ঃ

'ছেলেদের বোলপুরে পৌঁছে দিলাম। তোমার চাকরকেও পাঠিয়ে দিলাম। আমি যাচ্ছি দিল্লীতে, আমার বাবার কাছে। অনেকদিন বাবাকে দেখিনি। —সুলতা।'

লীলা বলল, বিন্‌চৌ-এর মুখ ভার হচ্ছে যে!

চিন্তিত সুরে বলল বিনয়, একটু বিপদে পড়েছি ঝুমি। তোমাকে বলব দু'একদিন বাদে।

লীলা চলে গেল একটু পরে। বিনয় ডাকল গোপালকে। গোপাল এল। দরজা বন্ধ করল বিনয়। একটি লিকলিকে বেত হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। বলল, প্রত্যেকটি সত্যি কথা বলে যা।

গোপাল ভীত চোখে তাকিয়ে বলে গেল সব। সে কিছুই জানত না। সুলতার সঙ্গে সে বোলপুরে এসেছে। বোলপুরে ছেলেদের পৌঁছে দিয়ে উনি হঠাৎ বললেন, গোপাল এই চিঠিটা তোমার বাবুকে দিও। আমি আমার বাবার কাছে যাচ্ছি। তখন একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল স্টেশনে। উনি সেটাতে চেপে বসলেন।

: তুই চেঁচালি না কেন ?

: কি ক'রে চেঁচাব ?

: উনি পালিয়ে যাচ্ছেন ব'লে।

: অনেক লোক ছিল। আমি চাকর মানুষ—

বেতটা ফেলে দিয়ে সরে গেল বিনয়। মিথ্যে বলছে না গোপাল। তারই চালে ভুল হয়েছে। অনেকদিন বাদে নগেন্দ্রনাথের দিল্লীর ঘরে, সেই রং-মাখা ঠোঁট দুটি ভেসে উঠল চোখের সামনে। যেন লাল ঠোঁট টিয়েটা ছাড়া পেয়ে পাখা ফুলিয়ে শিস্ দিচ্ছে। বিদ্রূপ করে হাসছে আপন মনে।

পর মুহূর্তেই দেখল, নগেন্দ্রনাথের কোলের উপর পড়ে সুলতা কাঁদছে।

কাঁদছে সুলতা। হঠাৎ মনটা ছটফট করে উঠল। ভূতগ্রস্থের মত। ফিরে বলল গোপালকে, চলে যা।

দ্বিতীয় তন্দুর হয়ে গেছে। কিন্তু কোন ঘরটিই পুরো ওঠেনি। আর একটি তন্দুরের জন্য, মেঝে তৈরী করতেই রাজমিস্তিরিদের কয়েকদিন গেল। যদি বৃষ্টি আসে, বিপদ হবে। ধসে যাবে তন্দুর। তবে, আকাশে মেঘের কোন ভার নেই, শীতের শুষ্কতায় জমাট নীল হয়ে গেছে।

মেঘনাদ চেয়ে চেয়ে দেখছে। এর সঙ্গে সিরাজদিঘার কোন মিল নেই। কেমন যেন একটু সাহেবী সাহেবী, শহুরে মত দেখাচ্ছে। নতুন, একেবারে নতুন বাতাস নিয়ে আসছে সবকিছু তার জীবনে।

তার সমস্ত সঞ্চয়, জলের ধারায় বেরিয়ে যাচ্ছে হু হু ক'রে। তাতে কোন আফ্‌সোস্ নেই মেঘনাদের। এ যে তার ভারে ভারে টেনে আনা, জমানো জলাশয়। নালী কেটে ভাসিয়ে দিয়েছে তাকে, অনাবৃষ্টির খর জ্যৈষ্ঠ মাঠে। যে মাঠে মূর্তি ধরবে তার স্বপ্ন।

তবু নীল আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় মাঝে মাঝে। রাজীব ফেরেনি এখনো দিল্লী থেকে। কী পুড়বে তন্দুরে, যদি ময়দা না পাওয়া যায়! অবশ্য, বিনয় বলছে, আসবে দু'একদিনের মধ্যে।

আরো আছে এক রক্তক্ষয়ী বেদনা, চিরদিন আমরণ থাকবে সেই ব্যথা। লীলা আসেনি, দেখেনি।

বিজয় সময় পেলেই কাছে কাছে থাকে। কিন্তু তারো মনে দুশ্চিন্তা। ইউনিয়নের কমিটির জরুরী সভায়, নতুন নির্বাচন হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। রাজীবদা'কে সেক্রেটারী রাখা হয়নি আর। বিন্‌চৌ হঠাৎ ভীষণ কোম্পানী-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে। দরকার হলে, চটকল মজুরের হয়ে সে দিল্লী কাঁপিয়ে দেবে বলেছে। সেক্রেটারী হয়েছে সে।

ইদ্রিসের ছেলে নুরুল, পাণ্ডুয়ার আরো দু'জন, রহিম আর পাঁচু এসে পড়ল।

কিছু কিছু হিসাব রক্ষকের কাজ করছে নকুড়। কম্পিত হাতে কলম ধরে পাকা হিসেবীর মত আঁক কষছে। কলমের টান কী! খাঁটী সওদাগরী বিন্যাস সেই লেখায়। তবু কি যেন হারিয়ে যাওয়ার সেই ভাবটি যায়নি এখনো।

ষোলদিন পর রাজীব এল। বিনয়ের সঙ্গে দেখা করে বলল, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। উধমসিং-ই সব ব্যবস্থা করেছে। তবে জমিরুদ্দিনকেও ডিনার পার্টি দেওয়া হয়েছে। বাবা! কী মদ খেতে পারেন জমিরুদ্দিন সাহেব। আর মেয়েদের ব্যাপারেও বড্ড নির্লজ্জ।

বাড়ি থেকে সন্ধ্যাবেলাই বেরিয়ে এল রাজীব। দিল্লী যাওয়ার দিন সন্ধ্যা-বেলার কথাটি ভুলতে পারছে না কিছুতেই। সাহস ক'রে বিজয়দের বাড়িতেই এল। হয়তো তিলি সব কথা সবাইকে বলেছে। দুর্নাম রটে গেছে সর্বত্র।

কিন্তু সেরকম কিছুই দেখতে পেল না সে। তেমনি একটু অদ্ভুত শ্লেষ ফিকে হাসি তিলির ঠোঁটে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ।

তাকে দেখে বিজয় বলল, এই যে রাজীবদা, ইউনিয়নে গেছলেন নাকি?

রাজীব বলল, না। এইতো ঘণ্টা দুয়েক আগে এসেছি।

বিজয় নির্বিকার গলায়, ঈষৎ বিদ্রূপ মিশিয়ে বলল, ইউনিয়নে নতুন কমিটি হয়ে গেল। আপনি আর সেক্রেটারী নেই।

রাজীবের ফর্সা মুখ রক্তহীন শবের মত হয়ে উঠল। হঠাৎ কোন কথা যোগাল না তার মুখে। বিজয় ব'লে গেল, বিন্‌চৌ সেক্রেটারী হয়েছে।

আপনি বড় মালিক ঘেঁষা, বলেছে আপনার বন্ধুরা। বিন্‌চৌ মজুরদের বলেচে, সে দিল্লী ইস্তক কাঁপিয়ে দেবে।

রাজীবের মনে হচ্ছিল, তার হাত পা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। পড়ে যাবে এখুনি। যে ভয় সে করেছিল, তা-ই হয়েছে। দলের সমস্ত ইউনিটটাই তা'হলে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। আর মজুর সভ্যরা, ওরা তো গড্ডালিকাপ্রবাহ। চোখের বাইরে তো মনেরও বাইরে। একবার অদর্শন হলেই ভুলে যায়। এর নাম চটকল এলাকা। তার চোখের সামনে বিনয় আর স্থখেন্দুরায় মজুমদারের মুখ দুটি ভাসতে লাগল। রাজনীতি! এর নাম রাজনীতি! তার এতদিনের আশা ভরসা, এতদিনের পলে পলে তৈরী তার ভবিষ্যৎ, সমস্ত ধুলিসাৎ হয়ে গেছে।

অবশ্য নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব অভিযোগ, সবই সে করবে এই নতুন নির্বাচনের বিরুদ্ধে। তবু স্থখেন্দু মজুমদার রয়েছে শাসন ক্ষমতায়।

তার ইচ্ছে হল, চীৎকার ক'রে ওঠে, গলা ফাটিয়ে, সকলের সব পাপ ঘোষণা ক'রে দেয়। কিন্তু সাহস হল না। এমন কি বিনয়ের বিরুদ্ধে বিজয়কেও সে কিছু বলতে পারল না। তা' হলে, সে নিজেও ভাসবে না, ডুববে।

বিজয় বলল, রাজীবদা', আপনাকে মজুররা পুরোপুরি বিশ্বাস হয়তো করত না। কিন্তু বিন্‌চৌকে কেউ একটুও বিশ্বাস করে না।

ঃ তবে বিন্‌চৌ সেক্রেটারী হল কি ক'রে।

আজ রাজীবও বিন্‌চৌ বলছে। বিজয় বলল, মজুরদের তো আপনি জানেন। কমিটির হিন্দুস্থানী মজুর মেম্বাররা সবাই বিন্‌চৌকে ভোট দিয়েছে। নিজেরা দেয়নি, দিইয়েছে। তবে, আমরা ইউনিয়নের ভরসায় আর থাকব না। দরকার হলে আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কমিটি করে নেব।

রাজীবের ইচ্ছে করল, একটি চড় কষিয়ে দেয় বিজয়ের গালে। কিন্তু নিজেকে শান্ত ক'রে রাখল সে। তাকে এখন থেমে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

মনটা তার হঠাৎ তিলির দিকে ঝুঁকে পড়ল আরো। জীবনে এতবড় আঘাত সে আর কখনো পায়নি। তার সারা মুখে একটি অদ্ভুত অসহায় ব্যথা, ক্লিন্নতা।

তিলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল। বলল, কী, চা খাবেন?

রাজীব দেখল, কোন মালিন্য, কলঙ্ক, রাগ বা ঘৃণা নেই তিলির মুখে। কাছাকাছি কেউ নেই। রাজীব বলল, ঠুমি, তুমি আমাকে ভুল বোঝনি তো?

তিলির ইচ্ছে হ'ল বলে, আপনিই ভুল ক'রে একটা কাণ্ড করেছিলেন। এতে আর ভুল বোঝাবুঝির কি আছে।

কিন্তু সে তেমনি হেসে বলল, না। চা খাবেন?

অবাক হয়ে রাজীব শুধু বলল, হ্যাঁ খাব।

দেড় মাস হয়ে গেল। কারখানা প্রায় শেষ হল। কোন রকম এন্‌কোয়ারি হয় নি। পারমিট এসে পড়েছে। বিনয়ের কাছে রয়েছে। এখানকার র‍্যাশনিং অফিসার কিংবা লোক্যাল ডিলারের সঙ্গে কোন কথা হয়নি মেঘনাদের।

বোর্ড অব মেশিন ইণ্ডাস্টির অফিসারও আসেনি মেঘনাদের যন্ত্র দেখতে, পরীক্ষা করতে। সব কিছু দেখছে, করছে বিনয়। বিনয় বলেছে, আপনাকে ওসব কিছু ভাবতে হবে না। আপনি কারখানা দেখুন। যেদিন বলবেন, ময়দা চিনি আপনার ঘরে পৌঁছুবে।

রাজমিস্তিরির সঙ্গে কথা বলল মেঘনাদ। মিস্তিরি বলল চারদিকে পাঁচিল দেওয়ার দরকার। নইলে বড় খোলা মেলা থাকবে।

মেঘনাদ বলল, পাঁচিল দেও মিস্তিরি। কিন্তু এবার আমি আগুন দেব তন্দুরে।

মিস্তিরি বলল, দিন, ও ঘরে আর তো আমার কোন কাজ নেই। আমার কাজ এখন আপনার মালখানা আর অফিসঘর।

আফিস ঘর? মেঘনাদ হেসে ফেলল। যাকে বলে গদীঘর, তাকেই বলে অফিসঘর। লোকজন আসবে, বসবে, পাইকেররা দরাদরি করবে, হিসাব কেতাব হবে। বিনয় বলেছে, টেবিল চেয়ার পাতা হবে সেই ঘরে। একজন লেখাপড়া জানা ম্যানেজার রাখতে হবে।

ম্যানেজার! যত ভাবে, তত মেঘনাদের গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে হাসির লুকোচুরি। একটি লোককে নিয়ে এসেছিল বিনয়। নাম হরিহর। একটু খুঁড়িয়ে চলে। বয়স চল্লিশের ঘরে। চোখ দুটো কেমন যেন শেয়ালের মত। এদিকে রোগা, কিন্তু মোটা মোটা ঠোঁটের কোণে একটা বিশ্রী হাসি। কিছু ইংরাজী লেখাপড়া জানে। মেঘনাদকে এসে বলেছিল, নমস্কার স্যার।

মেঘনাদের মনে হচ্ছিল, লোকটা যেন তার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে। তার ভাল লাগেনি। কিন্তু বিনয় নিয়ে এসেছে। তবে বেশী নয় মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের ম্যানেজার! বিনয় বলেছে, লোকটি কাজে কর্মে খুব ভাল, ব্যবসাও বোঝে। মাস দুয়েক রেখে যদি মাইনে টানা না যায়, বিদায় করে দিতে কতক্ষণ।

হরিহর আসছে রোজ। এখন থেকেই তার দেখাশোনার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু হিসেবটা আছে নকুড়ের হাতেই।

আরো অনেক লোক আসছে রোজ। কারখানার কারিগর মিস্তিরির কাজের জন্য আসছে অনেকে। ইদ্রিসের ছেলে নুরুল-ই একজন পাকা মিস্তিরি। মেঘনাদ নিজে রয়েছে। মিস্তিরির দরকার নেই তার এখন।

তন্দুরে আগুন দিল মেঘনাদ। এ আগুন দিয়ে, রুটি বিস্কুট সঁ্যাকা হবে না। মাটি আর ইঁটের সাধারণ উত্তাপ থেকে, প্রথম আগুন দিয়ে তন্দুরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে। দেশীয় মিস্তিরিরা উত্তাপের মাপ জানে না। তাদের জ্ঞান থার্মোমিটার ছাড়া, গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখার মত। কিন্তু নির্ভুল হয় কাজের সময়। তন্দুর ঠিক তাই। সর্বক্ষণের সাধারণ তাপ নেমে গেলে; মানুষের মত তন্দুরও শেষ হয়ে যায়। আবার তাকে সাধারণ তাপে ফিরিয়ে আনতে হয়। তারপর রুটি বিস্কুট সঁ্যাকাব জন্য নতুন ক'রে আগুন দিতে হয় রোজ। থেমে থাকা চলবে না। এসব ঝামেলা নেই ইলেকট্রিক হিটারে।

তন্দুরের সাধারণ উত্তাপ তুলতেই আগুন লাগে সবচেয়ে বেশী। তন্দুরে প্রাণ সঞ্চারিত হয় প্রথম আগুনেই।

এক শো মণ কাঠ এসেছে। তুটো তন্দুরে প্রায় প্রথম আগুনে আশী মণ কাঠ লাগবে।

মেঘনাদ নিজে টিণ্ডাল হয়ে বিকেলবেলা আগুন দিল। নুরুল, পাঁচুমিঞা, চালিস্, সবাই আছে সঙ্গে। ইদ্রিস কাজ ছাড়েনি হোটেলের।

আর চারদিকে হেঁকে ডেকে হুমকে লেংচে লেংচে ফিরছে হরিহর। কখনো চালিস্‌কে ধমকাচ্ছে, নুরুলকে বকছে। তাড়া দিচ্ছে রাজমিস্তিরিদের।

নকুড় দেখছে সব চুপচাপ। হিসেবটা ঠিকই আছে। কিন্তু মাথায় আর অঙ্ক নেই। একবারের জায়গায় দশবার গুনতে হচ্ছে। হরিহর তাকে এসে বলছে, কী ! অসুবিধে হচ্ছে ? আমাকে দিন না, হিসেব ক'রে দিচ্ছি।

নকুড় অপলক ছানিপড়া চোখে চেয়ে থাকে। যেন বোবা। তার উপরে রুগ্ন দেখাচ্ছে ভীষণ। হরিহর মনে মনে বলে, ব্যাটা বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। বোধহয় মরবে। ভালই হয়।

বিজয় এসে বোনাইকে দেখে অবাক। পোড়া কাঠের কালী লেগেছে গায়ে। কাপড় এঁটেছে কোমরে। ধোঁয়ায় রং পালটে গেছে সর্বাঙ্গের।

আর, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তন্দুরে। বাইরে থেকে দেখা যায় না। লোলায়মান জিহ্বার মত লেলিহান শিখা বেরিয়ে আসছে ছোট্ট হা' মুখ দিয়ে।

বিজয়ের সঙ্গে তন্দুর ঘরের বাইরে, উঠোনে এসে দাঁড়াল মেঘনাদ। আগুনে পুড়ে মুখটা লাল টকটকে দেখাচ্ছে। বিজয় বলল, একেবারে বয়লার মিস্তিরি হয়ে গেছে যে বোনাই।

মেঘনাদের চোখে অসহ উদ্দীপনা। সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে পাঁশুটে গোঁফ। কারখানার চিমনীর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস্ করে বলল, বিজয়, ঠিক ওই ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরীর মত দেখাচ্ছে, না ?'

হাসি পেল বিজয়ের। কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী, তার বয়লার, আর কোথায় রুটি বিস্কুটের কারখানার তন্দুরের চিমনী। বোনাইয়ের মাথা খারাপ

হয়ে গেছে। কিন্তু বোনাইয়ের মুখটি দেখে তার খুব ভাল লাগছে। বলল, পেরায় তাই।

মেঘনাদ আবার বলল, মেশিন বসলেই অন্যরকম হয়ে যাবে। একটা শব্দ হবে, না? ঘর্-র্ র্, ঘিচ্ ঘিচ্, সোঁ সোঁ! হা হা হা। বছর পাঁচেকের মধ্যেই হবে আশা করি।

বিজয় অবাক হয়ে হেসে উঠল। সেই মন্দিরের কথা বলছে বোনাই। কারখানার আনন্দেও মানুষ এমন করে! করে নিশ্চয়ই। মুনাফা আসবে একদিন মুঠো মুঠো, টাকার আনন্দে মানুষ সবই করে। কিন্তু বোনাইকে এত বোকা লাগছে, রাগ করতে পারছে না বিজয়।

কালো ধোঁয়ারাশি কুণ্ডলা পাকিয়ে ধীরে ধীরে সরছে দক্ষিণে, উত্তরে বাতাস। শীত পড়েছে। মেঘনাদের চোখের সামনে থেকে ভেসে ভেসে উঠছে সিরাজদিঘার ছবি। সেই কারখানার, সেই ধোঁয়া, ধলেশ্বরীর বুকে ছায়া ফেলে উড়ছে।

একটু একটু অন্ধকার হয়েছে। হ্যারিকেন জ্বলছে। ইলেট্রিক কনেকশন্ নেওয়া হবে কয়েকদিন পরে। প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে মেঘনাদের থলি। এখনো ময়দা, চিনি, মজুর, সকলের জন্য কিছু কিছু রাখতে হচ্ছে। নইলে কারখানা চলবে কি ক'রে। এখনো মাসখানেক বাজার পরখ করতে হবে।

হঠাৎ হরিহর খেঁকিয়ে উঠল, এ্যাই ব্যাটাচ্ছেলেরা এখানে দাঁড়িয়ে কে'রে। অ্যাঁ? যা, কাজে যা।

মেঘনাদ বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকাল। হরিহর চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি, কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, ও, আপনি স্যার! ভেরী সরি! একদম রিকগ্নাইস্ করতে পারিনি।'

ঠোঁটে তার সেই নোংরা ইয়ার্কি মারা হাসি। যেন ঠাট্টা করছে। তার কথার অর্ধেক বুঝতে পারল না মেঘনাদ। কথা বলতেও প্রবৃত্তি হল না। বিরক্ত কুঞ্চিত চোখে শুধু তাকিয়ে রইল।

হরিহর সরে গেল। বিজয় বলল, ল্যাংচা হরে তোমার ম্যানেজার হয়েছে তো?

মেঘনাদ বলল, বিনয় বাবু এনে দিয়েছেন।

বিনয়বাবু! বিজয়ের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল। এর মধ্যেই আবার চীপ র‍্যাশন তুলে দেওয়ার নোটীশ আসছে। শোনা যাচ্ছে, বিন্‌চৌ চীপ র‍্যাশনের বিপক্ষে। সে বলল, বোনাই, তোমাকে বাড়িতে যেতে বলল ঠুমি। ওবেলা নাকি খাওনি?

ঃ এইবার যাব।

ঃ তুমি যাও, আমি একটু ইউনিয়নে যাচ্ছি।

সে চলে গেল। বিনয় এল। হেসে বলল, বাঃ কারখানা চালু হয়ে গেছে দেখছি।

মেঘনাদ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মনে মনে সে বিনয়ের কথাই ভাবছিল। বিনয়বাবু, কালকে বিকালে আমার মাল চাই।

ঃ কালকেই আরম্ভ করবেন?

ঃ হ্যাঁ, আর দেরি নয়। সবদিক সামলাতে হবে তো।

ঃ বেশ। আচ্ছা, আপনি কি ষাট মণ ময়দা-ই আনাবেন এখন?

মেঘনাদের মস্ত মুখে, গোঁফের ফাঁকে লজ্জা ও খুশীর হাসি। বলল, না, এত মাল এনে কি করব, বলেন। পাঁচ সাত মণ মালেই আমার কাজ চলবে কাল। চাহিদা বুঝে আমাকে কাজ করতে হবে। কিন্তু, মাল কম নিলে, পারমিটের কোন ক্ষতি হবে না তো।

ঃ কিছুমাত্র না। সে সব ভার আমার।

ঃ কি করবেন বাকী মালটা। এখন কয়েক সপ্তাহ তো পুরো মাল আনানো যাবে না।

ঃ র‍্যাশনের দোকানওয়ালারা কিনে নিয়ে আপনাকে দু'হাতে আশীর্বাদ করবে। ব'লে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে উঠল বিনয়। বিষণ্ণ চোখ দুটিতে মাতালের নেশাচ্ছন্নতা। এই ব্যাপারটি মেঘনাদ বুঝল। বুঝল, সমস্ত ময়দাটা যাবে চোরাবাজারে। যদি চল্লিশমণও যায় সেখানে, তাহলেও চোরাকারবারী গড়পড়তা আটশো টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে রোজগার করবে একেবারে মাগনা।

টাকার টান, বড় টান। বিনয় নিজেই কারবার করবে কিনা মেঘনাদ জিজ্ঞেস করতে পারল না। তারও মনটা চন্‌মন্ ক'রে উঠল একবার। পর-মুহূর্তেই ছিছি করে উঠল সে। মনে পড়ল লালমিঞার কথা। চোরাকারবারে অনায়াস টাকার বন্যায় অনেকবার ভাসতে গিয়ে ফিরে এসেছে সে। আজ আবার। কেন, সামনে রয়েছে তার নতুন কারখানা। সে কেন যাবে এই পথে।

বিনয় বলল, কিন্তু আপনার বেকারীর একটা নাম-টাম দিন।

মেঘনাদ হাসল। বলল, নাম আর কি দেব বলেন। বিস্কুটের নামটা অবশ্য দেব।

ঃ কেন, আপনার বেকারীর একটা নাম থাকা দরকার। একটা হাণ্ডবিল ছেড়ে দেওয়া যাক পাঁচ সাত টাকা খরচ ক'রে।

মেঘনাদ বললে, বলেন তো কি নাম দেওয়া যায়।

বিনয় টানা টানা গম্ভীর চোখে চেয়েছিল চিমনীর দিকে। বলল, লীলা বেকারী নাম দিন না।

লীলা বেকারী! লীলা। লীলা নয় ঝুমি। মেঘনাদ জানে, বিনয়ের সঙ্গে লীলার বড় ভাব। তার চেয়ে লীলার কথা বিনয় বেশী বলে। তার নিজের মনে আসেনি, বিনয় বলছে লীলার নামে বেকারী করতে। প্রায় সন্ধ্যাতেই তিলিকে জিজ্ঞেস করলে শুনতে পায় লীলা বিনয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে। নিরভিমান শিক্ষিত উদার বিনয়, অশিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে আলাপে উন্নাসিকতা নেই।

লীলার মধ্যেও এক গুরুতর পরিবর্তন দেখছে মেঘনাদ। সে আজো আসেনি কারখানায়। তার তীব্রতা আরো বেড়েছে, বিদ্রূপ বিদ্বেষের ভার আরো শাণিত। শত কাজের মাঝেও আশ্চর্যরকমভাবে লীলার কথা মনে পড়ে যায়। তিলির সঙ্গে লীলার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। কি হয়েছে, মেঘনাদ কিছুই জানে না।

শুধু বুকের মধ্যে পোকা খায় কুরে কুরে। কিন্তু এত বড় বুক, এত কাজের

মানুষ, বাইরে থেকে তার কিছু চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর তিলি যেন তাকে কি বলতে চায়। কাছে আসে অদ্ভুতভাবে, অভিমানভরা ছলছল চোখে চায় আর সরে যায়। ওই মেয়েটির জন্যও তার বুকে এক বিচিত্র করুণ বাষ্প জমে উঠছে। কাছে থেকে স্নেহ করতে, আদর করতে ইচ্ছা করে।

আর বিনয় লীলার কথা বলে এমনভাবে, যেন মেঘনাদের চেয়েও লীলা তার কাছাকাছি বেশী। সে বলল বিনয়কে, বেশ তো, লীলার নামেই হোক।

বাড়ি এল সে। এসে দেখল, রাজীব কথা বলছে সুকুমারির সঙ্গে। আজ-কাল সে রোজ সন্ধ্যাবেলা এখানে আসে। তিলি আর ষোড়শী রাঁধছে।

মেঘনাদ এসে হেসে দাঁড়াল। তাকে দেখে চমকে উঠল তিলি। বললে, একি, কালিঝুলি মেখে এলে কোত্থেকে?

মেঘনাদ বললে, কারখানা থেকে গো! যা ছিলাম, এ্যাদ্দিনবাদে আবার সেই বেশেই এলাম। খারাপ লাগছে নাকি দেখতে?

তিলি ঠোঁট উল্টে বলল, বিচ্ছিরী!

ব'লে হেসে উঠল। মেঘনাদ বলল, তোমার দিদি কোথায়।

ঃ ভাড়াটেদের ঘরে। ষোড়শীকে বলল, ডেকে দেতো বউদি।

ষোড়শী ডেকে নিয়ে এল লীলাকে। মেঘনাদ বলল, ঝুমি, তোমার নামে বেকারীর নাম দিলাম, লীলা বেকারী।

লীলা দৃপ্ত চকিত ভঙ্গিতে ফিরে বলল, কেন?

লীলার কী রূপ আরো বেড়েছে? যেন বেড়েছে। তীব্র দীপ্তি তার কৃশ তনু অঙ্গে।

মেঘনাদ হেসে বলল, তুমি মহাজন-গিন্নী, সেই জন্য।

বিদ্রূপে ফেটে পড়ল লীলা। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ অথচ অশ্লীল মুখভঙ্গি ক'রে ব'লে উঠল, সত্যি নাকি? যা করছ, তা-ই কর, আবার গিন্নী নিয়ে টানাটানি কেন?

তিলির ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠল। মেঘনাদ হাসতে পারছে না। কিন্তু রাগ করলে না। বলল, বিনয়বাবু বলছিলেন লীলাবেকারী নাম দিতে।

অসহ্য রোষে ফুঁসে উঠল লীলা, তোমার বিনয়বাবু যা খুশি তা-ই বলতে পারে। তাতেই কি সব হবে?

অকস্মাৎ জ্বলন্ত উনুন থেকে ঠকাস্ করে কড়াটা নামিয়ে রেখে তীব্র স্বরে বলে উঠল তিলি, তাই তো হয় বলে জানি। নিজে কি তা জানিস্নে?

ব'লে বাতাসের আগে বেরিয়ে গেল তিলি। চমকে উঠল ষোড়শী। ছুটে এল সুকুমারি।

লীলার চোখে মুখে গায়ে গলে গলে পড়ছে তরল আগুন। চোখের আগুনে ঝলসে দিতে চাইছে মেঘনাদকে। তীব্র অস্ফুট গলায় খালি বলল, শয়তানের রাজত্ব, পুড়ে যাক, ছাই হ'য়ে যাক।' বলে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ঘরের।

ভাড়াটে মেয়ে পুরুষেরা উঁকি মারছে। সুকুমারি, ষোড়শী ভীত চোখে তাকিয়ে আছে মেঘনাদের দিকে।

ধোঁয়া কালীমাখা একটি বিশাল শরীর। সারা শরীরে ও মুখে একটা অমানুষিক অভিব্যক্তি। গাল দুটো কুঁচকে ঢেকে গেছে বড় বড় চোখ দুটি। তার চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে এক ধাক্কায় ধসিয়ে দেবে সমস্ত বাড়িটা। তারপর সুকুমারির দিকে চেয়ে অদ্ভুত নীচু মোটা গলায় বলল, পাপ মা, সব পাপ।

ব'লে বাইরের ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেল একেবারে রাস্তায়। রাজীবকেও লক্ষ্য করল না দরজার কাছে।

সুকুমারি শান্তভাবে অথচ কাঁপতে কাঁপতে রান্না নিয়ে বসল।

তিলি বসে পড়েছে গিয়ে পিপুলের আড়ালে অন্ধকারে। কিছুতেই নিজেকে রোধ করতে পারছে না সে। পিপুলের বুকে মুখ চেপে ফুলে ফুলে উঠছে নিঃশব্দ কান্নায়।

রাজীব এসে দাঁড়াল সেখানে। কাউকে দেখা যায় না এখান থেকে। রাজীব অসঙ্কোচে তিলির পিঠে একটি হাত রেখে ডাকল, ঠুমি।

তিলি ফিরল না, কান্নাও থামল না। তেমনি কাঁদতে লাগল। কিন্তু

রাজীবের রক্তে দোলা লাগল। পিঠ থেকে সে ঘাড়ে হাত দিল তিলির। কাছে বসে আকর্ষণ করল। ডাকল আবার, ঠুমি !

ঠুমি নড়ল না। কিন্তু থিতিয়ে এল যেন কান্নার বেগ। সান্ত্বনা দিতে এসে রক্তে তোলপাড় লেগে গেল রাজীবের। সে ঝুঁকে পড়ে ঠোঁট ছোঁয়াল তিলির ঘাড়ে। তিলি চমকাল না, কাঁপল না। ছেলেমানুষের ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে বিরক্ত মেয়েমানুষের মত বলে উঠল, আঃ, এরকম করছেন কেন আপনি।

রাজীবের বুকের আগুন হঠাৎ নিভু নিভু হয়ে এল তিলির গলা শুনে। যেন এর চেয়ে তিলি ভয় পেলে, সম্মানের ভয়ে রেগে উঠে পালালে ভাল হত, আশা থাকত। বলল, ঠুমি, তুমি কাঁদছ—

তিলি বলল, আমি কাঁদছি তো কি হয়েছে। আপনার কি ইউনিয়ন টিউনন সব উঠে গেছে ? আর কোন কাজ নেই ?

রাজীবের হাত শিথিল হয়ে এল। রাগ নয় অনুরাগ নয়, শাসন। আশ্চর্য ! রাজীব মনে জোর পায় না একটুও। বলল, সে কথা তোমাকে বলতে চাই ঠুমি। বিনয় চৌধুরী আমার সর্বনাশ করেছে।

ওই একই নাম সর্বত্র। তিলি বলল, সর্বনাশ করেছে, আমাকে বলে কি হবে। গিয়ে শোধ নিন। এখানে বসে থাকলে কি হবে।

ঃ শোধ নেব ঠুমি, দারুণ শোধ নেব।

ঃ তাই নিনগে। সংসারের জ্বালায় আপনার জন্য কাঁদতেও পারব না ?

কোথায় রাজীবের সেই চিল চোখ। করুণ গলায় বলল, কিন্তু ঠুমি, তোমার কাছে আমি অনেক কিছু চাই।

অদ্ভুত মিষ্টি সুর, তবু যেন নির্বিকার গলায় বলল তিলি, চান, নিয়ে যাবেন। এখন যান।

সে ঘরে চলে গেল আবার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রাজীবের বুকটা শুধু ভরে উঠল।

তবু শূন্য বুকটার মধ্যে হাহাকার উঠতে লাগল।

চালিস্ খেয়ে এসে বলল, কত্তা, আপনাকে খেতে ডেকেছে। সকলের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেঘনাদ কোন জবাব দিল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তন্দুরের হা-মুখের দিকে। সত্যি যেন একটা বিকটাকার দানব লাল মুখগহ্বর খুলে হা করে রয়েছে। আগুনের শিখা আর নেই। সব জলন্ত অঙ্গার। মেঘনাদের বুকটাও অমনি লাল। সেখানেও তন্দুর জ্বলছে। আজ প্রথম, নতুন রকমভাবে মনে হচ্ছে, লীলা তার জীবনের একটা দিক ভেঙ্গে দিয়েছে।

ফিরে এল সে বাড়িতে। রাত হয়েছে বেশ। ঘুমন্ত সুপ্ত পাড়া। পিপুলের ছায়ায় এসে দাঁড়াতেই, অন্ধকার ফুঁড়ে তিলি বেরিয়ে এল। বলল, এত রাত করলে?

মেঘনাদ বলল, ইচ্ছে করে করিনি। তোমাদের বাড়িতে গণ্ডগোল দেখে পালিয়ে গেলাম।

রাজীবের সামনে সেই তিলি মেয়েটি নয় এখন সে। বলল, বোনাই, আমি আর এখানে থাকতে পারছিনে।

: কোথায় যাবে ঠুমি ঠাকরুন!

ওই স্নেহের নামটা শুনলেই বুকের মধ্যে বাষ্প জমে উঠে তিলির। বলল, তোমার কাছে একদিন একটা কথা বলব বলেছিলাম।

: আজ বলবে সে কথা?

: হ্যাঁ। একটু থেমে বলল, বোনাই, বাবা, মা, সোনাদা' ওরা বড় গরীব। তুমি আমাকে একটা বিয়ে দিয়ে দেও।

মেঘনাদ কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে রইল। গলায় শব্দ আসছে না। থেমে থেমে বলল, আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাও ঠুমি ঠাকরুন।

তিলির কণ্ঠরুদ্ধ। তবু ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আর থাকতে পারছিনে বোনাই। এখানে আমার আর ঠাঁই না থাকাই ভাল। আর—

: আর?

: আর কবে বিয়ে হবে? বয়স যে অনেক হল।

মেঘনাদের বুকের মধ্যে বোবা যন্ত্রণা। বলল, তোমার যদি সুখ হয় ঠুমি তবে তাই করব আমি।

: সুখ ব'লো না বোনাই। বল, নিষ্কৃতি।

: কার নিষ্কৃতি?

: তোমার, আমার, সকলের।

: লোকের কাছে মনের কথা বলে আমি বোকা বনে যাই। কিন্তু ঠুমি ঠাকরুন, তোমাকে বিয়ে দিয়ে আমার নিষ্কৃতি কিসের? তোমাকে যে বড় সুহৃদ বলে জানি।

: থাক্, থাক্ সে সব কথা বোনাই।

বলতে বলতে মুখ ঢাকল তিলি দু' হাতে।

মেঘনাদ বলল, তবে কান্নাও থাক্। তবে, আগে আমাকে পুরোপুরি আরম্ভ করতে দেও কাজকর্ম, তারপরে—

তিলি আবার বলল, থাক্।

: থাক নয়, বলতে হবে আমাকে কি হয়েছে। কি হয়েছে বিন্‌চৌ-এর, সেদিন সেই চিঠিটা আসার পর থেকে।

লীলা মুখোমুখি দাঁড়াল বিনয়ের। দোতলা থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, দূরের রাস্তা। বিনয় বিষন্ন ম্লান চোখে তাকিয়ে আছে দূরে। করুণ হেসে বলল, 'বিন্‌চৌএর সব দুঃখ কি তুমি ঘোচাতে পারবে লীলা?'

: না পারি শুনতে তো পারি।

বিনয় এখন মনে মনে ভাবছে, থাক্ থাক্ এসব। কিন্তু তার ভেতরে আর একটি মন আছে। স্ব-বিরোধী সেই মন। সে বিদ্রোহ ক'রে থাবা শানাচ্ছে, উস্‌কে দিচ্ছে তাকে। বিনয় তাকিয়ে আছে অন্যদিকে, কিন্তু দূরবিসারী দৃষ্টি লীলাকেই দেখছে। বলল, 'তোমাকে বলা যায় না লীলা।' বলতে বলতে দুশ্চিন্তার কয়েকটি রেখা ফুটে উঠল বিনয়ের মুখে।

লীলা বলল, 'কেন ?'

: তুমি মেয়েমানুষ, তাই। তোমাকে ভালবাসি, তাই।

গাঢ়, গভীর অথচ দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন গলা বিনয়ের।

ভালবাসা ! কেমন যেন অর্থহীন গা জ্বালানো বলে মনে হয় কথাটি। তবু, বিনয়ের সঙ্গে সত্যি কোথায় বাঁধা পড়েছে লীলা। তার সংসার পোড়ানো বুকের চিতায় একটু হৃদয়গত আমেজের মত। গলায় তার গাঢ়তা নেই, খরতা আছে। বলল, 'ভালবাসলে বলা যায় না, এমন কথাও আছে নাকি ?'

বিনয়ের গলার ভেতরটা কাঁপছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। একটা মন ভয় পাচ্ছে, রাগ করছে, বলছে, খবরদার ! ওরে রাক্ষস, বলিস্‌নে বলিস্‌নে। তবু ব'লে ফেলল, 'লীলা, আমার সাতহাজার টাকা দেনা আছে। দু'তিন দিনের মধ্যেই শোধ করতে হবে।'

চকিত সংশয়ে বেঁকে উঠল লীলার ভ্রূ। বলল, 'বিন্‌চৌ-এর দেনা ? কেন, বিন্‌চৌ-এর কি টাকা নেই ?'

অদ্ভুত করুণ বিষণ্ণ অথচ তিক্ত গলায় বলল বিনয়, 'জানি, তাই ভাবে সবাই। আমার ঠাকুর চাকরও তা-ই ভাবে। লীলা, যা দেখছ, সব সাজানো। ভেতরটা একেবারে ফোঁপরা, শূন্য। এই বাড়ি, ঘর, কারখানা...'

তখনো লীলা তাকিয়েছিল অপলক তার চোখের দিকে। সংশয়টা বোধহয় কেটে আসছে। আর বিনয়ের ভেতরটা বলছে, আর নয়, আর বলিস্‌নে বিনচৌ। তবু বিনয় আবার বলল, 'তোমার স্বামীর সব টাকাই ব্যবসায় খাটতে আরম্ভ করেছে। নইলে, তার অনেক উপকার করেছি, তার কাছেই চাইতাম।'

লীলা জানে না কি উপকার করেছে বিনয় মেঘনাদকে। তবু জানে, বিনয় ছাড়া গতি নেই লোকটার। লীলা হঠাৎ বলল, 'বিন্‌চৌএর বউ কোথায় ? সেও কি এসব জানে না ?'

বিনয় বলল, 'আমার বউ আর কোনদিন আসবে না।'

: কেন ?

সত্যি কথাই আর একরকম ভাবে বলল বিনয়, 'তাকে আমি কোনদিন ভালবাসিনি, সেও নয়। তা' ছাড়া, তার চরিত্র—'

বিনয় চুপ করল। কিন্তু লীলা অদ্ভুত নিষ্পলক সাপের মত চেয়ে আছে বিনয়ের দিকে। বিনয়ের ভেতরটা কোঁকড়াচ্ছে।

লীলা বলল, 'বউ কোথায় গেছে?'

ঃ দিল্লীতে, বোধহয় তার বাপের কাছে।

বলতে বলতেই আত্মসম্মানে যেন লাগল বিনয়ের। বলল, 'ওসব কথা থাক লীলা।'

থাকল, কিন্তু লীলা যেন প্রতিটি ভঙ্গি বিনয়ের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে তেমন ক'রে আর হাসে না। মাঝে মাঝে নিঃশব্দ বিদ্যুৎ জ্বলে ঠোঁটে। হঠাৎ হেসে বলল, 'বিন্‌চৌ দেখছি খুব বড় সওদাগর। সপ্তডিঙ্গার শুধু সাজন গোজন সার।'

বিনয় প্রেম ঢুলঢুলু চোখে তাকিয়ে বলল, 'সব যাক্, লীলার ভালবাসা তো থাকবে। সে আমাকে ওইটুকু দিতে পারে।'

লীলা হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে। বড় তীব্র হাসি। কিন্তু লীলার বুকটা কেন যেন জ্বলছে। তার কেবলি মনে হতে লাগল, বিনয় তার কাছে কিছু চায়। বিন্‌চৌ-এর বিষন্ন চোখে করুণ ব্যাকুলতা। কিন্তু মানুষটা কেমন যেন ভীরু দুর্বল। শুধু চাওয়া, প্রাণ ভরে চাইতেই পারে। আর যেন কিছু নয়।

লীলা চলে যাওয়ার পর ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ধিক্কার দিয়ে উঠল তার ভেতরের মন, পারলিনে বলতে, হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিলি। কিন্তু সময় যায়নি এখনো।

বিনয় কয়েকটি চিঠি বার করল। সবগুলিই দিল্লী থেকে লেখা স্বলতার সাম্প্রতিক চিঠি। সবগুলিই বিনয়ের চিঠির জবাব, 'আমি যাব না আর কোনদিন। তুমি আইনের সাহায্য নিতে পার।—স্বলতা।'

আইন! আইন! বিনয়ের টানা চোখে রক্ত ছুটে আসে।

রাত্রি আটটার পর আবার এল লীলা। বিনয় বলল, 'রাত্রে এলে?'

লীলা হেসে বলল, 'থাকতে এলাম।'

বিনয় চেষ্টা ক'রে হাসল। বলল, 'থাকো কিন্তু পাড়ায় টি'কতে দেবে না যে লোকে।'

ঃ অন্য পাড়ায় না হয় যাব।

বিনয় বলল, 'ভাববার বিষয়।'

লীলা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, আঁচলের আড়াল থেকে বার করল একটি পেতলের বাক্স। তার গহনার বাক্স। বলল, 'আমার সব গহনা। এতে সাতহাজার হয়ে যাবে।'

বিনয় যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠল। সোনা পেয়েও ভয় হয়, চমকায় বিনয়। লীলা বলল, 'নেও।'

বিনয় বলল, 'কিন্তু লীলা, তোমার বাড়ির লোকেরা—'

কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তেই বিনয়ের ভয় কেটে গিয়ে লোভ দুর্বার হয়ে উঠেছে। পেতলের বাক্সের সোনার ঝকমকানি তার চোখে। সে মুখে বলতে পারেনি। লীলা কাজে করে এনেছে।

লীলা বলল, 'বাড়ির লোক কি করবে জানিনে। বিন্‌চৌ-এর দরকার, তাই এনেছি।'

বিনয় বলল, 'এত ভালবাস তুমি।'

ভালবাসা! ভালবাসা! তীব্রস্বরে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করল লীলার, জানিনে কিসের ভালবাসা। কোথায় আছে ভালবাসা। কিন্তু বলল, 'তা জানি না। বিন্‌চৌ যদি অমন করে বলে—'

কী করে বলে, তাও ঠিক বোঝে না লীলা। বিনচৌ তার বিষণ্ণ ব্যাকুল চোখে তার কাছে এতদিন ভিক্ষা চেয়েছে। সে দিয়েছে সব। দিয়ে তার শান্তি কতখানি হয়েছে জানে না। না দিলে শান্তি নেই, জানে।

লীলা বসেছিল খাটে। তার কাছে হাটু মুড়ে বসল বিনয়। বলল, 'ব'লে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু লীলা তোমার গলার একটি হার রাখ।'

বলে সে হার, চারখানি চুড়ি আর কানের দুল পরিয়ে দিল লীলাকে। কোন প্রতিবাদ করল না লীলা। শুধু একটু হাসল।

লীলা চলে যাওয়ার পর, একলা ঘরে হা করে তাকিয়ে রইল বিনয় গহনার বাক্‌সের দিকে। সমস্ত বিশ্বটা বড় বিস্ময়ের লাগছে তার কাছে। লীলাকে সে যেন চিনতে পারছে না। আবার স্থলতার চিঠিগুলি দেখতে লাগল সে। চিঠিগুলি ফুঁসছে, যাব না, যাব না, কোনদিন যাব না।

এই স্থলতার ঘর। এই ঘরে সে রাত্রে কোনদিন ঢোকেনি। আজ এই ঘরে বসে চোখের ঘুম একেবারে গেছে বিনয়ের। সেও ফুঁসছে, কামড়াচ্ছে তার বুকের মধ্যে। আর দুটি ভীরু মুখ, চারটি ভীরু চোখ তাকে যেন দেখছে শান্তি নিকেতনের গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে। তারপর, আবার কাল আছে ইউনিয়নের মিটিং। রাজীব চেষ্টা করছে ফেঁসো কারখানায় স্ট্রাইকের জন্য। ছুটছে কলকাতা প্রদেশ অফিসে, তলে তলে যোগ দিচ্ছে বেয়াড়া শ্রমিকদের সঙ্গে। হেসে কথা বলছে বিরুদ্ধদলের সঙ্গে। যারা আজকে তাদের দলের গোটা শাসন ক্ষমতাটাই ধূলোয় লুটিয়ে দিতে চায়। এদিকে, কোম্পানী দৃঢ়ভাবে নোটিশ আনছে, চীপ র‍্যাশন বন্ধের। জানিয়েছে বিনয়কে আগেই।

স্থলতা, লীলা, ইউনিয়ন, গহনা…

বারান্দায় কাকের ডাকে চমকে উঠল বিনয়। রাত শেষ হয়ে গেছে।

কারখানা জমে উঠেছে। প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে মাল তৈরীর পরিমাণ। মালিক বলে চেনা যায় না মেঘনাদকে। সে গেদো আর ছিট্‌, উভয় মালেরই মিস্তিরি। প্রতিদিন স্নান ক'রে, শুদ্ধবস্ত্রে, এখনো সে-ই মশলা তৈরী করে। মশলাই আসল। স্বাদ গন্ধ শুধু নয়, মশলার উপর নির্ভর করে মালের নরম শক্ত হওয়া। ফেটে যাবে কি শক্ত হয়ে যাবে, বেশী ময়দায় কম মাল হবে না বেশী মাল হবে, সব নির্ভর করে মশলার উপর। সেই মশলা কাউকে করতে দেয় না মেঘনাদ। নুরুল ভাল মিস্তিরি। আরো কয়েকজন নতুন লোক

এনেছে ল্যাংচা ম্যানেজার হরিহর। তারাও, গেদো মালের মিস্তিরি মন্দ নয়। কিন্তু বাজারে নতুন পসার করার সময়, ভরসা করা যাচ্ছে না তাদের উপর।

তা'ছাড়া মশলা বড় গোপন জিনিস। গুরুর কাছে দিব্যি খেয়ে সাকরেদ দীক্ষা পায়, কোনদিন কাউকে বলবে না। মেঘনাদের প্রথম গুরু একজন মুসলমান। দ্বিতীয় গুরু লালমিঞা। এমন কি কোন মিস্তিরিও তার মশলার কথা আর একজনকে বলবে না। বড় বড় মেশিনওয়ালা কারখানায় এই মিস্তিরিদেরই বলে কেমিস্ট। মাইনে তাদের হাজার বারশো। তেমন তেমন কারখানায় দেড় হাজার, দু' হাজার। এদের নিয়ে আবার টানাটানি কাড়াকাড়ি হয়।

সবাই মেঘনাদের কাজই দেখে। যেন অসুর। টিণ্ডাল, মিস্তিরি, কারিগর সব কাজই করছে। আর মাঝে মাঝে মেশিনটির দিকে চেয়ে দেখছে। ঘর উঠতেই বিজয়ের কাছ থেকে মেশিন এসে পড়েছে। একদিন এমনি সারি সারি মেশিনে ভরে উঠবে এই ঘরগুলি। আরো বড় মডেল. নতুন মডেল আসবে। হিটার আসবে। ভেজা আর শুকনো কাঠের জন্য মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে না।

সেইদিন, সেইদিন আসবে কবে। পাশে পাশে লীলার মুখ ভেসে ওঠে। বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতেও তার লজ্জা করে আজকাল। হয় তো, এই লোকটির কাছে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করে লীলা তাকে নিয়ে। লীলার মুখখানি মনে পড়লে, কাজে মাতে সে আরো বেশী। লীলা, তিলি, কোন বোনেরই বড় একটা কাছাকাছি হয় না। তিলি খেতে দেয়, মেঘনাদ চুপ ক'রে খায়। শুতে গেলে যখন যায়, তখন লীলা অঘোরে ঘুমোয়। যদি জেগে থাকে, যদি কখনো জাগাতে প্রাণ চায় মেঘনাদের, তখনই হয় নতুন যন্ত্রণার উদ্ভব।

কাজ, কাজ শুধু।

নিজের হাতে ময়দা মেপে দেয় কারিগরদের। নিজের হাতে ওজন করে মালের ছাঁচ কেটে দেয়।

আর তার পায়ে পায়ে ঘোরে চালিস্। চালিস্ নইলে কাজ জমে না তারো।

কাজের মাঝেই পেট বাজিয়ে গান ধরে। মেঘনাদের ধমক খেলে থামে। হঠাৎ নাচ শুরু ক'রে দেয়। বলে, 'কত্তা ঝুমির ঝুরি নইলে চলবে না।'

আচমকা দংশনে ব্যথা লাগে বুকে। বলে, 'ঝুমির ঝুরির বড় আদর হবে না রে।

আচ্ছা, করা যাক।

ইদ্রিস কাজ ছেড়ে এসেছে হোটেলের। তারাও খুব উৎসাহ। করা হল ঝুমির ঝুরি। চলল না এখানকার বাজারে। এখনে চায় সবাই রুটি, বড় বড় বিস্কুট। কারখানার টিফিনে যাতে পেট ভরে। শৌখিন মালের বাজার নেই।

মেঘনাদের পুরো কলসীটি উপুর হয়ে গেছে। শূন্য হয়ে গেছে, আর এক ফোঁটাও জল নেই সঞ্চয়ের কলসীটায়। এবার কিছু ঘরে আসা দরকার। যা আসে তা বড় নগন্য। দুদিন বাদে খরচ পোষাবে না।

হিসাব লেখে নকুড়। কিন্তু লেখায় খোঁড়া ম্যানেজার হরিহর। বলে, 'কত লিখলেন স্যার ফাদার-ইন্-ল। দশ টাকা জমা লিখুন, পাইকের রাখোহরির নামে। বাকী সত্তর টাকা।'

নকুড়ের কলম ঝুলে যায়। জমা খরচের পড়তা দূরের কথা, আশমান জমিনের চেয়েও ফারাক বেশী। কিন্তু নকুড় বোবা হয়ে গেছে। ভাবে, এইটাই বোধ হয় এ ব্যবসার রীতি। কার ব্যবসা, কে করে, যেন কিছুই জানে না। ছানি পড়া চোখে, কিলবিলে কপাল তুলে চেয়ে থাকে।

অফিস ঘরে, টিন ভরতি মাল। হরিহর মুঠো ভরে মুখে দিয়ে চিবোয়। বলে, 'কি হল?'

নকুড় বলে, 'জমা খরচটা ঠিক বনছে না যে ল্যাংচাহরি।'

: নট্ ল্যাংচা হরি স্যার ফাদার-ইন্-ল, ম্যানেজার বলবেন। ইওরসন্-ইন্-ল তাই বলেন। যা বলছি, তাই লিখে যান।

ব'লে চোখ মারে রাখোহরিকে। রাখোহরি মাল নিয়ে চলে যায়।

বিনয়ের দেওয়া এ বিশ্বস্ত লোকটি- এ অঞ্চলের সকলের পরিচিত। আঠারো

বছর বয়সে, হরিহর ছিল বিনয়ের জ্যাঠার চেলা। ছেলে কুলীন বাঁড়ুজ্জে ঘরের। বউ ছেলেমেয়েও আছে। গুণের মধ্যে বড় গুণ, ভাল রেস্ খেলতে জানে, মদ খেতে পারে, আর পারে মারামারি করতে। ওই করেই একটি পা গেছে। কিন্তু লেখাপড়া না ক'রেও, ইংরাজী বলে সে মন্দ নয়। বিশেষ ক'রে, এ ইংরেজী হল, বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর কালের ইংরেজী।

কখনো বিস্কুট খাচ্ছে, পাউডার মিল্‌ক গিলছে মুঠো মুঠো। নকুড়কে বলে, 'চলবে নাকি স্যার ?'

হা করে চেয়ে থাকে নকুড়। কেন যেন ভয় করে ল্যাংচা হরিকে। মনে হয়, তার মনের গোপন গুহায় লেংচে লেংচে ফিরছে লোকটা অষ্টপ্রহর। যেন জানে সব, নকুড়ের পাপ। চেনে সোনাচুলিচরের ভূতটাকে।

তাই হিসাবের খাতা লিখতে হাত কাঁপলেও মেঘুকে খাতাখানি দেখাতেও হাত ওঠে না।

হরিহর ঘাবড়ায় একটু মেঘনাদকে দেখলে। সব সময় পেছনে লাগে চালিসের। চালিস্‌ও সহ্য করে না তাকে। চালিস্ বেশ বুঝতে পারছে, রুটির মিস্তিরি বদনের সঙ্গে হরিহরের কিছু একটা গোপন ব্যাপার আছে। অনেক দিন সে দেখেছে, রাত্রে বসে বসে ছুটিতে কিসের ফুস্‌ফুস্ গুজ্‌গুজ্ করে।

বদনের বড় গুণ হল, মেঘনাদ না থাকলেই গেদোমালের ময়দার খামি দিয়ে, চিত্ হ'য়ে শুয়ে থাকা উলঙ্গ মেয়েমানুষের মুর্তি তৈরী করবে। সবাইকে ডেকে দেখাবে আর মুর্তি থেকে খাবলা খাবলা তুলে, ওজন করবে, ছাপ কাটবে। বলবে, 'শালা মেয়েমানুষ সব রুটি হয়ে গেল। খা কত খাবি।'

এ দৃশ্যে মিস্তিরি কারিগর, সবাই হেসে মরে। হাসে, তবু বুড়ো ইদ্রিস বলে, 'হেই খোদা, উল্লুকের দোষ নিও না।' কিন্তু বাদবাকী সবাই বদনের এই খেলায় জমে যায়। নুরুল আর ইদ্রিস, বাপ-ব্যাটা চোখাচোখি করে। ইদ্রিসের চোখে খবরদারি, এই দেখে যেন ব্যাটা আবার মেয়েপাড়ায় ছুটে না যায়। ঘরে তার সোহাগী বিবি রয়েছে।

তবু আধো অন্ধকার তন্দুর ঘরে, তন্দুরের আগুনের লাল আলোয় এই

মানুষগুলিকে মনে হয়, নরকের প্রেত। ময়দার মেয়ে মূর্তির দিকে তাকায় যেন, বুভুক্ষু শেয়ালের মত।

গদাধর বলে একটি রিক্রুট আছে হরিহরের, গেদোর কারিগর। সে আবার কোন কোন সময় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওই মূর্তির উপর। তখন সকলের গলা থেকে একটি মিলিত শব্দ ওঠে। হাসির শব্দ নয়। ভীত চমকিত সেই শব্দ অস্ফুট আর্তনাদ। শুধু চালিস্ চেঁচিয়ে বলে, 'শালা খচ্চড়, দাঁড়া, মালিককে আমি বলে দেব।' বলে সে দিয়েছে অনেকবার। মেঘনাদ ধরতে পারেনি একদিনও।

হরিহর বলে, 'বেশ তৈরী করিস্ মাইরী। কেষ্টনগরের আর্টিস্টের থেকে কড়া আর্টিস্ট তুই। একে বলে স্কালপ্‌চারিস্ট। একে ময়দা, তায় মেয়েমানুষ। লাইফ দিতে পারিসনে, যাকে বলে প্রাণ ?'

বদন বলে, 'প্রাণ নেই বলেই তো এটা ভাল। থাকলে আর এত খাবলা খাবলা খেতে হত না।'

লীলাবেকারীতে জমজমাটি আসর বেঁধেছে হরিহর। মেঘনাদ এদের সব কিছু বোঝে না। কিন্তু আন্দাজ করে, হরিহরের আছে একটি মধুচক্র। সিরাজ দিঘার কারখানার অনেকে বেশ্যাবাড়ি যেত। কাজের সময় কারিগর কম পড়ত তার। ছুটে যেত বারোবাসরের পাড়ায়। ধরে নিয়ে আসত, ঘাড়ে ধরে। দরকার হ'লে রাগের মাথায় দু' এক ঘা কষাত। এখানে সেসব তো আছেই, তার উপর আছে সিনেমা দেখা। সোজাসুজি মেঘনাদের কাছেই পয়সা চেয়ে বসে।

সেইজন্য মাঝে মাঝে বিজয়ের দরকার হয়। অথচ নুরুল ইদ্রিসের দলকে কিছুই বলতে হয় না। খামির দলা নিয়ে মেয়েমানুষ করার ব্যাপারটা একদিন মেঘনাদের সহ্যের সীমা ছাড়াল। একদিন বদন মেয়েমানুষের মূর্তি করে, গায়ে লিখে দিল লীলা। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'নে, কে এবার বিন্‌চৌ হবি, চলে আয়।'

জানত না, মেঘনাদ আছে কাছাকাছি। সে এসে দাঁড়াল সেখানে। হরিহর তাড়াতাড়ি বলল, 'এই যে স্যার, আপনি এসে পড়েছেন। চলে চলুন এখান থেকে, এ সব ছোটলোকের কাজ।'

খামির মুর্তির নাভির কাছে লেখা রয়েছে লীলা। মেঘনাদের মুখটা ভয়ংকর হয়ে উঠল। সম্মান বাড়াবার জন্য কোনদিন লালায়িত ছিল না সে। কিন্তু যন্ত্রণা সম্মান বোধের ধার ধারে না। সে হঠাৎ বদনকে দু'হাতে টেনে তুলে, প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের বাইরে।

বদন একবার চীৎকার ক'রে উঠল, 'ওরে বাবারে।'

হরিহর বলল, 'মার্ডার হয়ে যাবে স্যার।'

কিন্তু আশ্চর্য! মেঘনাদ শুধু শান্ত গলায় বলল, 'ইদ্রিস্ মিঞা, কাজে হাত দেও, দাঁড়িয়ে থেক না।'

হরিহরকে বলল, 'আপনি অফিসে যান।'

ঃ ইয়েস স্যার। কপালে হাত ঠেকিয়ে লেংচে লেংচে চলে গেল হরিহর। বদন ততক্ষণ পালিয়েছে। অনেকে খুশী হল, কিন্তু একটা ভয় ভয় ভাব গেল না।

আর মেঘনাদ ছিটের তন্দুরের পেছনে গিয়ে বসে পড়ল মাজা ভাঙ্গা সাপের মত। আর এতদিন বাদে তার প্রথম মনে হচ্ছে, মনে যেন তার সে বল নেই, দেহে তেমন শক্তি নেই। বুকটা অষ্টপ্রহর টন্‌টন্ করে।

তারপর, এখান থেকেই চোখে পড়ে, ধুলো পড়া মেশিনটা। অমনি শিরদাঁড়ায় বিদ্যুৎ ঝিলিক অনুভব করে। ছুটে এসে, ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে আরম্ভ করে। এখনো কত কাজ বাকী। এই তো সবে শুরু। এখনই ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন।

রাত্রি তখন বারোটা হবে। চালিস্ সিনেমা দেখে ফিরছে। দেখল, মালখানার পেছনের দরজা থেকে এক বস্তা ময়দা মাথায় ক'রে কে বেরুচ্ছে। কি ক'রে সম্ভব। মালখানার চাবি তো মেঘনাদের কাছে থাকে।

তারপর দেখল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ল্যাংচা হরি।

দরজাটা অদ্ভুত কায়দায় বন্ধ করে, ফিরতেই দূরে দেখতে পেল চালিস্‌কে। কাছে আসতেই চালিস্ বলল, 'দরজা কি করে খুললে ম্যানেজারবাবু।'

হরিহর বলল, 'কিসের দরজা খোলা। বাড়ি যাওয়ার আগে সব দেখেটেখে যাচ্ছি।'

ঃ আর ময়দাটা যে গেল বদনের মাথায়। চুরি করে নিয়ে ব্ল্যাক কর তুমি?

খপ্ করে চালিস্‌কে ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চলল তন্দুরের ঘরে। বলল, 'চল্ শালা, তোকে তন্দুরের মধ্যে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারব আজ।'

কিন্তু তার আগেই চালিসের গলা টিপে ধরল সে। চালিসের গলায় স্বর নেই। বেড়ালের মুখে ইঁদুরের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগল সে। হরিহর বলল, 'কর্তাকে বলবি?'

কোন শব্দ নেই। হরিহর ছেড়ে দিল। দিতেই চালিস্ তীব্র চীৎকার ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল। গেল একেবারে মেঘনাদের কাছে। মেঘনাদ সব শুনে তখুনি এল। এসে দেখল, সব যেমন বন্ধ ছিল, তেমনিই আছে। চালিস্‌কে বলল, দরজার কাছে বোস্।

বলে সে নিজে বাতি জ্বালিয়ে বসল খাতাপত্র নিয়ে। গুনে গুনে দেখল ময়দা আর চিনির বস্তা। খাতার হিসাব খুলে বলল, আশ্চর্য! হিসাব রাখে তার শ্বশুরমশাই নকুড়, সেখানে তো কোন গণ্ডগোলই নেই।

ইতিমধ্যে নুরুল ইদ্রিস এরাও এসে বসেছে কাছাকাছি।

পাইকেরদের খাতা খুলে চক্ষুস্থির মেঘনাদের। একশ'র উপর পাইকেরের নাম উঠেছে খাতায়। আর প্রত্যেকের নামেই বাকী মোটা মোটা টাকা। তিন মাসের মধ্যে কুল্যে প্রায় পাঁচহাজার টাকা পড়ে আছে তাদের কাছে।

লালমিঞার কথা মনে পড়ছে। নিজের হাতে হিসেব কষবি, দেখবি লাভ লোকসান। আশ্চর্য! যে নকুড়েরর ভরসায় হিসেব দেখেনি সে, সেই নকুড় তাকে একটি কথাও বলেনি। বেমালুম হরিহরের কথায় কাজ করে গেছে।

আর মাসখানেক এইভাবে চালালে, সমস্ত আশা ভরসা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মেঘনাদ ইদ্রিসকে বলল, 'ইদ্রিস, তোমরা শুতে যাও। আমি রাতে থাকব এখানে।'

ইদ্রিস বলল, 'বাবু, বড় তখলিফ হচ্ছে আপনাকে দেখে। আমাদের কিন্তু কোন গোস্তাকি নেই।'

মেঘনাদ হাসল। এমন নিদারুণ হাসি, আর কেউ কোনদিন দেখেনি। বলল, 'সে কি আমি জানি না ইদ্রিস্। জানি না শুধু, আমার সামনে কি আছে। জানি না শুধু, যা চেয়েছিলাম, তা' করতে পারব কি না।'

সবাই গেল। চালিস্ বসে রইল। মেঘনাদ বলল, 'তুই গেলিনে?'

চালিস্ চুপ। মেঘনাদ বলল, 'ঘুম পায়নি নাকি রে?'

চালিস্ কাঁচা মুখ বুড়োটে ক'রে বলল, 'কত্তা, ওই ল্যাংচা ম্যানেজারকে যদি আপনি না তাড়ান, তা'হলে সব্বোনাশ হবে।'

মেঘনাদ হিসাবে ডুবে গেল হাসতে হাসতে।

সকালবেলা বিনয় এল। হরিহর গিয়ে তাকে সব বলেছে।

মেঘনাদ বলল, 'আপনার ম্যানেজারবাবুকে আর চাইনে।'

বিনয়ের চোখে অন্যমনস্কতা। বলল, 'হরিহর বলছিল, ও চুরি করেনি। যদি চুরি কেউ ধরে দিতে পারে, সে কান কেটে দেবে।'

মেঘনাদ বলল, 'কান কাটার দরকার নেই। আমি তাকে রাখব না আর বিনয়বাবু।'

বিনয়ের চোখ বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। কিন্তু ঠোঁটের পাশে কঠিন রেখা দেখা দিল। অদ্ভুত দৃঢ় গলা শোনাচ্ছে মেঘনাদের। এমন গলা আর কোনদিন শোনেনি মেঘনাদের।

বিনয়ের সমস্ত চেহারার মধ্যে একটি নিশিজাগা উশৃঙ্খল ছায়া পড়েছে। তাকে দেখাচ্ছে একটু বেশী বয়স্ক। সে খালি বলল, 'বেশ, তাই হোক।'

তারপর প্রতিটি পাইকেরের মুখোমুখি হল মেঘনাদ নিজে। কিন্তু অর্ধেকের উপর পাইকেরের কোন পাত্তাই নেই।

সকাল গেল। দুপুরও যায় যায়। রাজীব আর তিলিদের বাড়ি থেকে যায় না।

তিলি বলল, 'বাড়ি যাবেন কখন ?'

রাজীব বলল, 'এবার যাব ঠুমি। বিনয়বাবু আবার আমাকে কমিটিতে নিতে চাইছেন। ভাবছি, যাব, গিয়ে আমি ওর শোধ নেব।'

তিলি বলল, 'তাই নিনগে।'

ঃ একটা কথা ছিল ঠুমি—

বিরক্তি ফুটে উঠল তিলির মুখে। বলল, 'বলুন।'

ঃ কাউকে বলবে না ?

ঃ না।

রাজীব একটু কাচুমাচু ক'রে বলল, 'তুমি বলেই বলছি। হয় তো বিনয়দা'র সঙ্গে আমার আবার মিল হয়ে যাবে! তা'ছাড়া আমার আর রাস্তা নেই। বাহান্ন সালে না দাঁড়াতে পারি, সাতান্ন সালেও আশা আছে। কিন্তু তোমাকে না ব'লে গেলে···জানো···আমার হাত দিয়ে মেঘনাদবাবুর একটি সর্বনাশ হয়েছে।'

ভয়ে ও রাগে ক্ষ্যাপা সিংহিনীর মত ফিরে দাঁড়াল তিলি, 'কার সর্বনাশ ? বোনাইয়ের ? কী সর্বনাশ বলুন।'

তিলির মুর্তি দেখে রাজীব ঘাবড়ে গেল। এমন মূর্তি কোনদিন দেখেনি সে। ভাবেওনি, এমন মূর্তিও আছে ঠুমির মধ্যে।

সে এক পা' পেছিয়ে বলল, 'সেকথা আমি বলতে পারব না ঠুমি।'

তিলি প্রায় ঝাঁপ দিতে এল রাজীবের উপর, 'তবে বললেন কেন ?'

রাজীব আরো পেছুল। বলল, 'মেঘনাদবাবুকে তুমি একটু সাবধানে কাজ করতে ব'লো। আমি আর কিছু বলতে পারব না।'

ব'লে সে বেরিয়ে গেল। তিলি পাগলের মত ছটফট করতে লাগল। সর্বনাশ! আর কত সর্বনাশ থাকতে পারে। বউ যার পায়ের তলার মাটি খাচ্ছে দিবানিশি সর্বনাশী নদীর মত, তার আরো কত সর্বনাশ আছে। আরো কতদিন এ পাপ পুরীতে থাকতে হবে। বোনাই কবে তাকে বিদায় করবে। এতদিন বাদে অমর্ত মুদী টাকার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। সেই টাকা, বিজয় মেঘনাদ

বাবা মা, কারুর কাছে চাইতে পারছে না তিলি। অমর্ত সেই চিরকালের ইশারা-ই করছে। একদিন, একটি রাত্রি…

রাত্রি অনেক। বসন্তের আবির্ভাব ঘটছে। এ বাড়ির টিনের চালায় বাতাস কেটে কেটে যাচ্ছে। পত্রহীন রিক্ত পিপুল। যেন বনস্পতি পিতৃদশার বেশ ধরেছে।

তিলি দেখছে, লীলা পায়চারি করছে বারান্দায়। রাত্রে, মেঘনাদ আজকাল আর বাড়ি থাকে না। লীলা মধ্যরাত্রে উঠে রোজ বাইরে আসে আর পায়চারি করে। সন্ধ্যা হ'লে বিনয়ের বাড়ি যায় প্রায়ই।

বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের দিকে গেল লীলা। সবাই ঘুমোচ্ছে। তিলি উঠল। দরজা খুলল নিঃশব্দে। দেখল উঠোনের পেছনে, শজনেতলা দিয়ে যাচ্ছে লীলা। তিলি গেল পেছন পেছন।

সামনে মাঠ, কয়েকটি গাছ, আশেপাশে আঁসশেওড়ার ঝোঁপ। লীলা ধীরে ধীরে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে লীলা। বিন্‌চৌ-এর বাড়ি তো ওদিকে নয়। তিলির ভয় করছে। লীলার জন্য ভয়, আশেপাশের মানুষের চোখকে ভয়।

লীলা গিয়ে দাঁড়াল জংলা পুকুরের ধারে। নড়ে চড়ে না, নিশ্চল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে জলের দিকে।

তিলি এসে দাঁড়াল কাছে, কথা বন্ধ দুই বোনের। তবু তিলি বলল, 'এখানে এসেছিস্ যে রাত্রে। মরতে নাকি?'

অন্ধকারেও জ্বলছে লীলার চোখ। অবাক হয়ে খালি দেখল তিলিকে। বলল, 'না, বেড়াচ্ছি।'

তিলি বাঁকা হেসে বলল, 'বিন্‌চৌ-এর পীরিতের এত জ্বালা?'

পীরিতের জ্বালা! অদ্ভুত হাসল লীলা।

তিলি হঠাৎ বলল, 'গয়নার বাক্স কি করেছিস্, কোথায় রেখেছিস্?'

: দিয়ে দিয়েছি বিন্‌চৌকে।

তিলি জানত, গহনার বাকস্ লুকিয়ে রেখেছে লীলা। কিন্তু বিন্‌চৌকে!

কেঁপে উঠল তার বুকের মধ্যে। সে ভুলে গেল রাত্রি, বাইরের এই জংলা পুকুরের ধার। বলল, 'সব?'

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তবে তুই মর্ এই পুকুরে ডুবে, আমি দেখি। মর্ মর্, তোর পায়ে পড়ি মর্। যেন আর একটা লোকের মরণ তুই চোখে দেখতে না পাস্। তাতে তার মরেও লজ্জা।

আর একটা লোক হল মেঘনাদ। বলল লীলা, 'মরেই তো আছি।'

তিলি হঠাৎ বলল, 'কাউকে ভালবাসলে কি মানুষ এমনি হয়? এমন রাক্ষুসী। বিন্‌চৌকেও কি ভালবাসিস্‌নে।'

ভালবাসা! এই সংসারে ভালবাসা! দেহ ছারখার ক'রে দাও, মন পুড়িয়ে দাও, সোনা-দানা-ঐশ্বর্য, যা আছে সব বিলিয়ে ছড়িয়ে ধ্বংস করে দাও। তবু নিজের বুকে সব শূন্য। চারদিকে বিলোল কটাক্ষ, বিষণ্ণ ব্যাকুলতা, চারদিকে ফিস্‌ফিস্, ভালবাসা, ভালবাসা! সবটাই দারুণ ধ্বংসের মন্ত্র।

সব পুড়ুক, নিজে পুড়ুক, এ বিশ্ব পুড়ুক। জীবন কখনো ভরে না। মন কখনো ভরে না। বিন্‌চৌ। একদিকে তার লোভ, আর একদিকে ভয়। আগুন নেই মনের কোথাও। সমস্তটাই ছাইয়ের উত্তাপ। শ্মশানের বিষন্নতা তার চোখে।

তিলি বলল ফিস্‌ফিস্ ক'রে, 'তুই মরছিস্ মর্। কিন্তু আর যাকে মারছিস্, এ সংসারে তার দাম অনেক বেশী।'

লীলা বলল, 'বোনাইকে বিয়ে কর তুই।'

তিলি বাধা দিল না তার কান্না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, 'ওলো রাক্ষুসী, সে কপাল আমি করিনি। সে সৌভাগ্য আমার জন্মে নেই। তার অতবড় বুকটার সবটুকু যে সে তোকে দিয়ে বসে আছে। নইলে তাই করতুম, তাই চাইতুম।' তিলি বাড়ি ফিরে এল। লীলা জলের কাছে এগিয়ে গেল আরো।

লীলার চোখে আবার বিন্‌চৌ। চোখে যার অভুক্ত প্রেতের বিষণ্ণতা। যার

ছায়া পড়ে না কোথাও। মাটিতে, মনে, কোথাওনয়। একটি নিঃস্ব জঞ্জাল। কাকে বোঝাবে একথা লীলা। তার মত মেয়ে কি আর আছে এই দেশে, এই সমাজে, যে হৃদয়ের কারবারে গোপন করেনি নিজেকে লোকচক্ষুর কাছে। স্বামী, বাপ, মা ভাই, বোন, কারুর কাছে ফেরেনি লুকিয়ে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সবই পায়ের তলায় রেখে যে, এই যুগের পরকীয়া ব্যভিচারে নেমেছে। নেমেছে, কিন্তু সোনাদুলির লতাই খালের ধারে যে আগুন জ্বলছিল, তা' নিভল না। কী ভীষণ একা সে। এ সংসারে কি তার মত দুটি নেই! থাকলে তারা কি করছে, কেমন ক'রে বেঁচে থাকছে, জানতে বড় সাধ হয়।

লীলা গোপন করেনি তার ক্ষুধা, বাসনা, অভাব। কিন্তু পৃথিবীতে, এইটুকু শক্তি, এইটুকু মহত্ত্বও কি কারুর নেই, যে কিছু নিয়ে কিছু দিতে পারে। যা চায় লীলা তার সামান্যতম বস্তু;

ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে উঠল লীলার শরীরে। কি অদ্ভুত ভীরু, দুর্বল, নীচ অথচ, সাজানো গোছানো অমায়িক ওই বিন্‌চৌয়েরা। ওকে সোনাগুলি দিয়ে তার জ্বালা যেন একটু কমেছিল। একটি সোনার হার দিয়ে বিন্‌চৌ-এর গলায় ফাঁস লটকালেও লোকটা আরামে হয়তো মরে যেত। আপনা থেকে বমি করে উগরে দিত হয় তো প্রাণটা!

তার কাছে কি চেয়েছিল লীলা! কী! লীলা নিজে কেন ছায়াহীন, রক্তহীন প্রেতিনী হতে পারল না। তবে বিন্‌চৌয়ের মরা ডালে বাস, নরকের সংসার পাততে পারত সে।

এত যে আগুন, এত যে জ্বালা, তবু মানুষের মন, মেয়ে মানুষের মন কেন বাসা বেঁধে রয়েছে সেখানে। যেখানে জীবন, সংসার, শান্তি অনেক দুঃখেও চোখের জলে যেখানে হাসির মেলা।

দূরে ভেসে উঠল একটি মূর্ত্তি। যার কাপুরুষতা নেই, ভাঁড়ামি নেই, পুতু-পুতু ক'রে কোন কিছু ধরে রাখবার দুর্বলতা নেই। যে চাইলে দিতে জানে, জানে না দিতে শুধু লীলাকে। যে তাকায়নি লীলার দিকে, ফেলে দিয়ে গেছে আঁস্তাকুড়ে। যার কাজ যার বুকের আগুন, আর সব আগুনই ছাই ক'রে

দিয়ে গেছে।···সেই মেঘনাদ! মেঘনাদ!···মুখটা মনে পড়ছে না লীলার। সামনে দিয়ে শেয়াল যাতায়াত করছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে নিশাচরী পাখি।···কিন্তু মুখটা মনে পড়ছে না তো। মুখটা, সেই মুখটা কেমন দেখতে। একটি কচি মুখ, শিশু, লীলার সেই মৃত সন্তানের মত! না না না, তবে! সেই মুখটা কেমন! গোঁফদাড়ি হীন, থল্‌থলে মাংস, জুলজুলে চোখ, নরকরক্ষীর মত? না না না···

চীৎকার ক'রে উঠতে গিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিল সে।

আজ তাকে তিলি চায়! চব্বিশের অনূঢ়া বুকে এই বুঝি প্রথম দাগ, যাকে বলেছিল সে, তোর কি আছে, তুই কি বুঝবি?

সত্যি তিলি কী বুঝবে, কী বুঝবে তার!

বিনয় ডেকেছে একবার মেঘনাদকে।

বিনয় বসেছিল বাইরের ঘরে। পিওন এসে একটি রেজেষ্ট্রি চিঠি দিয়ে গেল, সই করিয়ে। খুলল বিনয়। উকিলের চিঠি। অবাক হল সে। কলকাতার উকিল লিখছে, আমার দিল্লীবাসিনী মক্কেল শ্রীমতী সুলতা দেবী, তাঁর সন্তানসহ কেন আলাদা বাস করিতে পারিবেন না,·········তারিখের মধ্যে তার কারণ জানাইবেন।

আলাদা! সেপারেশন্! আর আসবে না কোনদিন সুলতা! আশ্চর্য! ভয় ও ব্যথায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল বিনয়ের।

কিন্তু সামনে তাকিয়ে দেখল, যেন অবিকৃত মুখ সুলতার। তেমনি নির্বিকার শান্ত। যেন বলছে, দশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি, তুমি ফিরতে পারলে না। তোমার দেওয়া সমস্ত অপমানে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়েছি, তবু প্রহর গুনেছি। দিন চলে গেছে, আর পারিনে। কিন্তু কই, সুলতা তো ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছে না, বিদ্রূপ করছে না। খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ঠাট্টা করছে না তাকে নিয়ে বন্ধুমহলে! তবু কী কঠিন মুখ তার, কী ভয়ংকর নির্লিপ্ত চাহনি। এত কঠিন যে, ছেড়ে যাওয়ার এই শেষ মুহূর্তেও উকিলের চিঠির মতই, নিবের

ডগায় খস খস্ শব্দের মত বলছে, যেখানে তোমার ছায়া, সেখানে আর যাব না।

অনেক দিন আগের সেই সব দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। আর বুকের মধ্যে কন্‌কন্ করে উঠছে। হয় তো, বিবাগী, বৈরাগিনী, এই ব্যর্থ স্থূলতার কাছে আজ আবার কেউ আসবে, কোনও নবীন মানুষ। যে তার দুই ছেলের মায়ের বুকে আবার রং ফোটাবে।

জ্বর বিকারগ্রস্থ মনে হাত লাগল নিজেকে। মনে হচ্ছে, লীলা হাসছে তার সামনে দাঁড়িয়ে। হাসছে নিঃশব্দে, শাণিত চোখে। যে চোখ বিন্‌চৌ ত্রর ভালবাসার ছায়াহীন প্রেত প্রাণটাকে আজ উল্‌টে পাল্‌টে দেখতে পারে। যে তার প্রাণের আগুন নেড়ে চেড়ে দেখেছে শুধু ছাই সর্বস্বতা।

হঠাৎ একটি মস্ত বড় ছায়া দেখে চমকে উঠল বিনয়। দেখল মেঘনাদ এসেছে। এক মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। পরমুহূর্তেই অতিরিক্ত উৎসাহে, দৃঢ় গলায় বলল, 'বসুন।' মেঘনাদ বসল। বিনয় আরো কয়েক মিনিট যেন কিছু ভাবল। তারপর দ্রুত গলায় বলে উঠল, 'পারমিটটা আমার কাছে রয়েছে।'

: হ্যাঁ।

: আপনি জানেন বোধহয়, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট বিস্কুট ম্যানুফ্যাক্‌চারিং বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য, আমাদের পারমিটে তা বন্ধ হয়নি।

মেঘনাদ বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে না, বিনয় কি বলবে।

বিনয় বলল তার বিষণ্ণ চোখ তুলে, 'একটা অন্যায় হ'য়ে গেছে। সেজন্য আপনাকে আমি তিন হাজার টাকা দেব।'

তিন হাজার টাকা। ভেতরটা গুড়গুড় করছে মেঘনাদের। কিসের অন্যায় আবার।

বিনয় বলল, 'পারমিটটা রাজীব আমার নামে করিয়ে এনেছিল।' কথাটি বলার আগে ভিতরে ভিতরে বিনয় প্রস্তুত হয়েছিল একটা ভয়ংকর কিছুর জন্য। কিন্তু আশ্চর্য। কিছুই হল না।

মেঘনাদ তেমনি নিষ্পলক তাকিয়ে রইল বিনয়ের দিকে। ভেতরে তার আগুন লেগেছে। চকিত বজ্রপাতে, কিছু অনুভব করার আগেই যেন সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর সেই আগুনের আভায় মুখটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত লাল হয়ে উঠেছে।

বিনয় মেঘনাদের দানবীয় শরীরটার দিকে তাকিয়ে শক্ত হ'য়ে উঠল। যেন পালাতে পারে সুযোগ মত। বলল আবার, 'ঘুষের টাকাটা আপনাকে আমি দিয়ে দেব। অবশ্য তিন বারে দেব টাকাটা। কিন্তু ব্যবসায় আমাকে অর্ধেক অংশীদার ক'রে নিতে হবে। নইলে পারমিটটা দিয়ে আমি নিজেই ....'

মেঘনাদ তাকিয়ে দেখল, সামনে বিনয়ের সেই চোখ। মনে হল, এ তো বিষণ্ণ নয়, শ্মশানের কুকুরের চোখ। শ্মশানের ছাইগাদায় পড়ে থাকা, শবভুক ঢুলু ঢুলু চোখওয়ালা কুকুর। চোখে তার শবের স্বপ্ন, পোড়া মাংসের নেশায় জুলজুলে।

তার সমস্ত বোধশক্তি কয়েক মুহূর্তের জন্য লোপ পেয়ে গেল। তবু তার সারা শরীরের পেশীতে পেশীতে একটা অদ্ভুত বোবা উত্তেজনা পাক খেয়ে উঠল। তার মাথার মধ্যে একটা বিষধর পোকা বোঁ বোঁ করে পাখা ঝাপটাতে লাগল, তুই বোকা, মূর্খ, এ সংসারের অনুপযুক্ত।

সে উঠে দাঁড়াল। ভয়ে বিনয় আরো শক্ত হল। তার কোন কথা জিজ্ঞেস করতেও সাহস হল না। মনে হল মেঘনাদ যেন ফুলছে। ফুলতে ফুলতে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়।

মেঘনাদ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ যেতে পারল না। মনে হচ্ছে, তার যেন কিছু করার রয়েছে এ ঘরে, নিদারুণ কিছু বলার আছে বিনয়কে।

কয়েক মুহূর্ত শুধু বাইরের পথচারীদের টুকরো কথা শোনা গেল।

তারপর হঠাৎ আর একবার সেই সন্ত্রস্ত জুলজুলে চোখ দুটো দেখে মেঘনাদ বেরিয়ে এল রাস্তায়।

এই রাস্তা, উত্তরে দক্ষিণে লম্বা। শ্রীহীন বস্তি, ছন্নছাড়া কতকগুলি দোকান,

ধূলায় ধূসর এই রাস্তা কতদিন সে দেখেছে। আজ যেন অচেনা অচেনা লাগছে। ভূতগ্রস্থ মানুষের মত অনেকখানি হেঁটে চলে গেল দক্ষিণে।

কারখানার পর কারখানা। কী বিরাট আর বিশাল! ভলকে ভলকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে চিমনী দিয়ে। মেঘনাদের মনের মধ্যে কে যেন চীৎকার করছে, এই কারখানাগুলি তবে হল কি ক'রে। সে কেন পারল না, কী দোষ ঘটেছিল তার।

: কে? মেঘু নাকি?

মেঘনাদ তাকাল। বোধহীন দৃষ্টি। তাকিয়ে মনে হল, যেন গত জন্মের চেনা মানুষ তার সামনে। দেখল, নসীরাম গণৎকার। বেঁচে আছে আজো! তিন মাথা এক হয়েছে। পাকাচুল যেন আবার কাল্‌চে হচ্ছে। বসেছে রাস্তার ধারে। পিজ্‌বোর্ডে লিখে রেখেছে, 'বাস্তহারা গণৎকার, বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ্‌। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

নসীরাম বলল, 'আহা হা, অনেকদিন বাদে দেখলাম বাবা তোমাকে। আরে আরে? তোমার কপালে যে মা লক্ষ্মীর সোনার আসন আঁকা দেখছি। ধনপতি সওদাগরের ভাগ্যরেখা দেখছি তোমার কপালে। বস বাবা, একটু হাতটা—'

বলতে বলতে থেমে গেল নসীরাম। চোখ পড়ে গেল মেঘনাদের চোখে। মনে হল, তার শতোত্তর গণৎকার বুকে এমন তীব্র খোঁচা আর কখনো খায়নি সে। তার বলীরেখা চামড়া কুঁকড়ে উঠল সর্বাঙ্গের। ভয় হল, মারবে নাকি মদনসা'র বেটা মেঘু।

আবার তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে সিরাজদিঘার কথা বলতে আরম্ভ করল। মা, গদী, ব্যবসা, হিন্দু, মুসলমান।

মেঘনাদ ফিরে এল। কোন কথা, কারুর কথাও জিজ্ঞেস করল না। কেবল মাথার মধ্যে কতগুলি কথা কোলাহল করতে লাগল।

ধনপতি সওদাগর। বদর বদর ডিঙ্গা যায়, শতেক বৈঠা ছপ্‌ছপ্‌ পড়ে। সাতসাগরের জলে কেন মাটি ঠেকে যায় বৈঠায়। আখ্‌ আখ কি হল। জল

নেই, সাতসাগর শুকিয়ে বালি। এ কার কোপ্। মনসা জল শুষেছিল চান্দের, ধনপতির লক্ষ্মী। দেবীর কোপ্ প ড়ছে।

আর মেঘনাদের উপর কোপ পড়েছে কার। লীলার মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। না, না, সে তার কিছুই করেনি। সে যা করেছে, তার নিজের জন্য করেছে। মেঘনাদের সমস্ত কাজের কাছে সে তুচ্ছ। মেঘনাদ তো কারুর প্ররোচনায় কাজ করেনি। কাজ করেছে নিজের বিশ্বাসে, উৎসাহে।

তবে? তার কেন এমন হল। মনে পড়ল বাবার কথা, গদীতে বসা লক্ষ্মণসা'য়ের কথা।···তারই পাশে পাশে মেঘনাদের আশা। বোধহয় ভুল হয়েছে। হয় তো তার জীবন ছিল ঘুন্সীতে চাবি বাঁধা, হরিনাম সার করা, সিন্দুকরক্ষী সাহা মহাজনের পচা জীবন। যে জল খাবে বাতাসার ছায়া দেখে। যার পিঠের ঘামাচি মেরে দেবে হিসাবরক্ষক তার কলমের নিব্ দিয়ে। যে বাজারে থাকবে মেয়েমানুষ নিয়ে, বাড়ির মেয়েরা ডাকবে রজক, নরসুন্দর, চাকর-বাকরকে। পয়সা যার হরি, রাধাকৃষ্ণ, খোলকরতালের মিঠা বুলি।

কিংবা হয়তো লেখাপড়া শেখেনি ব'লে হেরে গেল এ সংসারে। এ যুগের সীমান্তে ঢুকতে, যে রাস্তা পার হতে হয় পলে পলে, অনেক কষ্টে, সেই পথ পার হতে পারেনি সে।

কিন্তু তা-ই কি সব। বিনয় না হ'য়ে, তার জায়গায় যদি একজন অবিদ্বান এই চক্র সাজিয়ে বসত, তা'হলে কি সর্বনাশের চেহারা কিছু সুন্দর হত। মূর্খের শয়তানী, সেও যে ভয়ংকর। শয়তান শয়তান, তার বিদ্যা অবিদ্যা নেই।

কিন্তু কারখানার আশা! মেশিনের কারখানা, আধুনিক যন্ত্র, তার গর্জন, নতুন কাজ, অনেক মানুষ, আজকের মানুষ, এ-ই তো প্রাণভরে চেয়েছিল সে।

কারখানায় এসে উঠল মেঘনাদ। কাঠ নেই, ফুরিয়ে গেছে। তন্দুরের চিতা জ্বলবে না। ছিটের কাজ বন্ধ। ময়দা নেই। ময়দা নেই

কোথাও। কয়েক হাজার টাকা বাকী পাইকেরদের কাছে। সে পাইকেররা ভূত কি মানুষ, কেউ জানে না। তারা সব অদৃশ্যজীব। নতুন ক'রে পারমিট পাওয়া, সে অনেক দূরের জল। তা'ছাড়া বিনয় নিজে এবার কারখানা ক'রবে। সে তার সব কিছুতে বাধা দেবে প্রাণপণে।

মেঘনাদ ডাকল ইদ্রিসকে। বলল, 'ইদ্রিস, বোধহয়, তোমাদের সর্বনাশ করলাম। আমার কারখানা আজ থেকে বন্ধ। আমি আর ব্যবসা চালাতে পারব না।'

সকলে তাকে ঘিরে এল। একে একে শুনল সব কথা। সকলের নতুন পাতা সংসার এই লীলাবেকারীতে। সব চলে যেতে লাগল।

কেবল চালিস্ পিতৃমাতৃহীন ছেলেটার মত দাঁড়িয়ে রইল। মেঘনাদ বলল, 'চলে যা, নইলে না খেয়ে মরবি।'

চালিস্ বলল, 'কত্তা, আমি থাকি। এরপর পাঁচসের ময়দার কাজও তো করতে হবে।'

মেঘনাদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপরে বাড়ির দিকে চলল।

খেতে দিয়ে তিলি অবাক হয়ে গেল। যত দিচ্ছে, ততই খেয়ে যাচ্ছে বোনাই। একবারও না করছে না। এত ভাত তো কোনদিন খায় না।

বলল, 'বোনাই, কি হয়েছে?'

: কেন?

: তোমাকে অন্যরকম লাগছে। তোমার তো কোন দুঃখই বাকী নেই। তবে? তোমার কি হল আবার?

মেঘনাদ বলল সব কথা তিলিকে। তিলি পাথরের মত জমে গেল। মনে পড়ল রাজীবের কথাগুলি।

তারপর একে একে সবাই শুনল।

সন্ধ্যাবেলায় বিজয় এসে বলল, 'কি হবে বোনাই?'

মেঘনাদ বলল, 'পারলাম না বিজয়।'

একটু থেমে বলল, 'বিজয় তোমাকে বলেছিলাম, যন্ত্রের কারখানা করব। পারলাম না। আমি চুরি করতে পারলাম না, জোচ্চোরি করতে পারলাম না, শয়তানী করতে পারলাম না। এ দেশে, এ সময়ে, আমি যন্ত্রের কারখানা কেমন ক'রে করব। কিন্তু কোন কাজ শিখিনি আর জীবনে। সওদাগরিও হল না আমার। আমাকে এবার একটা ছোট হাত তন্দুর করতে হবে।'

বিজয় বলল, 'বোনাই, 'একটা কথা বলব ?'

: বল।

: জানি তোমার অনেক দুঃখ। এত বড় মার আমি খেলে পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু এই কারখানা, যন্ত্র, এসব ছাড়া কি আর তুমি কিছু চাও না জীবনে ?

: বিজয়, তুমি কিছু কি চাও না এই মিস্তিরিগিরি ছাড়া।

: চাই বোনাই, সেই তো আমার জীবনের যন্ত্রণা। মানুষ বলে এই কি আমার পরিচয় যে, শালা বিজা মিস্তিরি। না, হেস না বোনাই। আমি বড় হতে চাই। মিস্তিরির কাজে আমার ঘৃণা নেই। কিন্তু আমি শুধু মিস্তিরি। এ অপমান আমার সয় না। তবু সইতে হয় আমার জ্ঞান নেই, লেখাপড়া নেই। বেশ্যাবাড়ি ব'লে ভুল ক'রে আমার বাড়িতে লোকে ঢুকে পড়ে, শালা এমন আমার থাকবার আস্তানা। বোনাই, ধর্মে কর্মে, রাস্তায় ঘাটে, আর এই পেট, সব নিয়ে আমার শুধু অপমান। আমি যে অনেক কিছু চাই।

মেঘনাদ বলল, 'আমিও তাই চেয়েছিলাম বিজয়। পুরনো ছেড়ে নতুন, নতুন জ্ঞান, শিক্ষা, কাজ, জীবন সবই আরও সুন্দর, আজকের যুগে যার সম্মান আছে, আমি তাই চেয়েছিলাম আমার সর্বস্ব দিয়ে।'

বিজয়ের খালি মনে হল, নতুন কাজ, সম্মান, সেসব কিছুই নয়, শুধু মুনাফা আর মুনাফা।

কিন্তু বোনাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা তার টনটন করে উঠল শুধু। লোভী আর মুনাফাখোর মানুষকে তো বোনাইয়ের মত দেখায় না।

: বড় মহাজন। তা আমি হয়েছিলাম। সিরাজদিবায় আমি বড় গদীর মালিকই হয়েছিলাম। বাড়ি ঘর, নৌকা কারখানা, বউয়ের গায়ে সোনা, সবই করেছিলাম। কিন্তু আমার মন ভরেনি। অমন গদীর মহাজন হওয়ায় বড় ঘেন্না ধরে গেছল। মানুষ হয়ে জন্মেও যদি সংসারের সঙ্গে তাল না রাখতে পারলাম, তবে কি করলাম। হরিনাম দিয়ে টাকা রেখে লাভ কি। যে কারবারে সহোদের অত নাম, অত মান, অত গর্ব, আমার কি তা' কিছুই থাকতে নেই। তবে যদি বল জীবনটাকে আমি টাকা সার করেছিলাম। তা'হলে যদি সা'র ব্যাটা হয়ে আমি গোত্র বদল করতে সাহস করেছিলাম কেন। বিজয়, সংসারে পিশাচেরও টাকা থাকে। কিন্তু আমার বুকের পাটা, আমি নতুন কাজ, নতুন জিনিস করতে চেয়েছিলাম। আর কী যন্ত্রণা। দেখ, এমন মার মেয়েও আমার বুকের পাটা একটু টসকালো না।

তারপর বলল, 'কিন্তু ভুলই হয়তো করেছিলাম। কেন না, নইলে মনে হচ্ছে কেন, একাজে আজ এ দেশে চোর-জোচ্চোর, শহুরে শয়তান না হলে হবে না। নইলে বলি, এ সংসারে কল কারখানারও বুঝি নতুন কোন জন্মান্তর হবে। তা' না হ'লে পাপে যে সংসার ভরে যাবে বিজয়। পাপকে এত ঘৃণা আর কখনো করতে পারিনি। দিন গুনব বিজয়, পাপ কবে শেষ হবে। তবে ......'

হেসে বলল, 'এবার পেট চালাবার পালা। আমাকে আগুন দিতে হবে আবার তন্দুরেই।'

বিজয় অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল বোনাইয়ের দিকে। কথাগুলি বুঝল না, কিন্তু তার মনটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে দিল বোনাই।

দুদিন পর সে লীলার কাছে বলল, 'তোমার কাছে কোনদিন কিছু চাইনি। তোমার সোনা আমাকে দেও, আমি ফিরিয়ে দেব আবার।'

লীলা বলল, 'সে সব নেই!'

: কি করেছ?

: বিন্‌চৌকে দিয়ে দিয়েছি।

বিন্‌চৌকে। হঠাৎ লীলাকে তুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দায়। তিলি চীৎকার ক'রে উঠল. 'বোনাই!'

চমকে উঠল মেঘনাদ। অ্যাঁ, কি করছে সে। মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকে গেল।

ছোট হাত তন্দুর তৈরী করেছে মেঘনাদ নিজেই চালিস্‌কে নিয়ে।

দিন কয়েক পরে মেঘনাদ পাঁচ সের ময়দার ব্যাগ কাঁধে করে ঢুকল কারখানায়। তার গায়ে একটি পুরনো ঝোলা পাঞ্জাবী। হঠাৎ দেখলে মনে হয় রেলওয়ে কুলি। এই পাঁচসের ময়দাও চোরাবাজার থেকে কিনতে হয়েছে তাকে। থামলে একটি দিনও চলবে না। যত কমই হোক, মাল তৈরী করে ফেরী করে বেচতে হবে রাস্তায় রাস্তায়।

লীলা এসেছে কারখানায়। মেঘনাদ ময়দাটা রাখতেই, ব্যাগটা তুলে নিয়ে গেল সে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল মেঘনাদের। দেখল বড় কাঠের পাত্রে ময়দা ভেজাচ্ছে লীলা।

চালিস্ আর তিলি বাইরের থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখছিল। মেঘনাদকে দেখে তাদের বুকের মধ্যে কাঁপছে। কিন্তু ভয় নেই লীলার।

একটি অতিমানবের মত ধীরে পা ফেলে ফেলে মেঘনাদ লীলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে ছোঁ মেরে তুলল লীলার শাড়ী ধরে। রুদ্ধ মোটা গলায় বলল, 'কেন?'

খোলা চুলে লীলার মুখের আধখানা ঢাকা পড়েছে। সেইদিনের আঘাতের দাগ এখনও মুখে। মেঘনাদের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। ঢোঁক গিলছে, কষ্ট হচ্ছে মেঘনাদের থাবায় পাখির মত ঝুলে থাকতে। চিক্‌চিক্ করছে চোখের কোণ দুটি। তবু ঠোঁট দুটি আশ্চর্য রকম টেপা। ভেজা ভেজা চোখের মণিতে এক নতুন ঔজ্জ্বল্য, ভাবে এক বিচিত্র দৃঢ়তা। এই নতুন পরিবেশেও চেনা যায়, এই সেই লীলা। যে ছেড়ে যাওয়ার

জন্য সব করে, ফিরে আশার দিনেও, সে ফিরে আসে তার নিজের মতই। তার ঠোঁটের পাশে, মেঘনাদের সেদিনের আঘাতের দাগ আজ যেন ভালবাসার জয়ের চিহ্ন হয়ে উঠেছে। থেমে থেমে স্পষ্ট চাপা গলায় বলল, 'কাজ না ক'রে আর কতদিন থাকব।'

মেঘনাদের চোয়াল দুটি কাঁপছিল, ঢোঁক গিলছিল। সেও কথা বলতে পারছিল না। লীলার কথা শুনে হঠাৎ তার বুকের মধ্যে হু হু ক'রে উঠল। প্রায় শূন্যে দুলিয়ে ন্যাকড়ার পুতুলের মত লীলাকে সে এনে বসাল তার মেশিনটার উপরে। তারপর নিজেও বসল মেশিনটার নীচে। নিজের মুখটা ঢাকতে চাইছে।

লীলা দু'হাত বাড়িয়ে দিল তার প্রকাণ্ড রুক্ষ মাথাটায়। মনে হল, এতবড় পুরুষের এমন পুজো সে আর কোনদিন পায়নি। মেঘনাদ বলল, 'পারবে, কাজ করতে?'

মেঘনাদের চোয়াল দুটি কাঁপছে, ঢোঁক গিলছে। সেও কথা বলতে পারছে না।

: পারব!

: তবে কর।

লীলা উপুড় হয়ে পড়ল কাঠের পাত্রে। মেঘনাদ তুলে নিল জ্বালানী কাঠ। তন্দুরে আগুন দিতে হবে। চালিস্‌ও এল। ছোট তন্দুরে ঝাঁটা বুলাতে লাগল।

তিলিও এল। লীলা ডাকল তাকে, 'আয়।'

ছোট চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠল।

মেঘনাদ বলল, 'তুমিও এলে ঠুমি ঠাকরুন এ কারখানায়।'

তিলি হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'একটা কথা বলতে এলুম। বোনাই, তোমার কাছে যা চেয়েছিলুম!'

মেঘনাদ বলল, 'হবে, ঠুমি ঠাকরুন। অনেকদিন রয়েছ, আর কিছুদিন থাক। এত তাড়া কিসের। ধরে তো রাখব না।'

তিলি হাসল চোখ নামিয়ে। অনেকদিন থেকেছি, আর কতদিন! কতদিন!

তন্দুরের মুখ থেকে লোলায়মান অগ্নিজিহ্বা ছুটে ছুটে আসতে লাগল বাইরে।

কিন্তু কয়েকদিন পর, সবাকেই আসতে হল কারখানায় বাস করতে। তিলি সুকুমারী, নকুড়, যোড়শী আর তার ছেলে, সবাইকেই।

বিজয় গ্রেপ্তার হয়েছে কারখানা থেকে। সস্তা রেশন বন্ধের প্রতিবাদে, শ্রমিকেরা কারখানার মধ্যে অবস্থান ধর্মঘট করেছিল। তিন দিন বিজয় বাড়ি আসেনি, হাজার হাজার শ্রমিক ঘরে ফেরেনি। বউ বেটি ছেলে তাদের খাবার দিয়ে এসেছে কারখানায়। ঘেরাও হয়ে ছিলেন সাহেব ম্যানেজার। তাকে খাবার দিয়ে যেতেন মেমসাহেব। পুলিশ তিনদিন ধরে ঘেরাও করেছিল শুধু শ্রমিকদের। কিন্তু কিছুই করেনি। তারপর হঠাৎ, ভোজবাজীর মত, শ্রমিকদের মধ্যে একটা গণ্ডগোল লেগে গিয়েছিল। ওতপাতা রাত্রিচরী জীবের মত পুলিশ হঠাৎ গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করেছিল। তাদের প্রথম আসামী বিজয়।

মেঘনাদ অবাক হয়ে এই নতুন স্বদেশী দলকে দেখছিল। চুরি না, ডাকাতি নয়, কোম্পানীর কাছে সস্তা রেশন চাইলে তাকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। এরাও তো তা'হলে স্বদেশী! কিন্তু কী বিচিত্র স্বদেশী। পেটের দায়ে স্বদেশী। বিজয়ের কথা মনে পড়ল, 'বোনাই, সব মিলিয়ে আমার শুধু অপমান। আমি যে অনেক কিছু চাই।' সেই অপমানিত স্বদেশী বিজয়েরা, কিন্তু কী ভয়াবহ বিভীষিকার রাজ্য ঘিরে আছে তাদের।

মেঘনাদের মনে হল, পাপ যেন একটি দীর্ঘসূত্র গাঁথা মালা! অনেক তার রঙ, কিন্তু সব যেন গায়ে গায়ে একই সূত্রে গাঁথা। বিন্‌চৌ থেকে শুরু ক'রে, বিজয়দের মাথার উপর করাল সন্ত্রাসের রাজ্য, সব এক ঠাঁই। আর এতবড় স্বপ্ন নিয়ে, বিজয় মিস্তিরির সঙ্গে একাকার হয়ে গেল মেঘনাদ।

বুক চাপড়ে চীৎকার ক'রে উঠল নকুড় সুকুমারি। কে খাওয়াবে? কে পরাবে?

মেঘনাদ বলল, 'আমি একলা তো সামলাতে পারব না। সবাই মিলে কাজ ক'রে খাব।' ভয় কিসের!

সবাই মিলে ভাড়া ঘর ছেড়ে দিয়ে কারখানায় বাস তুলে নিয়ে এল। কেবল তিলি আর ষোড়শীকে, হাত ধরে অনুনয় করে নিয়ে আসতে হল মেঘনাদকে।

অমৃত মুদী এল দাদ চুলকোতে চুলকোতে। টাকাটা আর ফেলে রাখা যায় না। অবশ্য বউ তার মারা গেছে। এই বয়সে ছেলেমেয়ে নিয়ে, দোকান চালিয়ে সংসার চালানো বড় কঠিন। নকুড়সা'র ছোট মেয়েরও অবিশ্যি বয়স হয়েছে। যদি তার সঙ্গে বিয়ে দেয় তা'হলে টাকার কথাই ওঠে না। কথাটি প্রকাশ্যে লোক জানিয়েই বলল অমৃত।

মেঘনাদ তার মস্ত বড় শরীরটি অমৃতর সামনে এনে দাঁড়াল। 'তা' তো হয় না মশাই। আপনার টাকাটা আমি দিয়ে দেব।'

অমৃত বলল, 'সবাই সব কিছু দিয়ে দেয়। আপনিও তো দিলেন সা' মশাই। শালীকে নিজের কাছে রাখতে চান, রাখুন। তবে, ওই দেব টেব করবেন না, নদগ বিদায় করুন।'

মেঘনাদ বলল, 'নগদ বিদায়ের যে উপায় নাই।'

অমৃত আশ্চর্য নির্বিকার কিন্তু বিষাক্ত হেসে বলল, 'মশাই, দায়ে পড়েই বলছি, তা'হলে যা' হোক একটা নগদ-বিদায় করুন। ছুটোতেই ও-কথা বললে চলবে কেন।'

মেঘনাদের চোখে রক্ত ছুটে এল। তার পেছনেই তিলি আর লীলা দাঁড়িয়ে আছে। নকুড় আর সুকুমারি ঘরের মধ্যে। মেঘনাদ বলল, 'আপনি কত টাকা পান?'

: উনাশী টাকা, চৌদ্দ আনা, তিন পয়সা। মশাই বিজা মিস্তিরিকে অত কেউ কোনদিন ধার দেবে না। আমি দিয়েছিলাম কেন? না, পরে যখন একটা কিছু সম্পর্ক—'

মেঘনাদ বলল, 'আমি কালকেই আমার মেশিন বেচে আপনার—'

তিলি চাপা গলায় আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'বোনাই! ছি ছি ছি, কী সব